আরেক রকম

ষষ্ঠ বর্ষ ঊনবিংশ-বিংশ যুগ্ম সংখ্যা
অক্টোবর ২০১৮ আশ্বিন ১৪২৫

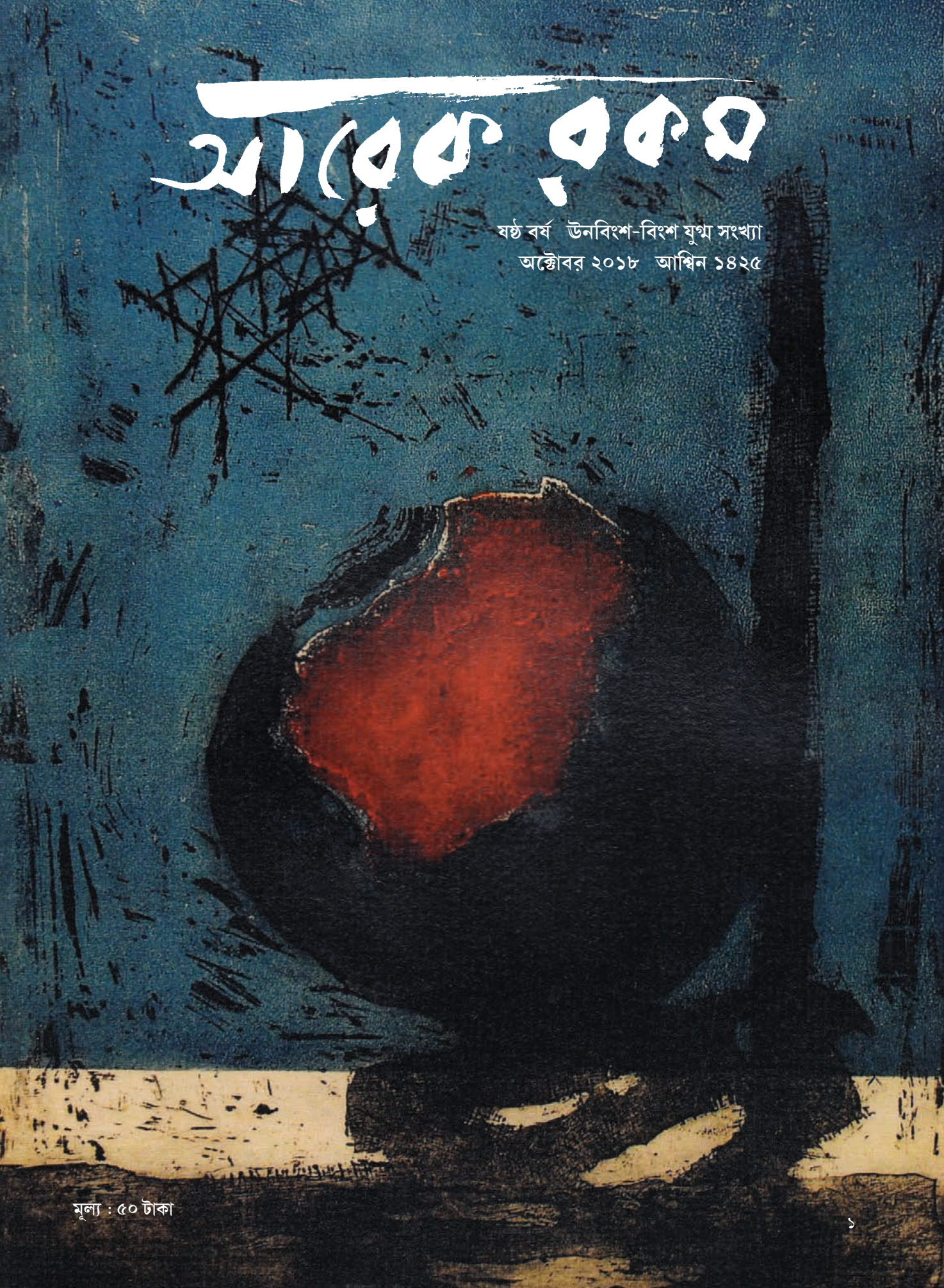

মূল্য : ৫০ টাকা

Because,
in **Neuropathy**

Gabapin is Safer & Tolerable than Pregabalin

GST

means

1. Rudroju N, Bansal D, Talakokkula ST, Gudala K, Hota D, Bh
and anticonvulsants in painful diabetic neuropathy: a networ
2. Haanpää ML, Gourlay GK, Kent JL, Miaskowski C, Raja SN,
Neuropathic Pain and Other Medical Comorbidities. Mayo Cli

Aquila (A Division of INTAS) | INTAS

A comprehensive step ahead therapy that
Relieves...Repairs...Revives...Revitalizes...Rejuvenates

MAXMALA FORTE

Pregabalin 75 mg + Mecobalamin 750 mcg +
Alpha Lipoic Acid 100 mg + Folic Acid 1.5 mg +
Pyridoxine-5-Phosphate 3 mg

MAXMALA

Pregabalin 75mg+Mecobalamin 0.75mg+ALA 100mg

MAXMALA 50

Pregabalin 50mg+Mecobalamin 0.75mg+ALA 100mg

Does a lot more so that they can do a lot more

SYMENTA
a SUN PHARMA division

L2153054

With Compliments from

Levera

Levetiracetam 250 / 500 / 750 / 1000 mg Tabs & 100 mg / ml Sol.

Leverage to Life

Rejunex CD3

Vitamin D3 1000 IU + Calcium Carbonate 500 mg + Methylcobalamin 1500 mcg + Alpha-Lipoic Acid 200 mg + Benfotiamine 150 mg + Inositol 100 mg + Chromium Picolinate 200 mcg + Pyridoxine 3 mg + Folic Acid 1.5 mg Tabs

A wall of Protection

Zevert PVG

NF

Betahistine 16 mg + Piracetam 400mg + Vinpocetine 5mg + Ginkgo Biloba Extract 60 mg + Cholecalciferol 400 I.U. Tabs

The Complete Care

Rexipra

Escitalopram 5/10/15/20 mg tabs

Provides more... with less !

ALTIMA | INTAS

WITH BEST COMPLEMENTS FROM

LUPIN MINDVISION

Makers of .....

STALOPAM PLUS

(ESCITALOPRAM10mg+CLONAZEPAM.5mg)

METRO

|| পুজোয় মেট্রো
নতুন সাজে ||

Keventer-এর পক্ষ থেকে একটি উচ্চ মানের প্রোডাক্ট

আরেক রকম

ষষ্ঠ বর্ষ ঊনবিংশ-বিংশ যুগ্ম সংখ্যা
অক্টোবর ২০১৮, আশ্বিন ১৪২৫
Vol. 6, Issue 19th-20th, Arek Rakam, RNI No. WBBEN/2013/49896

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক: অশোক মিত্র

সম্পাদক
শুভনীল চৌধুরী
subhanilc@gmail.com

সম্পাদকমণ্ডলী
গৌরী চট্টোপাধ্যায়
কালীকৃষ্ণ গুহ
প্রণব বিশ্বাস
ইমানুল হক
শাক্যজিৎ ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ
নামলিপি: হিরণ মিত্র
প্রচ্ছদের ছবি: শৈলেন মিত্র

পরিবেশক
বিশাল বুক সেন্টার
৪ টোটি লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৬
ফোন: ০৩৩-৪০৬৪-৪০৯৭, ৪১০৩, ৬৩৫৩

বাংলাদেশ পরিবেশক
পাঠক সমাবেশ
শাহবাগ, ঢাকা ১০০০

আরেক রকম পত্রিকার জন্য যোগাযোগ স্থল
শিলিগুড়ি: নন্দদুলাল দেবনাথ, ৯৪৭৪৩৮৩৪৪২
বোলপুর: সোমনাথ সমাদ্দার, ৯৪৭৫৩৬৩৩৫২

ওয়েব সাইট: www.arekrakam.com

প্রতি সংখ্যা কুড়ি টাকা
বার্ষিক সডাক পাঁচশো টাকা

এককালীন ৫০০০.০০ টাকা দিয়ে 'সমাজ চর্চা ট্রাস্ট'-এর সদস্য হলে *আরেক রকম* আজীবন বিনামূল্যে পাওয়া যাবে।

সূ ◆ চি ◆ প ◆ ত্র

সম্পাদকীয় ৫

সামির আমিন
অমিয়কুমার বাগচী ৭

সোমনাথদা ও সংসদের কিছু স্মৃতি
মালিনী ভট্টাচার্য ১৩

মুক্ত বেণী পিঠের পরে লোটে
দেবেশ রায় ১৮

আত্মপরিচয়: সংঘাত, সন্ত্রাস, উত্তরণ
পবিত্র সরকার ২৩

রুমি
নবনীতা দেবসেন ৩১

শব্দের ঠিকুজি-কুলজি
সুভাষ ভট্টাচার্য ৩২

বয়স এবং
অমিয় দেব ৩৫

সমাজমাধ্যম ও আলোচনার গণতন্ত্র
অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায় ৩৭

গান্ধী সত্যের সন্ধানে
সৌরীন ভট্টাচার্য ৪১

কেমন চলছে রাজ্যের তেলেভাজা শিল্প?
অর্ধেন্দু সেন ৪৫

জেহাদ: শান্তি-হিংসা-সন্ত্রাসবাদ ও আজকের দুনিয়া
মিলন দত্ত ৪৭

গল্প পড়ার গণতন্ত্র
মিহির ভট্টাচার্য ৫৩

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়
যশোধরা রায়চৌধুরী ৫৭

যে বিপ্লব সুরে আছে কিন্তু কথায় নেই
অরুণ সোম ৬৩

সমাজ চর্চা ট্রাস্ট-এর পক্ষে তৃষিতানন্দ রায় কর্তৃক ৩৯এ/১এ, বোসপুকুর রোড, কলকাতা-৭০০ ০৪২ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক এস. পি. কমিউনিকেশনস্ প্রা. লি., ৩১বি রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

আরেক রকম

পাক্ষিক পত্রিকা, মাসের ১লা ও ১৬ই প্রকাশিত
স্বত্বাধিকারী : সমাজ চর্চা ট্রাস্ট

সম্পাদক
শুভনীল চৌধুরী

সম্পাদকীয় দপ্তর
আরেক রকম
৩৯এ/১এ বোসপুকুর রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৪২
প্রতি সংখ্যা ২০ টাকা
বার্ষিক সডাক ৫০০ টাকা

এককালীন ৫০০০.০০ টাকা দিয়ে
'সমাজ চর্চা ট্রাস্ট'-এর সদস্য হলে তাঁকে
আরেক রকম-এর স্থায়ী গ্রাহক করে নেওয়া হবে।

arekrakam@gmail.com
samajcharcha@gmail.com

স্বত্বাধিকারী
সমাজ চর্চা ট্রাস্ট
কমার্শিয়াল কমপ্লেকস (চতুর্থ তল)
৮১/২/৭ ফিয়ার্স লেন
কলকাতা ৭০০ ০১২

গ্রাহক পরিষেবা
রবিন মজুমদার
৯৪৩২২১৯৪৪৬

অন্নদাশঙ্করের দ্বান্দ্বিক আদর্শবাদ
অভ্র ঘোষ ৬৭

দেবতার জন্ম ও মৃত্যু
ঋক চট্টোপাধ্যায় ৭৫

শ্রীনিকেতন: একটি প্রতিষ্ঠানের পুনর্জন্ম
একরাম আলি ৮১

সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে
তপস্যা ঘোষ ৮৫

সিনেমার চার পেয়াদা
সোমেশ্বর ভৌমিক ৮৯

মেঘ-পিয়ন আর মানুষ-চিঠি
সায়তি ঘোষ ৯৫

পঞ্চকবি প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন
সুধীর চক্রবর্তী ৯৯

ঋকবেদের মেয়েরা
মৌ দাশগুপ্ত ১০৩

বিজ্ঞানের ইতিহাস কি নিষিদ্ধ হওয়া উচিত?
মানসপ্রতিম দাস ১০৭

মস্তিষ্কের আকার-প্রকার
তৃষিতানন্দ রায় ১১০

ব্যান্ডবাদক হবেন না অথবা আরএসএস কীভাবে বাড়ছে?
ইমানুল হক ১১৩

ঠাকুমার ঝুলি
প্রণব বিশ্বাস ১১৯

নির্যাতিতের আদ্যক্ষর
শাক্যজিৎ ভট্টাচার্য ১২৩

অর্থনীতির ধাপ্পাবাজি
শুভনীল চৌধুরী ১২৮

ভাদ্রদিনের অরচিত কথকতা
কালীকৃষ্ণ গুহ ১৩১

আরেক রকম

আরো একটি শারদীয় উৎসবের দোরগোড়ায় আমরা। রাজ্য তথা দেশে সাধারণ মানুষের জীবন বিপন্ন। সাম্প্রদায়িকতা ও স্বৈরাচারের জাঁতাকলে পিষ্ট মানুষ। বেকারত্ব, দারিদ্র, অশিক্ষা, রোগ, ক্ষুধা এখনও আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষের নিত্যসঙ্গী। তবু, বাংলার বুকে এই সময় নিয়ম করে প্রকৃতি যে পরিচিত কিন্তু বিচিত্র খাতে বয়, তারই রেশ ধরে আসে উৎসব। *আরেক রকম* তার পাঠকদের হাতে, প্রত্যেক বছরের মতন এই বছরেও তুলে দিচ্ছে শারদ শুভেচ্ছা মেশানো বিশেষ যুগ্ম সংখ্যা। আরো একবার আমাদের লেখক, চিত্রশিল্পী, বিজ্ঞাপনদাতা, পরিবেশক, বিক্রেতা, পাঠক এবং ছাপাখানার বন্ধুদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ, আমাদের পাশে থাকার জন্য।

এই উৎসবের মুহূর্তেও আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করে আছে এক প্রগাঢ় বিষণ্ণতা এবং শূন্যতা। *আরেক রকম*-এর প্রতিষ্ঠাতা অশোক মিত্র-কে এই বছর হারিয়েছি আমরা। এই শূন্যতা পূরণ হওয়ার নয়। তবু, তাঁর দেখানো পথ ধরে *আরেক রকম* যাত্রা চলবে, এই প্রত্যয় আমাদের আছে।

'আমাদের এই যে ঊনবিংশশতকীয় ঘোর, এর পরিণামে আমরা ভুলে থাকি যে ঠিক একশো বছর আগে বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে হয়তো বামপন্থী আদর্শের সূত্র ধরে এই বাঙালি সমাজেই অন্য একটি উজ্জীবন ঘটেছিল। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক ভুল বোঝাবুঝি, দেশভাগের পরিণামে লক্ষ লক্ষ শরণার্থীদের আর্তনাদ—এই সমস্ত কিছুকে জড়িয়ে, এই সমস্ত কিছুকে ছাপিয়ে বাঙালির একটা নতুন প্রাণশক্তির বিকাশ ঘটেছিল সেই সময়কার কাব্যে, সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে, সংগীতচর্চায়, নৃত্যকলায়, ভাস্কর্যে। . . . সেই যে মস্ত দ্বিতীয় উজ্জীবন' [অশোক মিত্র, 'শতবর্ষে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র,' **শতবর্ষীয়ান জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র**, শিবাদিত্য দাশগুপ্ত ও শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, থীমা]—

সেই উজ্জীবনে প্রাণিত থীমা-র আরো বই

বটুকদার গান। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র সুরারোপিত স্বরলিপি [*রাহুমুক্ত, লম্বকর্ণ পালা, স্মৃতি সত্তা, ভবিষ্যত, কুড়ুনি, আবোল তাবোল*]। প্রসূন দাশগুপ্ত। ইন্দিরা-র সঙ্গে যৌথভাবে।

সর্বজয়াচরিত্র। করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়। *পথের পাঁচালী-অপরাজিত-দেবী-কাঞ্চনজঙ্ঘা-ইন্টারভিউ*-এর চিরস্মরণীয়া অভিনেত্রীর সমগ্র রচনাবলী, চিঠিপত্র, সাক্ষাৎকার।

অনেক মুখ অনেক মুহূর্ত। মৃণাল সেন। সেই সময়ের সহযোগী-সহকর্মীদের অন্তরঙ্গ স্মৃতিকথায় সৃষ্টির উৎস।

জীবনের টানে শিল্পের টানে। রেবা রায়চৌধুরী। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের আদি পর্বের প্রবাদপ্রতিম গায়িকা-অভিনেত্রীর আত্মকথন।

ওঁরা, আমরা, এরা। শোভা সেন। তিন প্রজন্মের অভিনেত্রীদের অন্তরঙ্গ জীবনচিত্র।

ঠিকানা : কলকাতা। সুনীল মুন্সী। পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ। প্রতিবাদী কলকাতার ভূগোল-ইতিহাস।

মণিকুন্তলা সেন : জনজাগরণে নারীজাগরণে। কমিউনিস্ট আন্দোলন ও নারী আন্দোলনের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের আজীবন চিন্তার সাক্ষ্য।

নিশির ডাক। সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। ষাট-সত্তর-আশির দশকের স্মৃতিকথায় সমর সেন, সুনীল জানা, রবি সেনগুপ্ত, করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, অসীম রায়, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূমাইয়া, কিষ্টা গউডার উপস্থিতি।

ব্যক্তি সময় সংস্কৃতি : কল্যাণ মৈত্র স্মারক ভাষণমালা ১-৪। স্বপন মজুমদার, গৌতম ঘোষ, সুমন মুখোপাধ্যায়, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়।

সমাজরুচির টানাপোড়েনে কলা সংস্কৃতি : কল্যাণ মৈত্র স্মারক ভাষণমালা ৫-৭। অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়, ঊর্মিমালা সরকার মুন্সী, স্বপন চক্রবর্তী। সদ্যপ্রকাশিত।

বাদল সরকার : এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত।

থার্ড থিয়েটার : অন্য স্বর, অন্য নির্মাণ। বিশাখা রায়। গণনাট্যোত্তর এক প্রতিবাদী, বিবেকী থিয়েটারের আত্মসমীক্ষণ।

মান্টো-র খোলা চিঠি: সাহিত্যিকের কলমে রাজনীতির ভাষ্য। ভাষান্তর, ভাষ্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্য: সোমেশ্বর ভৌমিক। 'তাঁর গল্পেরই পরিপূরক', আবার পাকিস্তানের 'বিপর্যস্ত চেহারার খতিয়ান।'

ছন্দের অলিন্দে বিদ্রোহ: মহারাষ্ট্রের দলিত কবিতা। স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়-গুহ অনুবাদিত। তপন ভট্টাচার্য চিত্রিত।

যুদ্ধের ছায়ায়। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। গ্রোস্‌ৎস্‌, কোল্‌হিবৎস্‌, ডিক্স, তপন ভট্টাচার্যের চিত্রসমন্বিত।

সমবায়ী শিল্পের গরজে। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। সচিত্র।

প্রচ্ছন্নের আখ্যান। রুশতী সেন। প্রবন্ধ সংকলন।

থীমা/Thema
থীমা বইঘরে ১১-৭টা নিত্য বইমেলা।
৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কলকাতা ২৬, দূরভাষ: ৮৪২০১২৪৫৪১/২৪৬৬ ৭৭৯৪
themabooks@yahoo.com/www.themabooks.com

সামির আমিন

৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩১-১২ আগস্ট ২০১৮

অমিয়কুমার বাগচী

সদ্যপ্রয়াত মিশরীয় অর্থনীতিবিদ (সমাজবিজ্ঞানী) সামির আমিন, পল বারান, পল সুইজি, হ্যারি ম্যাগডফের পরে বিশ্বের সর্বাগ্রগণ্য মার্কসবাদী সমাজবিজ্ঞানী ছিলেন। নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন তৃতীয় বিশ্বের সর্বোত্তম সমাজবিজ্ঞানী। অন্য মার্কসবাদী সমাজবিজ্ঞানীদের মতোই তাঁর বিচরণ ছিল সমাজবিজ্ঞানের সব শাখায়: রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থশাস্ত্র, সংস্কৃতি সর্বত্র।

তাঁর পূর্ণাঙ্গ আত্মজীবনী দুই খণ্ডে Monthly Review Press থেকে বেরোনোর কথা। কিন্তু ২০০৬ সালে প্রকাশিত A Life Looking Forward: Memoir of an Independent Marxist বইতে তাঁর শিক্ষা, তাঁর মার্কসবাদে দীক্ষা, তাঁর নানা কর্মকাণ্ডের বিবরণ পাওয়া যায়।

সামিরের জন্ম মিশরের (ইজিপ্টের একটি সম্ভ্রান্ত এবং মোটামুটি সমৃদ্ধিশালী পরিবারে) তাঁর বাবা ছিলেন মিশরীয় কপ্ট্ (অর্থাৎ খ্রিস্টান) আর মা ছিলেন ফরাসি। দুজনেই ডাক্তার ছিলেন। তাঁদের বেশিরভাগ কর্মজীবন কেটেছিল পোর্ট সৈয়দে, বাবা ছিলেন সরকারি চাকুরে আর মা প্রাইভেট প্র্যাক্টিস করতেন। তিনি যেমন বিত্তবানদের চিকিৎসা করতেন তেমনি প্রায় বিনা পয়সায় গরিবদের চিকিৎসা করতেন।

সামিরের প্রথম স্কুলজীবন কেটেছিল ফরাসি স্কুলে (lycec-তে)। তার কারণ, এটা ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। মিশর নামে স্বাধীন হলেও সেখানকার রাজা (খেদিব) ব্রিটিশদের অঙ্গুলিহেলনে চলতেন। সামিরের বাবা ছিলেন ওয়াফ্দ পার্টির সমর্থক। সেই পার্টি মিশরে পার্লামেন্টারি প্রথায় ধর্মনির্লিপ্ত গণতন্ত্র চাইত।

সামিরের যখন দু-বছর বয়স, তিনি দেখলেন একটি বাচ্চা বর্জ্য পদার্থের স্তূপের ভিতর খাবার খুঁজছে। সামির বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ছেলেটি এভাবে খুঁজছে কেন?' বাবা উত্তর দিলেন, 'তার কারণ, সমাজ ওকে ওইভাবে খুঁজতে বাধ্য করছে।' সামির উত্তর দিলেন, 'আমি সমাজ বদলে দেব।' তারপর সারাজীবন তিনি সমাজ পরিবর্তনের সাধনা করে গিয়েছেন।

সামির স্কুলে গণিত এবং ইতিহাসে ভালো করতেন। তাই দেখে শিক্ষকরা তাঁকে আরও উঁচু ক্লাসের বইপত্তর পড়তে দিতেন। পোর্ট সৈয়দের স্কুলের শেষ পরীক্ষায় সামির মিশরের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে উঁচু স্থান করলেন। তারপর ১৯৪৭ সালে তিনি প্যারিসের চতুর্থ অঁরি লিসিতে ভর্তি হলেন। সেখানে প্রথমে তিনি সাধারণ গণিত এবং তার পরে উঁচু দরের গণিত পড়তে আরম্ভ করলেন। এর মধ্যেই সামির কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য হয়েছিলেন।

সামির গণিতশাস্ত্রে এতই পারঙ্গম হয়েছিলেন যে তাঁর শিক্ষকরা ভেবেছিলেন যে তিনি হয় গণিতশাস্ত্রী হবেন অথবা পদার্থবিদ হবেন। কিন্তু সামির তখন সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছেন। ভিয়েতনামে ফরাসি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। প্রচুর আফ্রিকানদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে যাঁরা নিজেদের দেশে ফরাসি সাম্রাজ্যিকদের বিরুদ্ধে লড়ছেন। উনি সেজন্যে ঠিক করলেন যে তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞান আর অর্থশাস্ত্র পড়বেন। তিনি ১৯৫০ সালে ফ্রান্সের শীর্ষস্থানীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানচর্চার SciencePo-তে ভর্তি হলেন। সেখানেই তাঁর জীবনসঙ্গিনী ইসাবেলের সঙ্গে আলাপ। ১৯৫৭ সালে তিনি অর্থশাস্ত্রে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করলেন। সেখানে দুটি বিষয়ে পথিকৃতের স্বাক্ষর রাখলেন। তিনি দেখালেন কীভাবে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি ওদের অশ্বেতকায় উপনিবেশগুলিকে বাধ্য করে সামাজিকদের স্বার্থে তাদের অর্থব্যবস্থা এবং সমাজব্যবস্থা দুমড়ে-মুচড়ে ফেলতে। দ্বিতীয়ত তিনি দেখালেন কীভাবে গোটা বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী দেশ এবং তাদের উপর নির্ভরশীল দেশে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। এখানেও পরবর্তীকালের পরনির্ভরতা তত্ত্বের (depending theory-র) জন্ম হল।

সামির ১৯৫৮ সালে মিশরের মোয়াসা অর্থনিগমে অর্থনীতিবিদ হিসেবে নিযুক্ত হলেন। তাঁর ডিরেক্টর ছিলেন একজন মার্কসিস্ট। ১৯৫৬ সালে সুয়েজ যুদ্ধে জয়ী হওয়ার পরে নাশের, ব্রিটিশ, ফরাসি এবং বেলজিয়ান মালিকানাধীন সংস্থাগুলি মিশর সরকারের অধীনে নিয়ে আসেন। অর্থনিগমের

কাজ ছিল সেগুলো ম্যানেজ করা। প্রথমেই সমস্যা হল কীভাবে এই রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির টাকার জোগাড় হবে। এর সোজা উত্তর ছিল যে নবপ্রতিষ্ঠিত Industrial Bank তার জোগান দেবে। কিন্তু Industrial Bank কাজ করত শিল্পমন্ত্রকের অধীনে। তার আধিকারিকরা ছিল অকর্মণ্য ও দুর্নীতিগ্রস্ত। তাদের অকর্মণ্যতা ও দুর্নীতির ছোঁয়ায় স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার ওপর পড়ল, এবং *নাশেরের* শাসনকালীন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির প্রভূত দুর্নাম হল।

সামির প্রথম মিশরের টাকাপয়সার লেনদেনের স্রোতগুলির একটা ছক কষেন। এই ধরনের কাজ তিনি ফ্রান্সে গিয়েও করেন এবং তাদের সাহায্যে শিল্পজাত দ্রব্যের দাম নিরূপণ করেন।

নাশেরের অফিসাররা গোঁড়া জাতীয়তাবাদী ছিল এবং তারা গণতন্ত্রের ধার ধারত না। তারা শিগ্‌গিরই কমিউনিস্টদের ধরপাকড় করতে শুরু করল। সুতরাং সামিরের আর মিশরে ফেরা হল না। সামির ১৯৬১ সালে মালিতে গিয়ে অর্থনীতিবিদের এবং পরিকল্পনাবিদের কাজ আরম্ভ করলেন। যদিও সদ্য স্বাধীনতা পাওয়া মালির শাসকদল ঘোষণা করল যে তারা মার্কসিজম-লেনিনিজম দ্বারা চালিত হোক, আসলে সেই পার্টি ছিল বহুমতাবলম্বী লোকের এবং বহু শ্রেণির প্রতিভূ।

সামির শুধু অফিসে বসে কাজ করতেন না, সাধারণ লোকের সঙ্গে কথা বলে তাদের সমস্যা বুঝতে চেষ্টা করতেন। শাসকদের উদ্দেশ্যগুলো ছিল সোজাসাপটা স্কুলশিক্ষার দ্রুত সম্প্রসারণ, সমস্ত লোকের জন্য টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা, গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করা, রাস্তাঘাট বাড়ানো, বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলির জন্য, চাষিদের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের আয় দ্বিগুণ করা এবং বৃহৎ শিল্পের দিকে না গিয়ে ক্ষুদ্রশিল্প স্থাপন করা।

কিন্তু এইসব কাজ করা মোটেই সোজা হল না। সামির এখানে একটা অনুন্নত, ভূতপূর্ব উপনিবেশের সমস্যাগুলির সম্মুখীন হলেন।

প্রথম বাধা হল যে কিছু কিছু মন্ত্রী জারিজুরি করলেন যে যেভাবেই হোক তাঁদের প্রকল্পগুলিকে অগ্রাধিকার দিতে— সেই প্রকল্পগুলির আর্থিক বা সামাজিক যৌক্তিকতা থাক বা না থাক।

দ্বিতীয়ত, সবাই চাইত Prestige প্রকল্প করতে, যাতে তাদের পায়াভারী হয়। তৃতীয়ত, রাজনীতির নামে সুবিধাবাদ প্রশ্রয় পেত।

চতুর্থ বাধা ছিল ওই যে খুচরো বিক্রেতাদের তথাকথিত সমাজতন্ত্র ব্যবস্থার সঙ্গে ঠিকমতো শামিল করা যায়নি। যে দেশে বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতির জন্যে সারাক্ষণই ক্রেয় জিনিসের অপ্রতুলতা ঘটছে, সেখানে কালোবাজারি মাথাচাড়া দেবে তাতে সন্দেহ নেই। তাকে বাগে রাখার জন্যে শুধু শাস্তিদানই যে যথেষ্ট নয় শাসকদের তা খেয়ালে আসেনি।

পঞ্চম বাধা ছিল যে, নীচের স্তরের আধিকারিকদের সত্যিকারের জ্ঞানের অভাব ছিল। মালি যখন তাদের নিজস্ব মুদ্রা প্রচলন করল, স্বভাবতই তার দাম ভূতপূর্ব ফরাসি মুদ্রা (CFA) যেটা অন্য পরাধীন উপনিবেশে চালু ছিল, তার তুলনায় মালির মুদ্রার দাম কম ছিল। সেক্ষেত্রে বিদেশি মুদ্রা জমানোটাই বুদ্ধিমানের কাজ হত। কিন্তু একজন জাতীয়তাবাদী মালির নাগরিক যখন আইভরি কোস্ট থেকে CFA নিয়ে এল, কাস্টম্‌স্ অফিসাররা সেগুলো পুড়িয়ে দিল।

সুষ্ঠু পরিকল্পনার পক্ষে শেষ বাধা হয়ে দাঁড়াল যে যখন ছাত্ররা বিদেশ থেকে পড়াশোনা করে মালিতে ফিরত, তারা সর্বদা উঁচু পদ চাইত। তারা তাদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের অভাব চটকদার বুলি দিয়ে পুষিয়ে নিতে চাইত।

মালিতে থাকাকালীন সামির মালির সঙ্গে অন্য যে দুটো দেশের সংযুক্তিকরণের কথা হয়েছিল— ঘানা এবং গিনি— সেই দুটো দেশে গিয়েছিলেন। সংযুক্তিকরণ একেবারেই এগোয়নি। তিনি সেকু তুরের শাসন সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ফিরেছিলেন। গিনিতে রাষ্ট্রপ্রধানের ভয়ে কেউ মুখ খুলতে চায়নি। যখন সেকু তুরের সঙ্গে সামিরের কোনোরকমে সাক্ষাৎ ঘটল, রাষ্ট্রপ্রধান আত্মভরী শাসকের মতো এক ঘণ্টা ধরে বকবক করলেন। তাঁর শাসনব্যবস্থা এতই অকর্মণ্য ছিল যে কোনাক্রির সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত হোটেল, হোটেল দ্য ফ্রাঁসে রান্নার ব্যবস্থা ছিল না, কাছের লেবানিজ দোকান থেকে আবাসিকদের খাবার কিনতে হত।

ঘানা সম্বন্ধে সামিরের অভিজ্ঞতা অনেক বেশি ভালো ছিল। কোয়ামে ন্‌ক্রুমা (Kwame Nkrumatch) সামিরের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় মনোযোগ দিয়ে শুনলেন শুধু নিজে বকবক করলেন না। কিন্তু মালির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পরিকল্পনার ব্যাপারটা বিশেষ এগোল না। সামির, ঘানা, গিনি, মালির একটা যৌথ রেলপথের প্রস্তাব দিলেন সেটা খারিজ হয়ে গেল। তিনি প্রস্তাব দিলেন যে বড়ো শিল্পগুলো (ইস্পাত বা ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানা) এমনভাবে তিন দেশের মধ্যে ভাগ হোক যাতে করে বৃহতের জন্যে যে ব্যয় সঞ্চয় হয়, সে প্রস্তাবও খারিজ হয়ে গেল।

১৯৬৩ সালে সামির সেনেগালের রাজধানী দাকারে রাষ্ট্রপুঞ্জের নবপ্রতিষ্ঠিত African Institute for Economic Planning and Development (IDEP)-এ Professor of Political Economy হিসেবে যোগ দেন। সামির আইভরি কোস্ট, মালি এবং উত্তর-আফ্রিকার আরব দেশগুলির উপর গবেষণা চালিয়ে যে রিপোর্ট লেখেন, তার সিদ্ধান্ত দেখে IDEP-র তদানীন্তন অধ্যক্ষ এতই সন্ত্রস্ত হন যে তিনি পারলে সেগুলো বাক্সবন্দি করে রাখতেন।

কিছুদিন পরেই রাষ্ট্রপুঞ্জের তদানীন্তন সেক্রেটারি জেনারেল উ থান্‌ট্‌কে চিঠি লিখে IDEP থেকে পদত্যাগ করেন না। সামিরের মতে IDEP-এর কাজ হল সমস্ত আফ্রিকার উন্নয়ন সম্বন্ধে আলোচনার কেন্দ্র হওয়া এবং আফ্রিকার উন্নয়ন সম্বন্ধে তত্ত্ব প্রণয়ন করা, তা না করে IDEP-কে কোনো সাদামাটা কলেজের মতো মামুলি জিনিস পড়ানোর কলেজের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর কিছুদিন পরে ১৯৭০ সালে সামির IDEP-এর অধিকর্তা নিযুক্ত হন। ১৯৮০ সালে সেখান থেকে পদত্যাগ করে তিনি দাকারে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত Third World Forum-এ সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। এই হল তাঁর কর্মজীবনের ইতিহাস। আমি এবং প্রয়াত অধ্যাপক রামকৃষ্ণ মুখার্জি গোড়া থেকেই Third World Forum-এর সভ্য ছিলাম, সেইসূত্রে সেই Forum-এর খবর পেতাম।

সামির সারাজীবনে অনেকগুলি তত্ত্ব নিয়ে কাজ করেছেন। সবগুলির সংক্ষিপ্তসার এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। প্রথমে ধরা যাক সামিরের Eurocentrism-এর তত্ত্ব। ইয়োরোপ পৃথিবীর ইতিহাসে অতি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে এই চিরাচরিত ধারণাকে তিনি চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। তার সঙ্গে এই ধারণাও ছিল যে পৃথিবীর অন্য সব অঞ্চলের দেশের— এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার— ভবিতব্য হল অন্ধভাবে ইয়োরোপের অন্ধ অনুকরণ। এই ইয়োরোপকেন্দ্রিকতার জন্ম হয়েছে ইয়োরোপীয় রেনেসাঁসের সময় এবং তার চরম রূপ পেয়েছে ধনতন্ত্রের উদ্ভবের পরে। সামির দেখিয়েছেন যে যুক্তি দিয়ে বাস্তবের পর্যালোচনা এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ইয়োরোপের একচেটিয়া ছিল না, প্রাচীন ব্যাবিলন থেকে আরব-পারসিক সভ্যতার মধ্যেও তার স্ফুরন ঘটেছিল। ধনতন্ত্রীদের এই ধরনের ইয়োরোপকেন্দ্রিক ধ্যানধারণার একটা ফল স্যামুয়েল হাম্‌টিংটনের বিভিন্ন সভ্যতার সংঘর্ষের তত্ত্ব এবং ইসলাম সম্বন্ধে অহেতুক ভীতি যার সর্বনাশা প্রকাশ হল ইরাক এবং আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে বিধ্বংসী যুদ্ধের পরম্পরা। ইয়োরোপকেন্দ্রিকতার আরেক প্রকাশ হল অশ্বেতকায়দের বিরুদ্ধে অহেতুক বিদ্বেষ।

মান্থলি রিভিউ-এর এক দীর্ঘ প্রবন্ধে তিনি Political Islam অর্থাৎ রাজনৈতিক ইসলামের বিশদ বিশ্লেষণ করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে যদিও এই ধরনের রাজনৈতিক আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করে কিন্তু আসলে তা সাম্রাজ্যবাদের হাত শক্ত করে। এর একটা পুরোনো উদাহরণ হল মিশরের Muslim Brotherhood। ১৯২০ সালে ব্রিটিশ শাসকদের এবং মিশরের খেদিবের প্রণোদনায় Muslim Brotherhood (MB)-এর জন্ম হয়েছিল। সামির আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ইরাক তুর্কির দখলে ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অটোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস হওয়ার পরে ব্রিটিশদের ইরাকের দখল নিতে বিশেষ বেগ পেতে হয়েছিল। ব্রিটিশরা বাইরে থেকে এক রাজাকে এনে ইরাকের ওপর চাপিয়েছিল। কিন্তু ইরাকের জনসাধারণ— শিয়া, সুন্নি, কুর্দি— কেউই রাজাকে চায়নি। রাজার বকলমে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বাথ পার্টি এবং কমিউনিস্ট পার্টির বিরাট প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল। ইরাকের কমিউনিস্ট পার্টি মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে বড়ো কমিউনিস্ট পার্টি হয়ে উঠেছিল। ১৯৬০-এর দশকের শেষ দিকে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার জন্যে সাদ্দাম হুসেনকে দিয়ে কমিউনিস্টদের নিধন করিয়েছিল। MB সবসময়ে সম্পত্তিশালীর স্বার্থ দেখে। সাম্প্রতিককালে মিশরে যে আইনে কোর্ফা চাষিদের যেটুকু স্বার্থ ছিল তাও খর্ব করা হয়েছে, MB তার পুরো সমর্থন করেছিল। বস্তুতপক্ষে MB সেইজন্যে পরনির্ভর ধনতন্ত্র যার সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের গাঁটছড়া বাঁধা আছে তার পুরো সমর্থক।

লোকে ভুলে যায় যে আরব উপদ্বীপ বাদ দিলে মরক্কো থেকে ভূতপূর্ব সোভিয়েট মধ্য এশিয়ার মুসলিম-অধ্যুষিত দেশগুলিতে বিভিন্ন সময়ে বৈপ্লবিক চিন্তাধারা এবং বৈপ্লবিক কাজকর্ম সংঘটিত হয়েছে। পশ্চিমি সাম্রাজ্যিকদের বিরুদ্ধে প্রথম লড়েছিলেন তুর্কির কামাল আতাতুর্ক। আলজিরিয়াতে ছিল Algerian Liberation Front যারা ফরাসি সাম্রাজ্যিকদের সঙ্গে লড়ে জিতেছিল। টিউনিসিয়ার হাবিব বুরগুইবা, মিশরের গামাল অব্দেল নাশের, সিরিয়া এবং ইরাকের বাথিষ্ট দল সকলেই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়েছিল। মিশরের ওয়াফ্‌দ্ দল সত্যিকারের ধর্মনির্লিপ্ত ছিল: ব্রিটিশদের, MB-র, নাশের এবং হুস্‌নি মুবারকের বিরোধিতায় সেই দল শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং রাজনৈতিক ইসলাম গেঁড়ে বসেছিল।

১৯৮০-র দশক থেকে চারটি দেশ মার্কিন এবং ইয়োরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের বিষনজরে পড়েছিল। সে চারটি দেশ হল আফগানিস্তান, ইরান, ইরাক এবং প্যালেস্তাইন (আরবিতে ফিলিস্তিন)। আফগানিস্তানে ১৯৭৮ সালে সেখানকার রাজাকে পদচ্যুত করে কমিউনিস্টরা ক্ষমতায় আসে। তারপরেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পাকিস্তান প্রথমে মুজাহিদিন এবং তারপরে তালিবানদের টাকা এবং অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে কমিউনিস্টদের উৎখাত করার জন্যে উঠে-পড়ে লাগে। সোভিয়েট ইউনিয়নের পতনের পরেও নাজিবুল্লার শাসন আরও দু-বছর টিঁকে ছিল কারণ তার পিছনে সাধারণ লোকের সমর্থন ছিল। সেই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও কমিউনিস্টরা কতকগুলি সামাজিক সংস্কার করতে পেরেছিল। ভূমি-সংস্কারের মধ্যে দিয়ে জনজাতির মাতব্বরদের ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছিল। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পাঠানো হয়েছিল। কমিউনিস্টরা কুসংস্কারের

বিরুদ্ধেও লড়েছিল। মুজাহিদিন, তালিবান আর স্থানীয় জঙ্গিনেতাদের দৌরাত্ম্যে আফগানিস্তানের যা ক্ষতি হয়েছিল, তার ষোলোকলা পূর্ণ হল ২০১১ সালে নিউ ইয়র্কের যুগ্মমিনারের ধ্বংসের পরে মার্কিনি আগ্রাসনে। মার্কিনি এবং NATO-র জন্য সহযোগী সৈন্য নারী-পুরুষ নির্বিশেষে আফগানের হত্যাযজ্ঞে মেতে ওঠে।

এবার আসা থাক ইরাকের কথায়। সামিরের মতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনেকদিন ধরেই ইরাকের স্বৈরাচারী কিন্তু আধুনিকতাপন্থী ও ধর্মনির্লিপ্ত সাদ্দাম হুসেনের শাসনের অবলুপ্তি ঘটাতে চেয়েছিল। তার প্রধান কারণ অবশ্যই এই যে সৌদি আরবের পরেই ইরাকের তৈলসম্ভার ছিল সবচেয়ে বেশি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি তাঁবেদার শাসককে সেখানে বসিয়ে সেই তৈলসম্ভারের দখল নিতে চেয়েছিল। মার্কিন প্রেসিডেন্ট প্রথম জর্জ বুশ ইরাক কর্তৃক কুয়েত আক্রমণকে প্রথম অছিলা হিসেবে ব্যবহার করে ১৯৯০ সালে ইরাক আক্রমণ করেন। সেখানেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বিচারিতা দেখিয়েছিল। তার আগে ইরাক-ইরান যুদ্ধের সময় মার্কিনিরা ইরাককে বেআইনি রাসায়নিক অস্ত্র জুগিয়েছিল। সাদ্দাম যখন কুয়েত আক্রমণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন তখন মার্কিনিরা এমন ভাব দেখিয়েছিল যেন তাতে তাদের কিছু এসে যায় না। কিন্তু আক্রমণের পরেই তারা তাদের বিপুল সামরিক শক্তি নিয়ে ইরাকের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আশি হাজার ইরাকি সৈন্যকে ট্যাংক দিয়ে তারা বালির পাহাড়ের মধ্যে জ্যান্ত কবর দিল। তারপর ইরাকের ওপর বশংবদ রাষ্ট্রপুঞ্জকে দিয়ে এমন নিষেধাজ্ঞা চাপাল যে ইরাক সহজে বিশ্বের বাজারে তেল বিক্রি করতে পারত না, অত্যাবশ্যক ওষুধপত্র কিনতে পারত না, যার জন্য কয়েক লক্ষ শিশু অকালে মৃত্যুবরণ করেছিল।

নিউ ইয়র্কে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার পরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট দ্বিতীয় জর্জ বুশ ইরাককে একেবারে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্যে মাঠে নামলেন। তাঁর হাতে কোনো প্রমাণ ছিল না যে, ওসামা বিন লাদেনের আল-কায়দাকে সাদ্দাম কোনো সময়ে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন— বরং তাদের তিনি দেশে ঢুকতে দেননি। এই অপপ্রচারের সঙ্গে যোগ হল আরেকটা হিটলারের প্রচারকর্তা গোয়েবল্‌সের মতো মিথ্যা প্রচার। গোয়েবল্‌স বলতেন যে একটা মিথ্যা যদি বার বার জোর দিয়ে বল তা হলে লোকে সেটা বিশ্বাস করবে। জর্জ বুশ এবং তাঁর মতোই মিথ্যাবাদী ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী টোনি ব্লেয়ার কোনো সাক্ষ্য ছাড়াই প্রচার করলেন যে সাদ্দামের দখলে নাকি Weapons of mass destruction— গণসংহারের অস্ত্র আছে। আসলে গণসংহারের অস্ত্র তো মার্কিনিদের হাতেই ছিল। তাদের ওপর থেকে হাজার হাজার বোমা ফেলে ইরাকের অমূল্য প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস ধ্বংস এবং লক্ষ ইরাকিকে হত্যা করতে এতটুকুও লজ্জা হয়নি। সুতরাং সাদ্দামের পরাজয় সুনিশ্চিত ছিল। সামির আশা করেছিলেন যে ইরাকে মার্কিনি শাসনের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিরোধ হবে। সংসদীয় প্রথায় নির্বাচিত একটা মোটামুটি বশংবদ সরকার সেখানে নির্বাচিত হয়েছে। বরং আফগানিস্তানে তালিবানকে নিয়ন্ত্রণ করতে বিদেশি সৈন্য এবং নির্বাচিত সরকারকে প্রচণ্ড বেগ পেতে হচ্ছে।

প্যালেস্তাইন (ফিলিস্তিন)

ব্রিটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ঘোষণা করেন যে প্যালেস্তাইনকে ইহুদিদের বাসভূমি করা হবে, কারণ সেটা নাকি সব ইহুদিদের আদি বাসস্থান ছিল। এটা সর্বৈব মিথ্যা কথা। কারণ অন্যদেশের অনেক লোক ইহুদিধর্মে (Judais-এ) দীক্ষিত হয়েছে। আর প্যালেস্তাইনের আরব আদিবাসীদের কী হবে? ১৯৪৮ সালে ইসরায়েল যখন প্রতিষ্ঠিত হল তখন থেকেই প্যালেস্তাইন থেকে আরব বিতাড়ন শুরু হয়েছে। শুধু প্যালেস্তাইন থেকে নয়, ইসরায়েল সিরিয়ার কাছ থেকে গোলান পর্বতের দখল নিয়েছে, জর্ডনের প্রায় অর্ধেক কেড়ে নিয়েছে, মিশরের কাছ থেকে গাজার দখল নিয়েছে, তার অধিকাংশই ইহুদিদের বাসস্থান হয়েছে, যেটুকু অংশে আরবদের বাসস্থান আছে সেখান থেকেও তাদের তাড়ানোর ব্যবস্থা চলছে। আর এইসবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুরো সমর্থন আছে। কারণ ইসরায়েল আর সৌদি আরব হল মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান কোতোয়াল। ইসরায়েলের হাতে আণবিক অস্ত্রসম্ভার আছে। এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যিকতার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হল ইরান। কাজেই নানা অছিলায় ইরানের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে তার ক্ষমতা খর্ব করার চেষ্টা চলছে। আমরা ইরানের কথায় পরে আসব।

যতবার চেষ্টা হয়েছে ইসরায়েলের সঙ্গে প্রতিবেশী আরব রাজ্যগুলির মিত্রতা স্থাপনের, ইসরায়েল প্রত্যেক বার সেই চুক্তি ভঙ্গ করেছে। প্যালেস্তাইনে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে প্রথম গড়ে ওঠে ইয়াসের আরাফতের নেতৃত্বে Palestine Liberation Organization-এর (PLO) মাধ্যমে। একসময়ে স্থির হয় প্যালেস্তাইন পুরোপুরি রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য হবে না, কিন্তু প্যালেস্তাইনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে স্বায়ত্তশাসন থাকবে। কিন্তু PLO-র শাসনে প্রচণ্ড আর্থিক দুর্নীতি ঢুকে ফেলার ফলে এবং PLO-র তাঁবেদারি মনোবৃত্তির প্রতিক্রিয়া হিসাবে জন্ম হল ইসলামপন্থী হামাসের। হামাসই এখন ইসরায়েলের বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছে।

লেবাননে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল সেখানকার কমিউনিস্ট পার্টি। তাকে উৎখাত করার

জন্য সিরিয়ার বাথপার্টি, লেবাননের শাসকদল এবং ইরান মিলে ইসলামপন্থী হেজবোল্লার জন্ম দিয়েছে।

ইরানে যদিও ১৯৭০-এর দশকের শেষে আয়াতোল্লা খোমেনির নেতৃত্বে ইসলামপন্থী বিপ্লব সাধিত হয়েছিল, তার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল ইরানিদের প্রচণ্ড স্বাজাত্যবোধ। সেই স্বাজাত্যবোধের জোরেই ইরানে শিল্প, বিজ্ঞান ও শিক্ষার প্রভূত অগ্রগতি হয়েছে। সে দেশ স্বাভাবিকভাবেই ধনতন্ত্রী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সঙ্গে মিলেমিশে চলতে পারত। কিন্তু যেহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানের তৈলেরও দখলদারি নিতে চায় আর সৌদি আরব আর ইসরায়েলকে তাদের প্রধান কোতোয়াল হিসেবে রাখতে চায়। ইরানের সঙ্গে ইয়োরোপীয় ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুক্তি হয়েছে যে যতদিন না ইরান আণবিক অস্ত্র বানাচ্ছে, তারা বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে আণবিক শক্তি ব্যবহার করতে পারবে। ইরান সেই চুক্তি যে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন তা মানছে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সেই চুক্তি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে ইরানের ওপর নতুন নতুন নিষেধাজ্ঞা জারি করছেন।

এর পরে সামিরের যে তত্ত্বটা আলোচনা করব তা হল Maldevelopment অর্থাৎ পঙ্গু উন্নয়ন। এই তত্ত্ব সামির বিশেষ করে প্রয়োগ করেছেন আফ্রিকার দেশগুলি সম্বন্ধে। 'অনুন্নয়ন' থেকে এটা আলাদা। অনুন্নয়নের ক্ষেত্রে বলা যায় যে একটা দেশকে খানিকটা পথ অতিক্রম করে অপেক্ষাকৃত উন্নত দেশগুলির কাছে আসতে হবে, যেমন পূর্ব-এশিয়াতে প্রথমে জাপান, তারপর সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, হংকং, তাইওয়ান এবং কমিউনিস্ট চিন ইয়োরোপের উন্নত দেশগুলির কাছাকাছি এসেছে। আফ্রিকার আর্থিক বা সামাজিক গতি ১৯৮০-র দশক থেকেই খুঁড়িয়ে চলতে আরম্ভ করেছে। এশিয়া এবং লাতিন আমেরিকার বেশ কিছু দেশ সম্বন্ধে একই কথা বলা চলে। কিন্তু এমনটি হওয়ার কথা ছিল না। ১৯৭০-এর দশকে চেষ্টা হয়েছিল উন্নত এবং অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে বিনিময়ের শর্তগুলি বদলে একটি New International Economic Order (NIEO) তৈরি করার চেষ্টা হয়েছিল। আফ্রিকার ক্ষেত্রে Logos Plan-এর মাধ্যমে শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিরও উন্নতির পরিকল্পনা হয়েছিল। কিন্তু এই পরিকল্পনা ভেস্তে গেল কারণ সাহারার দক্ষিণের অধিকাংশ আফ্রিকার দেশ এবং লাতিন আমেরিকার দেশগুলি ঋণজালে জড়িয়ে পড়ল এবং World Bank এবং International Monetary Fund-এর ফতোয়া মেনে তাদের নিজেদের জন্য খরচ সংকুচিত করে বিদেশি ব্যাঙ্কগুলির টাকা শোধ করতে বাধ্য হল। তাতে যে শুধু তাদের আয় সাংঘাতিক ভাবে কমে গেল, তাই নয়, তাদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ওপরও খরচ কমাতে বাধ্য হল। যক্ষ্মা এবং HIV/AIDS-এর প্রভাবের ফলে আফ্রিকার বহু দেশে গড় আয় ১৯৬০-এর দশকের চেয়ে কমে গেল। এর জন্যে শুধু বাইরের শক্তিকে দোষ দিলে চলবে না। সাম্রাজ্যবাদ সর্বদাই দেশের মধ্যেকার বিভীষণ শক্তিকে আশ্রয় করে চলে। এই ব্যাপারটা বুঝতে গেলে সামিরের পৃথিবীর শ্রেণীগুলির ছয় ভাগ ওরা সহায়তা করবে। সবার ওপরের শ্রেণি হল উন্নত ধনতন্ত্রী দেশের পুঁজিবাদী শ্রেণি। তার নীচে হল সেই দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণি। সামির এই শ্রেণিকে প্রায় সর্বদা পুঁজিবাদী শ্রেণির সহযোগী হিসেবে দেখেছেন। তৃতীয় স্থানে আছে অনুন্নত দেশগুলির পরনির্ভর পুঁজিবাদী শ্রেণি। চতুর্থ স্থানে আছে সেই দেশগুলির প্রাক্-ধনতন্ত্রী শোষকশ্রেণি— বড়ো জমিদার, মধ্যপ্রাচ্যের শেখ, আফ্রিকার জনজাতির বড়কর্তা গোছের লোক। পঞ্চম স্থানে আছে অনুন্নত দেশের শ্রমিকশ্রেণি। সামির লেনিনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই শ্রেণিকে বিপ্লবের অগ্রণী শক্তি হিসেবে দেখেছেন। কিন্তু এই শ্রেণির সর্বদাই অনুন্নত দেশের সাধারণ চাষিদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলবে।

সামিরের কাছে বিপ্লব সর্বদাই ফরাসি বিপ্লব এবং রুশি বিপ্লবের আদল নিয়ে আসবে। সংসদীয় শান্তিপূর্ণ বিপ্লবে তিনি বিশ্বাস করতেন না। লেনিন যেমন জার আমলের দুমাকে শুয়োরের খোঁয়াড় বলে মনে করতেন, সামিরও তেমনি সংসদীয় গণতন্ত্রকে সুবিধাবাদীদের আখড়া বলে মনে করতেন, যদিও তিনি বার বার মিশরের ওয়াফ্‌দ পার্টির সত্যিকারের ধর্মনির্লিপ্ত ও গণতান্ত্রিক আদর্শের কথা বলেছেন। এসবের একটা প্রধান কারণ এই যে গোড়াতেই মিশরের নাশেরের শাসনকাল এবং মালি, ঘানা ও গিনির সম্বন্ধে তাঁর তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তিনি লেনিন এবং মাওয়ের কাছ থেকে এই শিক্ষা পেয়েছিলেন যে স্বৈরাচারী শাসককে উৎখাত করতে গেলে সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া গতি নেই। সামিরের কথা যে ভুল তা আফ্রিকার প্রায় সব দেশের অভিজ্ঞতা থেকেই প্রমাণ হয় না। এক দক্ষিণ আফ্রিকা, চিলি, বলিভিয়া, ইকুয়েডর, ভেনেজুয়েলার ক্ষেত্রে উলটোটা ঘটেছে। কিন্তু এইসব দেশগুলি নিয়ে সাম্রাজ্যিকরা নানা ষড়যন্ত্র করে গেছে, আর দক্ষিণ আফ্রিকায় সাদা-কালোর আর্থিক বৈষম্য এখনও অতি প্রকট।

সামির উন্নত দেশের শ্রমিকশ্রেণির সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করতেন। ১৯৭০-এর দশকের শেষ দিক থেকে ব্রিটেনের মার্গারেট থ্যাচার এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রন্যাল্‌ড্ রীগ্যান শ্রমিকশ্রেণিকে পদানত করার জন্য যত রকমের রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ব্যবহার করা যায় তাই করেছেন। ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে নানাভাবে হেনস্থা করেছেন যাতে করে তাদের সভ্যসংখ্যা এবং শ্রমিকদের মধ্যে প্রতিপত্তি কমে যায়। শ্রম আইন বদলে শ্রমিকদের বাধ্য করেছেন 'নমনীয়' সময়ে কাজ করতে, অর্ধেক

সময়, বাড়িতে, নিজের যন্ত্রপাতি দিয়ে ইত্যাদি দিয়ে। ব্রিটেনে লেবার পার্টি ক্ষমতায় থাকায় এর কোনো পরিবর্তন হয়নি। শ্রমিকদের যা ছিটেফোঁটা সামাজিক সুরক্ষা ছিল তা ছাঁটাই করা হয়েছে। ফল হয়েছে এই যে গত তিরিশ বছরে শ্রমিকদের সত্যিকারের আয় ছিটেফোঁটাও বাড়েনি আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং ব্রিটেনে আর্থিক অসাম্য উল্লম্ফন গতিতে বেড়েছে। এই শ্রেণিকে সাম্রাজ্যবাদের দোসর বলা কতটা যুক্তিযুক্ত? ঠিকই যে, তাদের ভুল বোঝানো হয়েছে যে তাদের শত্রু হচ্ছে বাইরে থেকে আসা মেক্সিকান বা এশীয় শ্রমিক, যার জন্যে তারা ট্রাম্পের মতো বর্ণবিদ্বেষী, স্বৈরাচারী লোককে ভোট দিয়েছে। কিন্তু সমাজতন্ত্রীদের কর্তব্য হচ্ছে তাদের ঠিকমতো বোঝানো। যে শ্রমিকশ্রেণি মার্কসের মতে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ তৈরি করবে তাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা ঠিক নয়।

সামিরের বিশ্বদর্শনের আরেক দুর্বলতা এই যে, তিনি লক্ষ করেননি যে, আভ্যন্তরীণ সামাজিক পরিবর্তন হলে অনুন্নত দেশের পরনির্ভরতা কমে, এবং সে সমাজতন্ত্রী না হয়েও পৃথিবীর উন্নত ধনতন্ত্রী দেশের সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে বসতে পারে। এই সমাজ-পরিবর্তনের সবচেয়ে বড়ো অংশ হল এমন ভূমিসংস্কার যাতে জমিদার বা সামন্তশ্রেণি উৎপাটিত হয়। চিন এবং ভিয়েতনামে কমিউনিস্ট বিপ্লবের ফলে ভূমিসংস্কার হয়েছিল। এখন দুই দেশেই সমাজতন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে 'উত্তরণ' ঘটেছে। দক্ষির কোরিয়াতে প্রথম ভূমিসংস্কার করেছিল উত্তর-কোরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি যখন তারা কোরীয় যুদ্ধের সময় দক্ষিণ-কোরিয়ার অধিকাংশ দখল করেছিল। বাকিটা হয়েছিল কমিউনিস্টদের ভয়ে মার্কিনি তত্ত্বাবধানে। (একইভাবে জাপানেও ভূমিসংস্কার হয়েছিল— জাপানের সত্যিকারের শিল্পবিপ্লব যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে হয়েছিল লোকে তাও ভুলে যায়।) তাইওয়ানে যখন গুয়োমিন্‌দাঙ দল মূল ভূখণ্ড হয়, তখন তারা তাইওয়ানের আদি ভূস্বামীদের ক্ষমতাচ্যুত করল এবং তার ফলে সেখানে ভূমিসংস্কার হল। এখন চিন, দক্ষিণ-কোরিয়া, এবং তাইওয়ান অনেক উন্নত শিল্পক্ষেত্রে জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইয়োরোপের সঙ্গে টক্কর দিচ্ছে।

নিবেদন

পত্রিকার পরিসর বাড়ানো গেল না বলে কয়েকটি পরিকল্পিত লেখা এই সংখ্যায় প্রকাশ করা সম্ভব হল না। লেখাগুলি পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে প্রকাশিত হবে। সংশ্লিষ্ট লেখকরা আশা করি মার্জনা করবেন।

—সম্পাদক

সোমনাথদা ও সংসদের কিছু স্মৃতি

মালিনী ভট্টাচার্য

যে সংসদে সিপিআই (এম)-এর নেতা এবং পরে লোকসভার অধ্যক্ষ হিসাবে সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর বলিষ্ঠ উপস্থিতির ছাপ রেখে গেছেন, সেখানে তাঁর সহকর্মী হয়ে ১৯৮৯-১৯৯৬ সাল পর্যন্ত আমার থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল। তাঁর মৃত্যু এখন সেই সময়ের সংসদের অনেক স্মৃতি উসকে দিচ্ছে। এই নিবন্ধে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে আমি সেরকম কিছু স্মৃতিচারণই করব। তবে ব্যক্তিগত স্মৃতির চাইতে এখানে সামূহিক কিছু কথারই প্রাধান্য থাকবে, কারণ ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সঙ্গে আমার কখনোই খুব ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল না। নিজে সংসদে যাবার আগে বামপন্থী রাজনীতির এই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের সঙ্গে শুধু আলাপ জমানোর জন্য তাঁর কাছাকাছি যাবার কথা কখনো ভাবিনি, তা ছাড়া আমার পার্টিসদস্যতা সংসদে সিপিআই (এম) প্রার্থী হিসাবে নাম ঘোষিত হবার আগে পর্যন্ত অপ্রকাশ্য থাকার কারণে প্রকাশ্য রাজনৈতিক কর্মসূচিতে আমার গতায়াত ছিল খুব সীমিত।

১৯৯৬-এর পরেও তাঁর সঙ্গে লাগাতার যোগাযোগ আর খুব ছিল না, কিন্তু যখনই যোগাযোগ করেছি তাঁর সহায়তা ছিল অকৃপণ। যেমন, দেবেগৌড়া প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন একবার FOSET-এর পক্ষ থেকে তাঁর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারের প্রয়োজন হয়েছিল। সোমনাথদাকে আমি ফোনে জানাতেই তিনি সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। FOSET-এর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আমিও দিল্লি গিয়েছিলাম, এবং সোমনাথ-দা সাক্ষাৎকারের পুরো সময়টাই হাজির থেকে নজর রেখেছিলেন প্রধানমন্ত্রী যাতে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখেন। আরেক বার সম্ভবত ১৯৯৮-৯৯ সালে আমার পুরোনো নির্বাচনকেন্দ্রে একটি গ্রামীণ হাসপাতালের সাহায্যার্থে কিছু ব্যক্তির উদ্যোগে এবং বহু খ্যাতনামা শিল্পী অবারিত সৌজন্যে কলকাতার একটি হোটেলে একটি চিত্র-প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। আমাকে সবাই বলেছিলেন যাঁরা ছবি কিনতে পারেন তাঁদের আগমন যদি সুনিশ্চিত করতে চান, তাহলে সোমনাথ-দাকে দিয়ে উদ্‌বোধন করান। এ-কাজটিও তাঁকে অনুরোধ করায় বহু ব্যস্ততার মধ্যে তিনি সানন্দে করে দিয়েছিলেন, কারণ তিনি মনে করেছিলেন হাসপাতালটিতে অনেক লোকের উপকার হবে। আর ২০১৫ সালের জানুয়ারি মাসে তাঁকে দেখেছিলাম বোলপুরে তৃণমূলি হামলায় নিহত কমরেড হীরু ঘোষের স্মরণসভায়, এত অসুস্থ যে গাড়ি থেকে নামতেও পারেন না, তবু হাজির হয়েছেন একজন নিবেদিতপ্রাণ কমরেডের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে।

নিছকই ব্যক্তিগত স্মৃতি যেটা তা হল, সম্ভবত ১৯৯৯ সালে, যখন শ্রীনিকেতন-শান্তিনিকেতন ডেভেলপমেন্ট অথরিটির চেয়ারম্যান হিসাবে তিনি 'প্রান্তিক উপনগরী' গড়ে-তোলার কাজে হাত দিয়েছেন, তখন আমাদের ডেকে বলেছিলেন, আপনাদের তো এখনও নিজেদের কোনো ঘরবাড়ি নেই, আসুন না, প্রান্তিকে একটা বাড়ি করুন। একবারে জমি-কেনার সব টাকা আমরা দিতে পারব না জেনে কিস্তিতে টাকা দেবার বন্দোবস্তও করে দিয়েছিলেন। খুব খুশি হয়েছিলেন যখন আমরা সত্যিই সে-জমিতে একটি বাড়ি তুলতে পারলাম। সেই হিসেবে তাঁর উন্নয়নমুখী কর্মকাণ্ডের ফলভোগী আমরাও।

যাই হোক, ফিরে যাই সেই সময়টাতে যখন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ প্রায় নিত্যকার ব্যাপার ছিল। ১৯৮৪ সালে ইন্দিরা গান্ধী হত্যাকাণ্ডের ঠিক পরে পরেই যে সাধারণ নির্বাচন হয়, তাতে জন-আবেগের ডানায় ভর করে কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে লোকসভার বেশ কিছু আসনে জিততে সক্ষম হয়। কিন্তু যাদবপুরের মতো কেন্দ্রে সোমনাথদার মতো সাংসদ যে পরাজিত হতে পারেন, এটা বোধহয় তৎকালীন বিরোধীপক্ষেরও হিসাবের বাইরে ছিল। অপপ্রচারের একটা ঢেউ ছিল যেটাকে সুকৌশলে কাজে লাগানো হয়েছিল, সোমনাথদা খুব ক্ষুব্ধভাবে বলতেন, দেখুন দেখি, কোনোদিন একটা কুকুর পুষলাম না, আর সেই আমার বিরুদ্ধেই কুকুর লেলিয়ে দেবার নালিশ!

এই পরাজয়কে তিনি কখনো খাটো করে দেখেননি, নতুন প্রতিপক্ষ কতটা বিপজ্জনক তা তাঁর খুব ভালো ধারণা ছিল এবং যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, মিথ্যাচারের প্রতি ঘৃণা পোষণ করতেন বলেই সিপিআই (এম)-এর সঙ্গে আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক

ছেদের পরেও তার প্রতিপক্ষকে কখনো নিজের ধারে-কাছে ঘেঁষার কোনো সুযোগ দেননি। নিজেও কখনো বামপন্থার প্রতি তাঁর বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হননি। তবে আমার ধারণা, যাদবপুরের মতো কেন্দ্রেও বামপন্থীদের মধ্যে যে ত্রুটিবিচ্যুতি ঢুকছিল সে-সম্বন্ধে তিনি খুব ভালোভাবেই অবহিত হয়ে যান এই পরাজয়ের পরে। আমি যখন সংসদে তাঁর সহকর্মী তখন আমার কাছ থেকে মধ্যে মধ্যে যাদবপুরের খবর নিতেন। আর তখন দেখতাম তাঁর পুরোনো নির্বাচনী কেন্দ্রের হাল-হকিকত সম্বন্ধে তিনি মোটামুটি সবই জানেন। আর একথা তো সত্যিই অস্বীকার করার নয়, যে ১৯৮৪-তে সোমনাথদার পরাজয়ের পর সিপিআই (এম) বামফ্রন্ট আমলে অনুষ্ঠিত মাত্র তিনটি সাধারণ নির্বাচনে ওই লোকসভা কেন্দ্রে জিততে পেরেছে। দু-বার প্রার্থী ছিলাম আমি, একবার যাদবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বর্তমান বিধায়ক সুজন চক্রবর্তী।

১৯৮৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে আমার প্রার্থীপদপ্রাপ্তি ছিল নিতান্তই আকস্মিক, আমার পক্ষে তো বটেই। তার অনেক আগেই সোমনাথদা বোলপুর কেন্দ্রের উপনির্বাচনে জিতে সেখানকার সাংসদ হয়ে লোকসভায় ফিরে গেছেন। যদি-বা নির্বাচনে জিতি তবু আমার মতো আনকোরা লোকের পক্ষে সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের শূন্যস্থান পূরণ করার দুরাশা যে অবাস্তব হবে এই বোধ নিয়েই লড়তে নামা। নির্বাচনী প্রচারে যেখানেই যাই সেখানেই তিনি তাঁর ছাপ রেখে গেছেন, আর সে ছাপের মাপটা অনেকটাই বড়ো তাও জানি। তবু বিস্মিত হই, তাঁর ওপর শ্রদ্ধা বেড়ে যায় যখন দেখি তাঁর পারিবারিক পরিচয় অনেক উঁচুতলার হলেও সাংসদ পরিচয়ে তিনি মাটির কতটা কাছাকাছি যাবার চেষ্টা করেছেন।

আশির দশকেও যাদবপুর কেন্দ্রের যেসব গ্রামীণ অঞ্চল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মধ্যে (আরো আগে সংযুক্ত চব্বিশ পরগনার মধ্যে) ছিল, তার অনেক জায়গাতেই না ছিল রাস্তা, না ছিল আলো, বিস্তীর্ণ খেত আর মাঠ, পুকুর, জলা আর জঙ্গল, একটু বৃষ্টির পরেই পিচ্ছিল এঁটেল মাটি আর খড়ো চালের ঘর। প্রান্তিক অঞ্চলে পুরোনো দালানবাড়ি একেবারে ছিল না তা নয়, কিন্তু কম। অনেক খালের ওপর বাঁশের সাঁকো দিয়েই পার হতে হত। রাত দশটা-এগারোটার সময়ে নির্জন অন্ধকার জংলা রাস্তায় মাইলের পর মাইল চলার চাপ সইতে না পেরে আমি যে গাড়ি ব্যবহার করতাম তার প্রথম চালকটি এক সপ্তাহ বাদে আর ডিউটিতে আসেনি। যেখানেই যেতাম, শুনতাম সোমনাথদার কথা। দেখতাম তাঁর রাশভারি ব্যক্তিত্ব সত্ত্বেও তিনি দূর গ্রামাঞ্চলের কত সাধারণ কর্মীর কাছের লোক ছিলেন এবং সাংসদ হিসাবেই শুধু নয়, যাদের হয়ে তিনি মামলা লড়তেন তারাও তাঁর ওপর কতখানি ভরসা রাখত।

ডায়মন্ড-হারবার রোডে জোকা ছাড়িয়ে তৎকালীন পূর্ব-বিষ্ণুপুর বিধানসভা কেন্দ্রের দিকে যেতে ভাসা বলে একটি জায়গা আছে। বর্ষাকালে ভাসত বলে 'ভাসা'। সেখানে একেবারে রাস্তার ওপরেই একটি আভেজানো দরজা খুলে ঢুকে পড়া যেত এক গৃহস্থবাড়ির উঠোনে। একতলা বাড়িটি ইটের ছিল, চাল বোধহয় টিনের। তুলনায় সম্পন্ন কৃষক পরিবারটির কর্তা ছিলেন পার্টি-সমর্থক। বাড়িতে ঢুকলে তিনি সাদর অভ্যর্থনা করে বললেন, সোমনাথদা তো এ-পথে যেতে হলে সবসময়ে আমার বাড়ি হয়ে যেতেন, চা খেতেন, গল্প করতেন, এলাকার খবরাখবর নিতেন। আপনিও আসবেন। মগরাহাট কেন্দ্রে তেভাগার যোদ্ধা মানিক হাজরার বাড়িতে গেলে মানিকদাও বললেন সোমনাথদার কথা। আরেক বার বারুইপুরের প্রত্যন্ত এলাকায় গিয়ে শুনলাম সেটা ডাকাতদের জায়গা। সোমনাথদা রাত্রে গ্রামের ভিতর মিটিং করে ফেরার পথে তারা নাকি কাঠের পোল থেকে পাটাতন আলগা করে রেখে দিয়েছিল।

এইসব গল্প শুনতে শুনতে ভোটটা হয়ে গেল, আমরা জিতেও গেলাম এবং কংগ্রেসবিরোধী বিরাট জন-আলোড়নের মধ্যে নতুন লোকসভা গঠিত হল। যে বিপুল জনসমর্থন নিয়ে রাজীব গান্ধী সংসদে এসেছিলেন তা তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বের শেষদিকে তলানিতে পৌঁছে যায়। স্বেচ্ছাচার এবং দুর্নীতির প্রতিবাদে বামপন্থী সাংসদেরা এই আমলের শেষভাগে লোকসভা বয়কট করেছিলেন এবং ১৯৮৯ সালে ভিপি সিং-এর নেতৃত্বে একটি বিকল্প সরকার গড়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। বামপন্থীরা এই বিকল্পকে সমর্থন করেন। কিন্তু রাজীবের আমলেই বাবরি মসজিদের তালাখোলা এবং সেখানে মন্দির গড়ার জন্য শিলাপূজনের বিষয়ে কংগ্রেসের নরম মনোভাবের ফলে বিজেপি রামমন্দিরের ধুয়ো তুলে মানুষের অসন্তোষকে ব্যবহার করা শুরু করেছিল, ১৯৮৯ সালের নির্বাচনে তাদেরও বিশেষ বাড়বাড়ন্ত ঘটল। ভিপি সিং-এর নানা দল নিয়ে গড়া সরকার তাই গোড়া থেকেই যথেষ্ট মজবুত হতে পারেনি, সরকারের বিরুদ্ধে তারা ভোট দেবে না, বিজেপি-র এই আশ্বাসের ওপর ভরসা করে ভিপি সিং-কে সরকার গড়তে হয়। বামপন্থীরা বিজেপি-র সঙ্গে হাত মিলিয়ে কংগ্রেসবিরোধী সরকার গড়তে সাহায্য করেছিল, এই অপপ্রচার নতুন করে ফিরে আসছে বলেই এ ইতিহাস জানা দরকার।

বস্তুত ১৯৮৯ সালের নির্বাচনে বামপন্থীদের জনসমর্থন সারা দেশেই বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং অনেকগুলি রাজ্য থেকে বামপন্থী প্রতিনিধিরা সংসদে আসতে পেরেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে সেবার সম্ভবত ৪২টি লোকসভা আসনের মধ্যে ৩৯টিতেই বামপন্থীরা জিতেছিলেন। নতুন সরকারের কাছে বামপন্থীদের

সমর্থন যে শুধু সংখ্যাগতভাবে জরুরি ছিল তাই নয়, সংসদীয় কাজকর্মে তাঁদের মতামত বিশেষ গুরুত্বও পেত, বিশেষত বিজেপিকে ঠেকিয়ে রাখার স্বার্থে। বিজেপি অবশ্য স্বধর্ম অনুসারে প্রথম সুযোগেই কথার খেলাপ করে এবং মণ্ডল কমিশনের রায় কার্যকরী করতে সরকার পদক্ষেপ নেওয়ার পরেই হিংস্রভাবে রাস্তায় নামে, ছাত্রদের প্ররোচিত করে গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যায়, ওদিকে 'মণ্ডলে'-র সঙ্গে 'কমণ্ডলে'-র রাজনীতি যুক্ত করে আদবানি চলেন 'রথযাত্রা'-য়।

শেষপর্যন্ত বামপন্থীরা দৃঢ়ভাবে তাঁর পাশে থাকা সত্ত্বেও ভিপি সিং পদত্যাগ করতে বাধ্য হন, ফলত মণ্ডল-কমণ্ডলের রাজনীতির কাছে সংসদীয় নৈতিকতা হার মানে, জোট বিপর্যস্ত হয়, চন্দ্রশেখরের সংক্ষিপ্ত সুবিধাবাদী জমানার পরে আবার ঘোষিত হয় সাধারণ নির্বাচন, রাজীব গান্ধীর স্বল্পপরিসর রাজনৈতিক জীবনের রক্তাক্ত ট্রাজিক পরিসমাপ্তি কংগ্রেসকে আবার পাঁচ বছরের জন্য সুযোগ করে দেয় ভারতের শাসনক্ষমতায় ফিরে আসার। নরসিংহ রাও হন প্রধানমন্ত্রী। রাজনীতির ছাত্রমাত্রেরই এসব কথা জানা, আমি পুনরাবৃত্তি করছি শুধু এই কথা বোঝানোর জন্য যে এরকম একটা সময়ে সোমনাথদাকে সংসদীয় দলের নেতা হিসাবে পাওয়াটা বামপন্থীদের নিজস্ব ভূমিকা পালনে অত্যন্ত সহায়ক হয়েছিল। তাঁর সাংবিধানিক জ্ঞান ছিল ভিপি সিং সরকারের একটি বড়ো পাথেয় এবং এই সংক্ষিপ্ত সময়ে অনেক গণ্ডগোলের মধ্যেও কিছু কিছু সদর্থক পদক্ষেপ নেওয়া হয় যেখানে বামপন্থীদের অংশীদারিত্ব ছিল তর্কাতীত।

দুটি আইনের কথা উদাহরণস্বরূপ মনে করা যায়, যার তাৎপর্য আজকের সংবিধান-নিধনের দিনে আরো বেশি করে স্মরণ করা উচিত। একটি হল জাতীয় মহিলা কমিশন আইন, যার দাবি বহুদিন ধরেই নারী-আন্দোলনের মধ্য থেকে উঠছিল, কিন্তু যা নিয়ে কংগ্রেস জমানায় টালবাহানা ও ভাঁওতাবাজির অন্ত ছিল না। বস্তুত ভিপি সিং-এর সরকার প্রথম যে খসড়া বিলটি সংসদে পেশ করে তাতেও এক নাম-কা-ওয়াস্তে কমিশনই গড়া যেত। কী করলে কমিশনের স্বাধিকার ও মর্যাদা বজায় থাকবে, মেয়েদের সমস্যা ও তাঁদের দাবিগুলিকে প্রকৃতই সরকারের কাছে তুলে ধরার ভূমিকা কীভাবে কমিশন পালন করবে তার হদিশ এসেছিল বামপন্থীদের কাছ থেকেই। লোকসভায় সোমনাথদার যে অখণ্ড সম্মান ছিল তারই জোরে আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল প্রধানমন্ত্রীকে বিলটি কেমন হওয়া উচিত তা বুঝিয়ে বলা এবং অন্যান্য দলের সদস্যদের তাতে রাজি করানো।

অন্য যে আইনটি এইসময়ে বামপন্থীদের সক্রিয় সাহায্যে পাশ হয়, তা প্রসারভারতী সংক্রান্ত। ইন্দিরা-রাজীব জমানায় দূরদর্শনকে শাসকদল যেভাবে ব্যবহার করছিল তার প্রতিরোধে মিডিয়ার স্বাধিকারকে আইনি মান্যতা দেবার দাবি সেই সময়কারই, কিন্তু কংগ্রেস সরকার এই দাবি পূরণে নিষ্ক্রিয়ই ছিল। ১৯৮৯ সালের জোট সরকার এই আইন পাশে যথেষ্ট উৎসাহ দেখায় এবং এখানেও সোমনাথদার নেতৃত্বে বামপন্থীরা সবরকমে তার সহায়তা করেছিলেন। মনে রাখতে হবে, এইসময়ে বেসরকারি কেবল টিভি সবে দেশে ঢুকছে। প্রসারভারতী বিলে প্রসারভারতীর স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করার বিষয়টি যতটা গুরুত্ব পেয়েছিল, অন্যদিকে মিডিয়ার ওপর কর্পোরেট পুঁজির বর্ধমান দখলদারি নিয়ে চিন্তাভাবনার কিছুটা ঘাটতিই ছিল।

তবু বলতে হবে মহিলা কমিশন বিল এবং প্রসারভারতী বিল পাশ করানোর ক্ষেত্রে সংসদীয় গণতন্ত্রের রীতিনীতি যে সম্মান পেয়েছিল, তা উল্লেখ করার মতো। সংসদের বাইরে এগুলি নিয়ে আলাপ আলোচনা উৎসাহিত হয়েছিল, আজকের দিনে যেটা বিরল থেকে বিরলতর হচ্ছে— সংসদকক্ষেও বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিরা বিলদুটি নিয়ে সদর্থক বিতর্কে যুক্ত হন, এমনকী প্রসারভারতী বিলে সোমনাথদার মধ্যস্থতায় মন্ত্রী আমাদের দু-একটি সংশোধনীও গ্রহণ করেছিলেন। আজকের দিনে এই আইনগুলি নিয়ে আর আলোচনা হয় না, তার কারণ দুটি আইনই এমন যে, তা কার্যকরী করাতে হলে সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রয়োজন হয়, এই আইনদুটির কার্যকারিতা থেকে সরকার কতটা গণতান্ত্রিক তার হদিশও পাওয়া যায়। অন্যদিকে সরকার গণতন্ত্রবিরোধী হলে স্বভাবতই তার পছন্দ হয় না দেশে মেয়েদের অবস্থার পরিমাপ বোঝার জন্য বা গণমাধ্যমের সুস্বাস্থ্যের জন্য কোনো স্বাধিকারপ্রাপ্ত সংস্থা। বরং এমন সরকার মহিলা কমিশন বা প্রসারভারতীর স্বকীয়তাকে বিনষ্ট করতেই আগ্রহী হয়, যা আমরা বর্তমানে দেখছি।

সোমনাথদার গভীর আস্থা ছিল সংসদীয় গণতন্ত্রের ওপর, এবং বামপন্থী সাংসদেরা যাতে তার নিয়মকানুন জানেন এবং তা বজায় রেখেই কাজ করেন, সেদিকে তাঁর সবসময়েই দৃষ্টি থাকত। জিরো আওয়ারের সুযোগ নিয়ে আমাদের সাংসদেরা কোনো তাৎক্ষণিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারলে তিনি খুশি হতেন এবং নিজে সামনের বেঞ্চে বসে উৎসাহ দিতেন। সাংসদদের প্রস্তুতির বিষয়েও তিনি একজন সত্যিকারের নেতার মতোই খোঁজখবর রাখতেন। কেউ কোনো বিষয়ে নিজে থেকে বলতে চাইলে সে ইচ্ছাকে ন্যায্য সম্মান জানাতেন।

যে দু-একজন মহিলা সাংসদ বিভিন্ন দলে থাকেন তাঁদের সাধারণত ডাক পড়ে মেয়েদের নিয়ে কোনো বিষয় সংসদে উঠলে তবেই। আনকোরা সাংসদ হলেও আমার মনে এই ইচ্ছা

ছিল যে অন্যান্য যে বিষয়ে আমার আগ্রহ আছে তা নিয়ে বলি। সোমনাথদা একথা জানতে পেরে যেখানে সম্ভব আমাকে বলার সুযোগ দিতেন। এইভাবেই সংসদে থাকাকালীন বক্তব্য পেশ করার সুযোগ পেয়েছি বাবরি মসজিদ বা মেধাস্বত্ব আইন বিষয়ে। প্রতি সপ্তাহেই দলীয় সাংসদদের সঙ্গে বসে তিনি ঠিক করতেন আগামী দিনে কোন বিষয়গুলি আসতে পারে বা কোন প্রশ্ন সংসদকক্ষে তুলতে হবে। কখনো কখনো জটিল বিষয় থাকলে বিশেষজ্ঞদের ডাকা হত আলোচনার জন্য। আলোচনা ও বিতর্ক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাণভোমরা, তার যে ক্রমবিনাশ আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি তার সূত্রপাত সোমনাথদা সংসদে থাকতেই হয়েছে, কিন্তু পরে সাংবিধানিকতারই তছনছ হয়ে যাওয়া আর ভেতরে বসে তাঁকে দেখতে হয়নি, বাইরে থেকেও তা নিশ্চয়ই তাঁর মতো মানুষের পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক হয়েছিল।

তাঁর এই যন্ত্রণার ছবি দেখেছি ১৯৯২ সালের ডিসেম্বরে যখন বিজেপি-র সাংসদীয় নেতাদের প্রত্যক্ষ মদতে প্রকাশ্য দিবালোকে সশস্ত্র হিন্দুত্ববাদী গুন্ডারা বাবরি মসজিদের সৌধটি ধূলিসাৎ করল। এ ভয় তো তারা অনেকদিন ধরেই দেখাচ্ছিল, কিন্তু এইভাবে যে তারা সম্পূর্ণ অসংসদীয় পদ্ধতিতে নিজেদের প্রতিশ্রুতি কার্যকরী করে পেশীশক্তির জয় ঘোষণা করবে, এটা সোমনাথদার রাজনৈতিক জীবনের সবচাইতে গভীর বিশ্বাসকে আঘাত করেছিল। তিনি বোধহয় ভেবেছিলেন, শেষপর্যন্ত কিছু একটা রাস্তা বেরোবে সংসদের মধ্য থেকেই, করসেবকেরা পুজোআচ্চা করেই ফিরে যাবে আদবানির এই আশ্বাস যে মিথ্যা প্রমাণিত হবে এবং ধ্বংস যখন চলছে তখনও যে প্রধানমন্ত্রীর কারণবিহীন অনুপস্থিতির দরুণ সংসদ সে বিষয়ে কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে পারবে না, এটা বোধহয় তাঁর মতো অভিজ্ঞ সাংসদের কাছেও অকল্পনীয় ছিল। পরে যখন সংসদে এ-বিষয়ে আলোচনা হয় তখন অগ্নিস্রাবী ভাষায় এর নিন্দা করেছিলেন। কংগ্রেস সরকারকে যে এর দায় নিতে হবে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তা বলেছিলেন, কিন্তু তখন তো যা হবার হয়েই গেছে।

ধাক্কাটা তাঁর এতই লেগেছিল যে সংসদের বাইরে যেসব প্রতিবাদ তখন চলছিল সেগুলি সম্বন্ধেও তিনি যেন সন্দিহান ছিলেন যে সংঘ পরিবারের গুন্ডারা এতে না আরো উসকানি পায়। ১৯৯৩-এর ১৫ অগাস্ট সফদর হাশমি স্মারক সংস্থা (সহমত) থেকে অযোধ্যায় সরযূর তীরে সম্প্রীতির বার্তা নিয়ে যে বিশাল সাংস্কৃতিক সমাবেশ হয়েছিল তাতে আমাকে যেতে দিতে তাঁর একটু আপত্তিই ছিল, বলেছিলেন, এসব করে আবার খুঁচিয়ে তোলা কেন? একটু ঠান্ডা হতে দিন না! পরে নিশ্চিন্ত হন খোদ কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী অর্জুন সিং সেখানে যাবেন শুনে।

সে-সময়ে সংসদে বামপন্থীরা শুধু সংখ্যাতেই বেশি ছিল না, তাদের প্রসিদ্ধি ছিল 'বিপিএল' এমপি হিসাবে। তারা টাকা দিয়ে নমিনেশন পায় না, সংসদকে টাকা কামানোর জায়গা বলে মনে করে না এবং সাদাসিধে জীবনযাপন করে এটা যেন স্বতঃসিদ্ধভাবে সবাই জেনে গিয়েছিল। পেশীশক্তি ও অর্থশক্তির দাপট তখন সংসদে ছিল না এমনটা নয়, কিন্তু সংসদীয় রীতিনীতির প্রতি লোকদেখানো সম্মান অন্তত বজায় ছিল বলে বামপন্থীদের এই ভিন্নতাও কিছুটা সম্ভ্রম অর্জন করত। এই 'বিপিএল' সাংসদদের নেতা ছিলেন সোমনাথদা, যিনি নিজে মোটেই বিপিএল ছিলেন না বা তা দেখানোর চেষ্টাও করতেন না। টাকাওয়ালাদের মহলেও তাঁর ছিল যথেষ্ট প্রতিপত্তি। কিন্তু তাঁর চরিত্রে এমনই সবল এক স্বচ্ছতার বার্তা ছিল যা স্পষ্ট জানাত যে এই লোকটি স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়, সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করবে বলেই সংসদে এসেছে।

সেই সময়ে এই বার্তার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। নরসিংহ রাও এবং তাঁর অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর জমানায় ভারতের অর্থনীতি অপ্রতিরোধ্য বাঁক নিল নয়া উদারনীতির দিকে, তারই ঈশারা পাওয়া যাচ্ছিল সংসদের অভ্যন্তরীণ হাওয়াবদলেও। একের পরে এক আর্থিক কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে যাচ্ছিল মন্ত্রী-সাংসদদের নাম, সাংসদ কেনা-বেচা বা সরকারকে বাঁচানোর জন্য ভোট কেনা-বেচার অভিযোগ উঠে আসছিল, যে উদগ্র অর্থলোভের ওপর নয়া উদারনীতির মতাদর্শগত ভিত্তি তার উদাহরণ পাওয়া যাচ্ছিল সাংসদদের ব্যবহারে। সোমনাথদার নেতৃত্বে বামপন্থীরা বরাবর চেয়েছে সাংসদদের বেতনভাতা কোনো নিরপেক্ষ সংস্থা ঠিক করুক, এই পরিবেশে এটা যেন হাসিঠাট্টার বিষয় হয়ে উঠছিল। বামপন্থীরা দ্বিধাহীনভাবে নয়া উদারনীতির বিরোধী, কিন্তু এই বিরোধিতাকে বিশ্বাস্য করতে হলে ব্যক্তিজীবনেও চাই নৈতিক স্বচ্ছতা। সেখানে সোমনাথদার নিষ্কলঙ্ক ভাবমূর্তি আমাদের সংসদীয় দলের নোঙরের মতো ছিল।

নয়া উদারনীতি নানাভাবে ভিতরে ভিতরে সম্মোহের শিকড় ছড়ায়। বামপন্থীরা যে তার প্রভাব থেকে একেবারে মুক্ত থাকতে পেরেছে তা নয়। ব্যক্তিগত জীবনে দুর্নীতি বামপন্থীদের মধ্যে সাধারণভাবে অনেক কম, কিন্তু নয়া উদারনীতি 'আর্থিক সংস্কার'-নির্ভর যে উন্নয়নের নকল ছবি দেখায় তাতে অনেকসময়ে বামপন্থীদেরও চোখ ধাঁধায়। এমনকী, পশ্চিমবঙ্গেও কিছু কিছু বামপন্থীকে বলতে শুনি, যাই বলো, তৃণমূলের আমলে রাস্তাঘাট তো ভালো হয়েছে, অনেক আলো তো বসেছে, ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো তো হচ্ছে, আর লোকে চাকরি না পাক, সিভিক পুলিশের কাজ করে বা দেওয়ালে নীল-সাদা রং লাগিয়ে কিছু তো রোজগার করছে। এমন একটা মতবাদও

আছে যে ওপরতলার কর্তাদের যদি বাড়বাড়ন্ত ঘটে তার খানিকটা নীচে চুইয়ে পড়বেই। এই প্রসঙ্গে এখন আবার কেউ কেউ বলতে শুরু করেছেন, সোমনাথদা 'আর্থিক সংস্কারে'-র বিপক্ষে ছিলেন না।

উন্নয়নের অনুব্রত-মডেল চালু হবার অনেক আগে থেকেই সোমনাথদা পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়নের একজন দিশারী এবং কাজে করে দেখিয়েছেন তাঁর দক্ষতা। অনেকসময়ে হয়তো উন্নয়নের বহিরঙ্গের ওপর তিনি ভরসা রেখেছেন বেশি, দ্রুত নগরায়ণ, বড়ো করে পানীয় জলের প্রকল্প, গীতাঞ্জলির মতো বিরাট সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, পর্যটনের বাড়বাড়ন্তকে গুরুত্ব দিয়েছেন। কারখানার শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় তাঁর আইনি দক্ষতাকে পুরো কাজে লাগিয়েও এ জমানায় বড়ো বড়ো সরকার-পোষিত কলকারখানার অন্ধকার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল। হয়তো তিনি মনে করেছিলেন, এই ব্যবস্থাকে বদলানোর যখন কোনো উপায় দেখা যাচ্ছে না তখন 'আর্থিক সংস্কারে'-র মডেলকে ব্যবহার করেই যারা বঞ্চিত তাদের কিছুটা সুবিধা করা যায় কিনা দেখা যাক। যাদের কথা ভেবে তাঁর গঠনমূলক প্রতিভাকে তিনি এইসব কাজে নিয়োজিত করেছিলেন, আজকের দিনে তারা তার থেকে কোনো উপকার পাচ্ছে কিনা এ-প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। কিন্তু নয়া উদারবাদী 'আর্থিক সংস্কার'-এর মধ্যে শেষপর্যন্ত খেটে-খাওয়া মানুষের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার যে মৌল উপাদান রয়েছে সে-সম্বন্ধে তিনি অবহিত ছিলেন না, বা বামপন্থীদের নেতা হিসাবে সংসদে তিনি নয়া উদারনীতির বিরুদ্ধে যে প্রকাশ্য অবস্থান নিয়েছেন সে শুধু তাঁর মুখের কথা ছিল, একথা বললে তাঁর যথার্থ মূল্যায়ন হবে না।

We believe in Equity, Integrity, Honesty, Selfreliance, Democracy, Social Responsibility and Efficiency

The Eastern Railway Employees' Co-Operative Bank Ltd.
(SINCE 1912)

ADMN. Office
10 Strand Road, Kolkata – 700 001
Branches
Kolkata (Fairlie Place), Howrah, Liluah, Asansol, Jamalpur, Danapur & Mughalsarai

মুক্ত বেণী পিঠের পরে লোটে

দেবেশ রায়

পলাশ বরন পালের কাছে কিন্তু কৃতজ্ঞই বোধ করছি। তিনি অন্যত্র প্রকাশিত তাঁর একটি ছোট লেখাতে আমাকে উৎসুক করে তুলেছেন, বিশেষ করে গানে, রবীন্দ্রনাথের ক্রিয়াপদ ব্যবহার নিয়ে।

'লোটে' ক্রিয়া যেমন বাচ্যের একটা সমাধান ঘটায় তেমনি নানা ধরনের অসমাপিকার ও অন্য পদের সংযোগে নতুন এক অর্থও রচনা করতে থাকে। ব্যবহারিক অপ্রমিত গদ্যে, অর্থাৎ মুখের কথায়, এমন ধরনের প্রয়োগ খুব শোনা যায়, অনেক সময় সেগুলো প্রবাদ হয়ে ওঠে।

'মেয়েলি কথা' বলে যে-ধরনের বাক্য তৈরিকে এক সময় চিহ্নিত করা হত— তখন মেয়েদের শিক্ষার হার ছিল প্রায় শূন্যের কাছাকাছি কিন্তু সেই কারণে মেয়েরা তো আর বোবা হয়ে থাকতেন না, বরং বাধ্যতই তাঁদের কথা বলতে হত অনেক বেশিই হয়তো ও সংসারে বা ক্ষেতির কাজে তাঁদের কাজকে, তাঁদের আপাত-অসংলগ্ন কাজগুলিকে সংলগ্ন করতে। ইংরেজ-আমলে কলকারখানায় চা-বাগানে, খনিতে, মাটির ওপরের কাজে, পাথরভাঙার কাজে, ছাদ-পেটানোর কাজে, বা সমতুল্য এমন আরো কিছু কাজে, মেয়েশ্রমিক নিযুক্ত করা হত। মেয়েদের মজুরি কম ছিল। তখন মেয়েদের ভাষাতেও সেই অভিজ্ঞতা সঞ্চারিত হত কিন্তু বিশেষ বাচনেই।

কৃষিকাজের নানা স্তরে, মাছ ধরার যে-সব কাজ জলে না গিয়ে করা যায় তেমন কাজে বা কম জলে মীন ধরার কাজে, বা খালের মাটি বইবার কাজে বা জোলাদের রং তৈরির কাজে, সুতো গুটনোর কাজে মেয়েরাই খাটতেন। কাজ থেকেই তো ভাষা গলায় ও ঠোঁটে আসে। মেয়েলি বাচনের বিশিষ্টতা প্রাচীন, পরিবর্তনশীল, ধারাবাহিক ও জীবন্ত। মেয়েদের ঝগড়ার একটা সামাজিক প্রয়োজনও ছিল। এই বিশেষ বাচনের পক্ষে নারীবাদী যুক্তিই প্রবল হতে পারে— মেয়েদের একটা 'নিজস্ব' ভাষাজগৎ ছিল ও সে-ভাষার সঙ্গে বিশিষ্ট নারীভঙ্গিও অন্বিত। কথা তো আর শুধু ধ্বনি নয়, কথা তো বলা হয় সারা শরীর দিয়ে। তেমন বলাতে কথা হাত-পা পায়, কথাটাকে যেন দেখা যায়। আমাদের ছেলেবেলাতে বা বড় হয়েও কোনো-কোনো মেয়ের নামডাক শুনেছি কোন্দল-কুশলা হিশেবে। তাঁদের মুখের সামনে কেউ দাঁড়াতে পারত না। আমাদের বাড়িতে মাতৃসমা একজন, কাউকে না পেলে, নিজের সঙ্গেই কথা বলতেন। আমরা যদি জিজ্ঞেস করতাম, 'কাকে বলছ', সঙ্গে-সঙ্গে শুরু হত 'কাকে আবার কই, নিজেরেই কই'। তিনি ঘুমের মধ্যেও কথা বলতেন। সে-কথায় ঘুম মেশানো থাকত। কারো কোনো অসুবিধে হত না।

বাংলার ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার প্রধানতম বাধা এইখানে যে আমরা ধরেই নি, বাংলা একটা প্রতিষ্ঠিত, প্রমাণিত ও রীতিনীতি নিয়ন্ত্রিত ভাষা। আবার, এ-কথা মেনে ও এর ভিত্তিতেই আমাদের তত্ত্ব তৈরি করে আমরা বলি যে বাংলা গদ্য তৈরি হয়েছে ইংরেজরা আসার পর। সে বাংলা গদ্য একটা মান্য ভাষাও তৈরি করে দিয়েছে বলে আমরা মেনে নি। তা হলে বাংলাভাষাটা হয়ে দাঁড়ায় দুটো অভিমুখিনতার মিলন: মান্য গদ্যের ও মান্য মুখের কথার। তা হলে, ইংরেজরা বাংলাভাষা ও কলকাতা শহর 'তৈরি' করার কাজে লাগার আগে— ধরা যাক ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের এদিক-ওদিক— যে এক হাজার বছরের বাংলা সাহিত্য যেটা গাওয়া হত, পড়া হত ও লেখাও হত (বাংলা ভাষায় লেখা সবচেয়ে পুরনো পুথির রচনাকাল অন্তত চতুর্দশ শতক বলে সবাই মেনে নিয়েছেন।) কোন্ ভাষায়, যার সর্বজনবোধ্যতা ও মান্যতা সম্পর্কে কোনো সংশয় ছিল না। ও কলকাতাহীন বাংলা জনপদে সে-ভাষা চলত। গ্রিয়ারসনের মত নিষ্ঠাবান ও সন্ধানী ভাষাতাত্ত্বিক 'মৌখিক ভাষার লিখিত রূপ', 'স্ট্যান্ডার্ড ভাষা' ও 'অস্ট্যান্ডার্ড ভাষা', ভাষার বাচ্যনির্মাণের একটা স্বীকৃত ও মান্য কাঠামো, ঐ ভাষার সঙ্গে যুক্ত আরো বিবিধ সব গড়ন, যতই প্রচলিত হোক, সেগুলি 'উপভাষা'— এমন একটিমাত্র বৃক্ষবৎ সরল কাঠামো তৈরি করেছিলেন। তাঁর দিক থেকে তেমন একটি ভাষাবৃক্ষ তৈরি করা খুবই যুক্তিযুক্ত। সেই ভাষাবৃক্ষের কল্পনা ও কিছু উদাহরণ তাঁর জানা ভাষাতত্ত্বের সঙ্গতিপূর্ণ, ও যে বাঙালি ভারতীয়রা তাঁর ভাষাতত্ত্ব মেনে নেন ও সেই ভাষাতত্ত্বেই শিক্ষিত, তাঁদের পক্ষে সহজবোধ্য ও

সহজপ্রযোজ্য। তাঁরা গ্রিয়ারসনের ওই ভাষাবৃক্ষকে ভারতের ভাষাগুলির ওপর অনায়াসে পুঁতে দিতে পারলেন সংস্কৃতের ওপর নির্দ্বিধ ভরসায়। সংস্কৃতই যদি সমস্ত ভারতীয় ভাষার একমাত্র উৎস হয়— তাহলে তো ওই ভাষাবৃক্ষটিকে আরো ঘন পত্রপল্লব শাখাময় করে তোলা যায়।

গ্রিয়ারসন পাশ্চাত্য ভাষাতত্ত্বের শিক্ষিত প্রগাঢ় গবেষক। সে-ভাষাতত্ত্বের প্রধান ভিত্তি ভাষার বর্গভাগ। গ্রিয়ারসন ভারতীয় ভাষাগুলির যে বর্গভাগ করেছেন, সে-বর্গভাগ তাঁর বিজ্ঞান অনুযায়ী সংগত ও স্বীকার্য। কিন্তু ইয়োরোপীয় যে জ্ঞানপর্ব ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে সাম্রাজ্যবিস্তার ও সভ্যতাবিস্তারকে এক করে ফেলেছিল, সেই জ্ঞানতত্ত্বেরই অন্তর্গত ভাষাতত্ত্ব একটা উপনিবেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতেই পারে না।

তা ছাড়াও একটা প্রাথমিক সত্য ভুলে যাওয়া হয় ভাষাতত্ত্ব একটি আনুমানিক বিজ্ঞান— কোনো টেরিটরির বা ভৌগোলিক সীমার প্রকৃতি, ইতিহাস, জনবিন্যাস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাই ভাষাতত্ত্ব পরীক্ষা প্রমাণিত বিজ্ঞান নয়। বলা যায় অবকৃষ্ট বিজ্ঞান।

আমার এই কথার পক্ষে তিনটি মাত্র প্রমাণ দিতে চাই। প্রথম প্রমাণ স্বয়ং গ্রিয়ারসন। অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-এর 'দি অরিজিন অ্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট অব দি বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ'-এর মুখবন্ধে গ্রিয়ারসেনের একটি স্পষ্ট উক্তি (১৯২৫), 'আমরা অধ্যাপক চ্যাটার্জির শ্রমের এই পরিণত ফসলকে সহৃদয় স্বাগত জানাই। তাঁর মাতৃভাষা বাংলার সঙ্গে তাঁর আত্মিক, অঙ্গাঙ্গী ঘনিষ্ঠতার ফলে তিনি এত পরিমাণ সাক্ষ্য উপস্থিত করতে পেরেছেন যা কোনো ইয়োরোপীয়ের পক্ষে সংগ্রহ করার আশা করাও সম্ভব নয়। তিনি আরো সুযোগ পেয়েছেন, তাঁর এই গবেষণাকর্মে ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের কোনো কোনো সর্বশ্রেষ্ঠ (ইয়োরোপীয়) জ্ঞানীদের উপদেশ ও নির্দেশ। এই গবেষণাকর্ম তাই হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রমাণ ও পরিচয়ের দক্ষতা ও ঘনিষ্ঠতার সঙ্গে তত্ত্ববিদ্যার এক সুখসম্মিলন, আর সে-কারণেই ভাষার বিশদ বিস্তারকে নিয়ন্ত্রণ করা গিয়েছে প্রকৃত গবেষণার বিনয় দিয়ে।'

এই শুভেচ্ছার মধ্যেও এমন বাধ্যতার স্বীকৃতি আছে যে ইয়োরোপীয় তত্ত্বের প্রয়োগেই ভারতীয় ভাষাগুলির ইতিহাসের ও ভবিষ্যতের বিকাশের বৈচিত্র্য ও নিজস্বতাকে বুঝতে ও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কারণ, গ্রিয়ারসনের জ্ঞানতত্ত্বে ভাষাতত্ত্ব তো একটাই— পাশ্চাত্য ভাষাতত্ত্ব বা ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব। গ্রিয়ারসন এই মুখবন্ধে স্পষ্ট করে বলেছেন, 'অনেকগুলি কারণে, বাংলা, তার নিজের জোরেই, সযত্ন ও বিশেষ গবেষণার বিষয় হওয়ার যোগ্য। বহু শতক জোড়া রচিত সাহিত্য ও সেই সাহিত্য বেশ যত্নের সঙ্গে সংরক্ষিত থাকায় বাংলা (ভাষার) ইতিহাস অনুসন্ধানের সেই সুযোগ আছে যা অন্যান্য কিছু ভারতীয় মৌখিক কথায় ('স্পিচ') নেই। গ্রিয়ারসন সচেতন বাংলার ক্ষেত্রে 'সাহিত্য' ও অন্যান্য কোনো-কোনো ভারতীয় ভাষার বেলায় মৌখিক ভাষা ('স্পিচ') শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এই মুখবন্ধ লেখার (১৯২৫) বার বছর আগেই রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়ে গেছেন। এমন তো হতেই পারে রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়তে-পড়তেই তিনি বাংলা সাহিত্যের পুরনো ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন হন।

সুনীতিকুমারের মহাগবেষণা প্রসূত এই বিস্ময়কর গ্রন্থের ভিতরে কিন্তু ইয়োরোপীয় ও পাশ্চাত্য ভাষাতত্ত্ব আর তাঁর সংগৃহীত বাংলার বিপুল নিদর্শন ও শব্দসংগ্রহের ব্যাখ্যার ভিতরে একটা স্ববিরোধিতা আছে। তাঁর বিশদ সূচিপত্রের মোটামুটি ৪৫ সংখ্যক অধ্যায়কে এই স্ববিরোধিতার সীমান্ত বলে চিহ্নিত করা যায়। সুনীতিকুমার নিজে তো শিক্ষার দিক থেকে পাশ্চাত্যের ভাষাতত্ত্বেই শিক্ষিত। সেই তত্ত্বের খাঁচার মধ্যেই তিনি তাঁর সাক্ষ্য-প্রমাণ-নিদর্শন-উদাহরণকে ঠাঁই ('স্পেস') দিতে চেয়েছেন। কিন্তু বাংলাভাষার বৈচিত্র্য সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা এতই বিস্তৃত, ব্যাপক, গভীর, অন্তরঙ্গ ও সাহসী যে তাঁর তত্ত্ব সেই সংগ্রহকে ব্যাখ্যা করতে পারছে না ও সেই দ্বান্দ্বিকতা এমন সক্রিয় বেগবান ও জীবন্ত হয়ে উঠছে যে— ইয়োরোপীয় সাম্রাজ্যবিস্তারী দেশগুলি থেকে তৈরি হওয়া তথাকথিত সর্বজনীন ভাষাতত্ত্বের সমান্তরাল ও স্বনির্ভর এক ভাষাতত্ত্ব তৈরি হয়ে উঠছে। যদি কেউ সেই দ্বান্দ্বিকতা বুঝে উঠতে পারেন তাহলে সেই দ্বান্দ্বিকতার ভিতর উপ্ত উপনিবেশের নিজস্ব ভাষাতত্ত্ব গড়ে তুলতে পারেন। আবার, এর বিপরীতে, বিশেষত বাংলা অসামাপিকা ক্রিয়ার প্রয়োগ বৈচিত্র্য দেখাতে তিনি তাঁর তত্ত্বের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়েছেন। সেখানেও কিন্তু নতুন সন্ধানের সুযোগ আছে। এই দ্বান্দ্বিকতা আবিষ্কার করে বাংলা ভাষার নতুন নিজস্ব ভাষাতত্ত্ব তৈরি করে তুলতে পারতেন নতুন বাংলা ভাষাতাত্ত্বিকরা। দুই-একটি অভিধানে, বানান সম্পর্কিত একটি বিকল্পপ্রধান অভিধানে, ও বাংলা শব্দের সংস্কৃত ও তদ্ভব ও একেবারে মুখের ভাষার সমার্থকতা-সন্ধানী অভিধানে বাংলার এই নিজস্বতা, স্বকীয়তা ও স্বাবলম্বনের প্রমাণ সংগৃহীত বলে মনে হয়েছে। বাংলাদেশের বাংলা একাডেমির আঞ্চলিক ভাষার অভিধানে, বাংলা-উর্দু অভিধানেও সেই স্বাতন্ত্র্যের নিদর্শন আছে যা পাশ্চাত্য ভাষাতত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না।

বাংলার এই নিজস্ব ভাষাতত্ত্বের পক্ষে তিনটি প্রমাণ আছে। প্রথম প্রমাণ গ্রিয়ারসন।

দ্বিতীয় প্রমাণ বাংলা ভাষার সর্বাধিকতম, সর্বোত্তম ও বিচিত্রতম ব্যবহারকারী রবীন্দ্রনাথ।

তিনি ১২৯২, যখন তাঁর বয়স ২৪, থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত অসংখ্য চিঠিপত্রে, ছোট নিবন্ধে, বড় নিবন্ধে বাংলা শব্দের ব্যবহার-সমস্যা ও সমাধান নিয়ে কথা বলে গেছেন ব্যবহারকারী হিশেবে, কোনো রকম ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের বিধান অনুযায়ী নয় ও ব্যবহারকারী হিশেবে তাঁর একমাত্র উৎস ব্যবহারই। ব্যবহার বলতে সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যের কথা যেমন এসেছে, তেমনি, আরো বেশি এসেছে মুখের কথার ব্যবহার। এই লেখাগুলির ভিতর আছে বাংলা ধ্বন্যাত্মক শব্দ নিয়ে তাঁর নিবন্ধ— সে-নিবন্ধও ব্যাখ্যাভিত্তিক নয়, সংগ্রহভিত্তিক। সেই সংগ্রহে তিনিই প্রথম ধ্বন্যাত্মক শব্দের ক্রিয়ারূপের সংকেত দিলেন। এর আগে কখনো ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়াপদের ব্যবহারিক যোগ্যতা স্বীকৃত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। কেউ করে থাকতে পারেন। এগুলোর তো কোনো ধাতুরূপ নেই, এগুলো স্বাধীন ক্রিয়া, স্বাধীন বাংলা ক্রিয়া। ক্রিয়ার প্রধান একটি লক্ষণ 'কাল' জানানোর শক্তি। শুধু অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নয়। এই তিনটি প্রধান কালের মধ্যে অনেক রকম উপকাল বা এক কালের রূপকে অন্য কালে ব্যবহার।

এই লেখাগুলির মধ্যে আছে বাংলা ক্রিয়াপদের রবীন্দ্রনাথ সংগৃহীত এক দীর্ঘ তালিকা, দীর্ঘ 'শব্দচয়ন' ও দীর্ঘ 'পরিভাষা সংগ্রহ'।

বাংলা ক্রিয়াপদের তালিকা যখন তিনি করেছেন তখন তাঁর ঝোঁক যেন মনে হয় সংস্কৃত-থেকে তৈরি নয় এমন ক্রিয়াপদের দিকে। আর, 'পরিভাষা সংগ্রহ'-এ তাঁর ঝোঁক যেন মনে হয় সংস্কৃত নির্ভরতার দিকে। সেখানে ইংরেজি পরিভাষার সমার্থকতাই প্রধান।

স্বতন্ত্র, স্বাধীন ও নিজস্ব বাংলা ভাষাতত্ত্বের পক্ষে আমার তৃতীয় প্রমাণ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। তিনিও ব্যবহারকারী হিশেবে স্বতন্ত্র বাংলা ব্যাকরণের সূত্র নির্ধারণ করেছিলেন, বাংলায় শব্দ গঠনের নিজস্ব উপায় আবিষ্কার করেছিলেন, ও বাংলা ক্রিয়াপদের ব্যবহারকে ব্যাকরণ মুক্ত করেছিলেন। তাঁর এই সৃষ্টিশীল সক্রিয়তায় তিনি পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব ও সংস্কৃত ব্যাকরণের অনড় অনুশাসনের বা ভাষাতত্ত্বের নিষেধের ঢেউ তোলা এক অনড়তার মধ্যে ওস্তাদোত্তম মাঝির মত হাল ধরেছিলেন। এমন কোনো একটি কাজেও তাঁর যোগ্যতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন ওঠার ফাঁক ছিল না। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার যে-যে বৈশিষ্ট্য নিয়ে কথা তুলেছিলেন, তাতে বিতর্ক উঠেছে, বিরুদ্ধতা হয়েছে, এমন কি তাঁর অনুরাগীরাও অনেকে এ-বিষয়ে তাঁর যোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ গোপন করেছেন।

শাস্ত্রী মহাশয়ের ক্ষেত্রে তেমন গোপনতার কোনো সুযোগ ছিল না। পণ্ডিত বংশ, সংস্কৃতে এম-এ ও শাস্ত্রী।

রবীন্দ্রনাথের বেলায় তাঁর কবিত্ব ছিল বড় বাধা। যেন কবির ব্যাকরণ বা প্রয়োগ না জানলেও চলে। শাস্ত্রী মহাশয়ের বেলায় তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল বড় বাধা। যেন অত বড় পণ্ডিত, নিত্যপ্রয়োগের কী জানবেন।

শাস্ত্রী মহাশয় তিনটি উপন্যাস লিখেছিলেন— 'বাল্মীকির জয়' (১৮৮০), 'কাঞ্চনমালা' (১৮৮৮), ও 'বেনের মেয়ে' (১৯১৮)। এই তিনটি উপন্যাসেই পৌরাণিক কল্পনাকে বাস্তব করে তুলতে, অপ্রমাণিত ঐতিহাসিকতাকে প্রামাণিক করে তুলতে ও সামাজিক এক বাস্তবতাকে ঐতিহাসিক করে তুলতে তিনি উপন্যাস-রচনার এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আবিষ্কারের প্রমাণ রেখেছেন যা বঙ্কিমচন্দ্রের আধিপত্যকালে বিরল বললেও কম বলা হয়। তাঁর সমস্ত নির্ভর ছিল ভাষার ওপর। সে-ভাষার গড়ন বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসারী হয়েও বাংলা ভাষার নিজস্বতায় একটু বেশি রকম স্বতন্ত্র সচেতন। পরোক্ষ সাক্ষ্যে মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র সেটা পছন্দ করেন নি।

এমন রচনার তত্ত্বভিত্তি খোঁজা উচিত শাস্ত্রী মহাশয়ের বিদ্যাচর্চার দর্শনে বা আত্মসচেতনতায়।

১৩০৮ বঙ্গাব্দে শাস্ত্রী মহাশয় 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ'-এ একটি অত্যন্ত ছোট লেখা পাঠ করেন। 'বাংলা ব্যাকরণ'। লেখাটিতে তিনি সংস্কৃত-ভাষাতত্ত্ব ও ইয়োরোপীয় ভাষাতত্ত্ব দিয়ে বাংলা ব্যাকরণ তৈরির সমস্ত চেষ্টাকে অতুলনীয় শ্লেষে ও ব্যঙ্গে উপহাস করে বলেন— 'বাংলাটা যে একটা স্বতন্ত্র ভাষা, উহা যে... নানা ভাষার সংমিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে, গ্রন্থকারগণ এ কথা একবারও ভাবেন না।'

'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ' দ্বিতীয় খণ্ডে (১৯৮১, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ), এই লেখাটির 'প্রাসঙ্গিক তথ্য' অংশে অধ্যাপক সুকুমার সেন জানিয়েছেন, শ্রোতাদের মধ্যে অনেক বিশিষ্ট জন ছিলেন। 'এঁদের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ...শাস্ত্রী মহাশয় প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণের যে দোষ দেখিয়েছিলেন, তা আজ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কোনো বিদ্বান্ মনীষী সংশোধনের ও প্রতিকারের জন্য কলম ধরেন নি। এমন কি সুনীতিবাবুও তা এড়িয়ে গেছেন তাঁর বিরাট 'ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ'-এ। রবীন্দ্রনাথকে ব্যতিক্রম নির্দেশ করলুম বটে, কিন্তু তিনি কোনো ব্যাকরণ রচনা করেন নি, তিনি করে গেছেন বাংলা ভাষার শব্দ ও গঠন বিষয়ে কয়েকটি সমস্যার বিশদ আলোচনা। এ আলোচনায় তিনি প্রবৃত্ত হয়েছিলেন শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধ পাঠ শুনে তার পরেই। তাই মনে করি রবীন্দ্রনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের নির্দেশ অনুধাবন করে বিচারের পথে পা বাড়িয়েছিলেন।'

অধ্যাপক সেন-এর এই ঐতিহাসিক সাক্ষ্যে সামান্য তথ্যভ্রান্তি ঘটেছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের বক্তৃতা তো ১৩০৮ বঙ্গাব্দে। রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত সেই প্রথম তাঁর অভিজ্ঞতা ও ব্যবহারিকতায়

একটা মতৈক্যের আভাস পেলেন। রবীন্দ্রনাথ তো ১২৯২ বঙ্গাব্দ থেকেই বাংলা ভাষার গঠন ও ব্যবহার সম্পর্কে তাঁর মত লিখে চলেছেন ও 'রবীন্দ্ররচনাবলী'র হিশেব অনুযায়ী ১৩০৮-এর মধ্যে তাঁর অন্তত সাতটি বাংলা ভাষা বিষয়ক প্রবন্ধ বেরিয়ে গেছে।

কিন্তু অধ্যাপক সুকুমার সেন-এর এই সাক্ষ্যে আমার খুঁটির জোর বেড়ে গেল যে নিজস্ব বাংলা ভাষাতত্ত্ব'র তিন উপাদান: গ্রিয়ারসনের স্বীকৃতি, রবীন্দ্রনাথের বাংলা ভাষা সন্ধান ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বাংলা ব্যাকরণ' সহ আরো কয়েকটি রচনা।

বাংলার নিজস্ব ভাষাতত্ত্বের আরো দুটি প্রমাণ আমার আছে কিন্তু সেগুলি এই আলোচনার অব্যবহিত নয়। কিন্তু দুটি প্রমাণই খুব লাগসই। একটি অধ্যাপক সুকুমার সেন-এর ছোট্ট একটি প্রবন্ধ, 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ কেমনটি হওয়া উচিত।' আর-একটি তাঁরই রচিত ও সংকলিত এক দুর্লভ অভিধান— 'ব্যুৎপত্তি-সিদ্ধার্থ বাংলা-কোষ' (পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৩)। ১৯৭১-এ এই অভিধানের ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলা সংস্করণে শব্দসংখ্যা ১০০০০ বেড়ে ২৫০০০ হয়েছে। বাংলা ভাষার প্রাক-ঔপনিবেশিক বিকাশ সম্পর্কে এ এক বিস্ময়কর অনতিক্রম্য দলিল— যেখান থেকে আমরা বাংলা ভাষাতত্ত্বের নিজস্ব শিকড় খুঁজে বের করতে পারি।

আমাদের এই লেখাটির উদ্দেশ্য— রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে, শুধু গানেই, বাংলা ক্রিয়াকে কত বিচিত্র অর্থে ব্যবহার করেছেন তার কিছু উদাহরণ দেখা।

দুই

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্রিয়া-ব্যবহারের বৈচিত্র্য খুঁজতে শুধু গানেরই উদাহরণ কেন? যেহেতু পলাশ বরন পাল তাঁর একটি ছোট নিবন্ধে কৃষ্ণকলি কবিতা/গানটিতে 'মুক্ত বেণী পিঠের ওপর লোটে' এই চরণটিতে 'লোটে' ক্রিয়াপদটির কোনো ধাতু খুঁজে পান নি।

কিন্তু এমন সন্ধানের দায় একা পলাশ বরনের ঘাড়ে ফেলা অনুচিত। পাশ্চাত্য ভাষাতত্ত্বের প্রতি আনুগত্য থেকে বাংলার বিচার, এক মান্য বা প্রমিত রূপতত্ত্ব দিয়ে বিচার করা ভুল। সেই কারণেই তার সমান্তরাল বাংলার নিজস্ব ভাষাতত্ত্বের কথা তুলতে হল।

শুধু গানের উদাহরণই-বা কেন? কারণ, গানেই ছোট আয়তনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ক্রিয়ার নানা রকম ব্যবহার করেছেন।

আরো অতিরিক্ত কারণ: ভাষার রূপ আলোচনার সময় মান্যভাষার তাত্ত্বিকরা গানকে নিদর্শন হিসেবে ধরেন না, যদিও, ইংরেজরা আসার আগে পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য বলতে যা বোঝায়, তা প্রধানত গান। প্রধানত কেন, একমাত্রই বলা যায়। যা 'গাওয়া' যায় না, তা কী করে 'বলা' যায়?

এই লেখাটি লিখতে লিখতে আমার মনে এল— রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলিতে ক্রিয়াপদের এমন ব্যবহার আছে। কিন্তু সে-নিদর্শন আর এ লেখায় সংগ্রহ করিনি।

আমার এই সন্ধান কোনো প্যাটার্ন বা পরিপাটি খোঁজা নয়। কালানুক্রমিকও নয়। শুধুই কিছু এমন উদাহরণ দেয়া যেখানে ক্রিয়ার বহু রকমের ব্যবহার ঘটছে। আর সেই সব রকমের ব্যবহারকেই আমরা বাংলা বলেই তো শুনে আসছি, বুঝে আসছি, কোনো অসুবিধে তো কখনো বোধ করিই না, বরং গানগুলি আমাদের এত চেনা ও জানা যে গায়ক গানের চরণ গাইবার আগেই শ্রোতারা মনে-মনে আবৃত্তি করে।

তাঁর জীবনের প্রথম গান লেখার ঘটনা তো সকলেরই জানা, 'জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ'। দ্বিতীয় চরণেই ভবিষ্যৎ কাল এসে গেল, 'পরান সঁপিবে বিধবা বালা'। পাশ্চাত্য ভাষাতে ক্রিয়ার 'কাল' (টেন্স) এক অপরিবর্তনীয় সংকেত। সেই অপরিবর্তনীয়তাই বাক্যকে সম্পূর্ণতা দেয়। তাই 'ক্রিয়ার' কালজ্ঞাপক রূপ বদলায় 'গো', 'ওয়েন্ট' 'গন' ইত্যাদি। 'জ্বল্' ক্রিয়ার তুচ্ছার্থে প্রয়োগ কবির পরিকল্পিত। 'জ্বলো' বললে ছন্দের কোনো ক্ষতি হত না। তৃতীয় চরণে এই একই 'জ্বল্' ক্রিয়ার আর-এক রূপান্তর 'জ্বলুক জ্বলুক' ('জ্বল্' ক্রিয়া+সার্থে)। আবার চতুর্থ চরণের শেষে ক্রিয়াটা বিশেষ্য হয়ে গেল, 'জ্বালা'। সেই বিশেষ্য ফিরে আসে পরের চরণেই— এক অর্থে ক্রিয়া-বিশেষ্য, এই পরিভাষা রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন। 'জ্বল্' ক্রিয়ার এই নানা ব্যবহারে একটা বাস্তব তৈরি হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় স্তবকে 'দেখ্' ক্রিয়া একই রকমে পুনরাবৃত্ত হতে থাকে। সংগীতের সুরের সংগতে 'জ্বল্' ক্রিয়া 'দেখ্' ক্রিয়ার কর্মকারকও হয়ে যায়। চৌদ্দ বছরের এক বালক শুধু ক্রিয়ার রূপান্তর ঘটিয়ে, স্তবকবিন্যাসে, এক ক্রিয়াকে অন্য ক্রিয়ার কর্মকারক করে তুলছেন— ভেবে তো দিশা মেলে না এই বালক বাংলার এমন প্রয়োগ শুনলেন কোত্থেকে। ভাষা তো শ্রুতির স্মৃতি থেকেই উদ্‌গত হয়। আমাদের তো একটু খেয়াল রাখা নিরাপদ— এ বালক তো বাংলা ভাষার শ্রুতি নিয়েই জন্মেছেন। তাঁর ক্রিয়া-ব্যবহার বিচার করা সম্ভব পাশ্চাত্য ভাষাতত্ত্বের ক্রিয়ার ব্যবহারবিধি বা সংস্কৃত ধাতুরূপের তালিকা থেকে? কারো মনে হতে পারে, আমি রবীন্দ্রনাথে অন্ধ। তেমন যে নই, তা অস্বীকার করার জোরও আমার নেই। আমি তো প্রতিভার এত নৈকট্য দ্বিতীয়বার পাই নি। বাকি তো সব পরোক্ষ জ্ঞান। সাবধান হব কী করে এই সূর্যাবর্তের অগ্নিবলয় থেকে?

এই ১৪ বছরের বালকটি যখন তাঁর শরীরাবসান থেকে মাত্রই দু-বছরেরও কম দূরে (১৯৩৯) তখন আবার এক

নৃত্যনাট্য রচনা করেছিলেন, 'শ্যামা'; যার কাহিনী তাঁর এই প্রথম গানটির বিষয়ের মতই হনন ও আত্মহননের এক যৌগপত্য। সেই নৃত্যনাট্যেও এক নারী তার প্রেমের চরিতার্থতার একমাত্র সম্ভাব্য মূল্য হিশেবে তারই এক কিশোর প্রেমিককে অনিবার্য আত্মহননে পাঠায়। কী ভয়ঙ্কর বিষয়!

সেই নৃত্যনাট্য একেবারে শুরু থেকে ক্রিয়া পদের মৌখিক প্রয়োগে প্রাকৃতিক হয়ে উঠেছে, যেমন ফরেস্টে পত্রমর্মরের সিম্ফনি তৈরি হয় ঝড়ের সূচনায়। 'এনেছ... থেকে', 'কানে দিয়েছে', 'দাও', 'দেব বেচে', 'যাবে বেঁচে', 'করেছি বেচাকেনা', 'হয়েছে লেনাদেনা', 'কণ্ঠে দিব', 'বিকোবার (নয়)', 'জানো নাকি', '(পিছনে) রয়েছে', 'চলেছি দেশান্তর', 'পেলেম', 'পূজে', 'যুঝে', 'দেব যারে', 'পাব খুঁজে'। 'থামো, থামো', 'চলেছ পালায়ে', 'চলেছি (আপন ব্যবসায়ে), 'চলেছি (দেশান্তর), 'আছে পেটিকায়', 'আছে (মোর প্রাণ)', 'আছে (মোর শ্বাস)', 'খোলো, খোলো', 'ছুয়ো না, ছুঁয়ো না', 'করো যদি', 'দেখব (পালাও কোথা)', 'হয়েছে পোঁতা', 'মনে রেখে', 'স্মরিয়ো'।

দ্বিতীয় দৃশ্যেই ক্রিয়ার তিন ধরনের ব্যবহার নৃত্যনাট্যটির তিনটি সন্ধানকে স্পষ্ট করে দিচ্ছে। ১. শ্যামা খুঁজছে তার পুরুষকে; ২. উত্তীয় খুঁজে 'পেয়েছে' তার নারীকে; ৩. বজ্রসেন খুঁজছে তাঁর নারীকে। তিনজনের খোঁজাই শেষ হয় নিরর্থ এক রক্তভেজা প্রান্তরে।

দ্বিতীয় দৃশ্যের প্রথম গানটিতে ক্রিয়ার ব্যবহার কমে এল। মৌখিক ক্রিয়ার চলৎশক্তি একটু সংস্কৃত-ঘেঁষা সংগঠনের দিকে গেল যেন অলঙ্কার-ঘেঁষা বাচ্যে। পরিবেশ তো 'শ্যামার সভাগৃহ'। 'জাগ', 'রচিলে' এমন মাত্র দুটি ক্রিয়াপদ প্রথম গানটিতে। ক্রিয়াপদগুলি সক্রিয় হওয়াই ছিল প্রথম দৃশ্যের বৈশিষ্ট্য। এখন সেগুলি সমাসবদ্ধ হয়ে বিশেষণ হয়ে যাচ্ছে, 'স্বপনরূপিণী', 'অলোকসুন্দরী'। 'মান্য' বাংলায় এই রীতি তৈরি হয়েছিল উনিশ শতক জুড়ে।

দীর্ঘ দ্বিতীয় দৃশ্যে ঘটনা বদলে-বদলে যাচ্ছে, কথাবার্তার লোকজনও, কথার বিষয়ও। শুধু এই দৃশ্যের ক্রিয়াপদ ব্যবহারের একটা তালিকা যদি করা যায় তা হলেই আমার বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে। একেবারে খশড়ার মত করে তেমন একটা তালিকা তৈরির চেষ্টা করছি, শুধু এইটুকু বুঝতে যে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ক্রিয়ার ব্যবহারে কী বৈচিত্র্যের শক্তি এনেছিলেন, যে, বাংলা ক্রিয়াপদের দুর্বলতা সংক্রান্ত রটনা ভুল প্রমাণিত হয়।

উত্তীয়ের প্রবেশের পর সখীদের গানটিতে— 'ফিরে যাও', 'ফিরে ফিরে যাও', 'বহিয়া', 'আছ' 'আস', 'আস না', 'পারি না', 'বুঝিতে', 'পেয়েছ', 'খুঁজিতে', 'উঠেছে জ্বলিয়া'।

উত্তীয়ের প্রথম গানে— 'ধরিবারে', 'করি পণ' 'থাক, থাক', '(পরশ) করিব', 'চমকিবে', 'পশিবে', '(আকুল) হবে', 'সাধিব', 'বাঁধিব'।

এই গানের মধ্যে সখীদের সংলাপী গানে— '(হতাশ) হয়ো না, হয়ো না, হয়ো না', 'ভুলায়ে লোয়ো না, লোয়ো না', 'হবে (জয়)', 'হবে (তব)', 'হবে (জয়)'

রবীন্দ্রনাথ বাংলা ক্রিয়াপদের ব্যবহার বদলে দিয়েছেন নানা কুশলতায়— কখনো পৌনঃপুনিকতায়, প্রায়ই ক্রিয়ালগ্ন অব্যবহিত শব্দ প্রয়োগে, তখন ক্রিয়ার অর্থে এসে লাগে সেই অব্যবহিত শব্দের অর্থ, কোথাও যে-পরিস্থিতিতে ক্রিয়াপদটি ব্যবহৃত হচ্ছে সেই পরিস্থিতি।

বাংলা ভাষার মান্যতার কৃত্রিম বিধি দিয়ে রবীন্দ্রনাথের গানের ক্রিয়াপদ ব্যবহার বোঝা যায় না। আমি কালজ্ঞাপক ক্রিয়ার প্রয়োগের বৈচিত্র্যের প্রসঙ্গে আসিই নি।

আত্মপরিচয়: সংঘাত, সন্ত্রাস, উত্তরণ

পবিত্র সরকার

১. বিধিসম্মত সতর্কীকরণ

আজকাল ইংরেজি identity কথাটির সঙ্গে জুড়ে politics ইত্যাদি নানা শব্দসমাস তৈরি হচ্ছে। Identity-র বাংলা 'আত্মপরিচয়' ধরে নিয়ে এই শব্দটিকে নিয়ে একটু নাড়াঘাঁটা করতে চাই। অন্যত্র 'পরিচিতি' বা 'পরিচিতি-সত্তা' ও দেখছি। এ নিয়ে নাড়াঘাঁটার কাজটি মূলত সমাজবিজ্ঞানীর আমি জানি, আর তার চেয়ে বেশি করে জানি যে, আমি সমাজবিজ্ঞানী নই। এমনকি আমি এমনই অশিক্ষিত যে, এ বিষয়ে জরুরি বই অর্মত্য সেনের *Identity and Violence* পড়িনি, যদিও এ লেখা লেখার আগে তা পড়ে নেওয়া আমার উচিত ছিল। আজকাল বিদ্যার বিশেষায়ণের যুগে একের এলাকার দরজা ভেঙে অন্যের ঢুকে পড়া এক অবৈধ ব্যাপার, সকলেই আড়চোখে তাকায়। এই আড়চোখে তাকানোকে আমি সমীহ করি। কিন্তু আমি কিছুটা গ্রাম্য গোঁ নিজের মতো করে কিছু কথা ভাবি— বৃদ্ধ বয়সে যেহেতু ভাবনাই এক ধরনের সম্বল। না, পোস্টমডার্নিজম নামে এক বহুদা দর্শনের আশ্রয়ও নিতে চাই না, তা বুঝি আর না বুঝি। নিজের সেই ভাবনাটুকু *আরেক রকম*-এর আমন্ত্রণ পেয়ে লিখে ফেলার ইচ্ছে হল। এ ভাবনা হয়তো বিশেষজ্ঞরা আগেই ভেবে গেছেন, আমি সমাজবিজ্ঞানীদের সমস্ত লেখার খবর রাখি না, কাজেই মৌলিকত্বের দাবি করা স্পর্ধা হবে। ব্যক্তিহিসেবে আমার জিন-সংগঠনে কোনও মৌলিকত্বর উপাদান আছে বলেও আমি মনে করি না। আধাখ্যাঁচড়া নানা পড়াশোনা থেকে এলোমেলো যে সব কথা মনে এসেছে তাই এ লেখায় গুছিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি। এই বিধিসম্মত সতর্কীকরণের পর কথাগুলি পাড়ছি। এ লেখায় অনেক ফাঁকফোকর থাকবে, সেগুলিকে নিষ্ঠুরভাবে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য পাঠকদের কাছে সাদর আমন্ত্রণ রইল। প্রজ্ঞালেখের মতো এতে কোনও টীকা-টীপ্পনি উল্লেখপঞ্জিও থাকবে না; তাতে যদি এ লেখাকে কেউ দূর থেকে চিমটে দিয়ে না ছোঁন, মন খারাপ করব না।

২. আত্মপরিচয়— কোথায় শুরু, কোথায় শেষ

'আত্ম' কথাটার একটা প্রান্তে 'আমি' বা ব্যক্তি। আমাদের প্রতিবেশে 'ব্যক্তি' বলতে মানবব্যক্তিকেই বোঝায়। পশুদের মধ্যে ব্যক্তির বোধ নিশ্চয়ই আছে, সঙ্গিনী, সন্তান— এইসব নিয়ে একটা পারিবারিক বোধ, নিজেদের দলের সঙ্গে মিলে গোষ্ঠীর বোধও আছে, কিন্তু আমি যেহেতু পশুসমাজতত্ত্বের কিছুই জানি না, তার এলাকায় পা রাখার প্রশ্নই নেই।

মানুষের মধ্যে এই প্রথম আত্মপরিচয়ের একটা উন্মেষ ও বিকাশের ইতিহাস, যাকে ইংরেজিতে বলে developmental history, তাই আছে। শিশু কখন থেকে নিজেকে 'আমি' বলে ভাবতে শুরু করে তা নিয়ে নানা মুনির নানা মত। 'আমি' যে 'আমি' সেটা শিশু কখন থেকে টের পায় আমি জানি না। 'আমি' তো একটা বহুজটিল সত্তা। 'আমি'-র যে শুধু খিদে পায়, 'আমি' যে শুধু তরল ও আধাকঠিন বর্জ্য ত্যাগ করে, শারীরিক ব্যথাবেদনা অনুভব করে, যন্ত্রণায় কেঁদে ওঠে তাই নয়। এই আমি চারপাশের লোকজন, জানলা-দরজা-খাট-মেঝে-সিলিং-এ ঘুরতে থাকা ফ্যান (নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরে— আরও সচ্ছল ঘরে আরও অনেক কিছুর) মধ্যে নিজেকে দেখে। চারপাশের লোকেরা তাকে একাধিক নাম দেয়, সেই নামে নানা জনে তাকে ডাকে, সে মুখচোখমাথা ঘুরিয়ে সাড়া দেয়, এতেও সে নিজেকে অনুভব করে না তা নয়। একটু বড়ো হলে হাঁটতে হাঁটতে সে আয়নার সামনে আসে, হয়তো তখন নিজের বাইরেটাকে সে অনেকটা দেখতে পায়। ভাষাবিজ্ঞানীরা লক্ষ করেছেন, অনেক সময় শিশু 'আমি' কথাটা আগে বলতে শেখে না। অন্যদের কাছে নিজের শোনা নাম আউড়ে বলে, 'তিন্নি খানি', 'তিন্নি বেউ বেউ যাবে'। 'আমি' সর্বনামের ব্যবহার সে শেখেনি মানে 'আমি'-র বোধ তার জন্মায়নি তা নয়।

বলা বাহুল্য, আজকাল এডোয়ার্ড সৈয়দ বা আরও নানা জনের মুখে যে 'অপর' কথাটা নিক্ষিপ্ত হয়েছে, তারও জন্ম 'আমি'-র সঙ্গে সঙ্গেই— এরা যমজ। কারও কারও মতে 'আমি' একটু আদরের, তোল্লাইপুষ্ট বা privileged, কিন্তু এ কথাটা সব 'আমি'-র ক্ষেত্রে যে সত্য নয় তা আপনারা জানেন, আমরা দেখব। ব্যক্তি 'আমি'-র ক্ষেত্রে নয়, অন্যান্য নানা সাইজের 'আমি'-র ক্ষেত্রেও নয়।

এখনই তার 'আমি'-র অনেক চাহিদা, প্রাপ্তি, অপ্রাপ্তি, বাড়ির নানা মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক, বেড়াল, কুকুর ইত্যাদি সজীব না-মানুষ প্রাণীর সঙ্গে সম্পর্ক, এমনকি খেলনা ইত্যাদি অজীব বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক— এই রকম নানা বিচিত্র সম্পর্কের জালের জটিলতার মধ্যে নিজেকে চিনবে, সবটা সে হয়তো স্পষ্টভাবে বুঝতেও পারবে না। কিন্তু এটুকু বুঝতে পারবে যে, সবই তার অনুকূল নাও হতে পারে। তার সব চাহিদা মেটাচ্ছে না তার কাছের মানুষেরা, তার পরিবার (পরিবারের ধারণা তার নেই), তার চাওয়া তাদের বিশেষ পরিবেশে অসংগত বলে বিবেচিত হচ্ছে। তার ফলে সে বকুনি খাচ্ছে, ক্ষেত্রবিশেষে বায়নার জন্য মায়ের কাছে চড়ও খাচ্ছে। অর্থাৎ 'আমি'-র অধিকারের একটা অনতিস্পষ্ট সীমানা তৈরি করে দিচ্ছে তার পরিবার। কেন? তার কারণ তার পরিবারও আরও একটা বড়ো 'আমি'-র কাছে, তার রাষ্ট্রের কাছে, কী এবং কতটুকু তার অধিকার— তার সীমানা একভাবে বুঝে নিয়েছে।

৩. নানা সাইজের 'আমি'

যে শিশু রুডিয়ার্ড কিপলিং-এর মুগলির মতো বা নানা সময়ে খবর-পাওয়া নেকড়ে মায়ের মানবশিশুর মতো জীবন হল না, —ক্বচিৎ তা হয়— সে শিশুর ব্যক্তি-'আমি'র সঙ্গে আরও নানা রকম আমির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়— এ ঘটনা সে প্রথম দিকে জানতেও পারে না। আস্তে আস্তে সে এই খেলাটার মধ্যে ঢুকে পড়ে, বুঝতে পারে যে, তাকে ঘিরে আরও অনেকগুলো 'আমি'-র বৃত্ত তৈরি আছে, নানা সাইজের বৃত্ত, সে সেই বৃত্তগুলোর কেন্দ্র— বহু বহু নানা সাইজের 'আমি'-র ওই এককেন্দ্রিক সূত্র। প্রত্যেক মানুষই সেই নানা বৃত্তের একমাত্র কেন্দ্র। একটা আমি হল পারিবারিক আমি, বাবা মা, ভাই বোন বা আগেকার একান্নবর্তী পরিবারের বৃহত্তর পরিসরে, সকলের সঙ্গে সম্পর্কে, সকলের গ্রহণে-বর্জনে ব্যক্তি-আমির যেমন একটি ধারণা হয় নিজের সম্বন্ধে, তেমনই একটি পারিবারিক আত্মপরিচয়ও তার তৈরি হয়ে যায়। পরিবারটাই হয়ে ওঠে একটা তুলনায় বড় আমি। তার মধ্যে ছোটখাট 'আমি' আর 'ও'-র জটিলতা যে দেখা দেয় না তা নয়। ভাইয়ে ভাইয়ে বা ভাইয়ে বোনে ঝগড়া, বউয়ে বউয়ে বিদ্বেষ তৈরি হতেই পারে, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় থেকে গিরিশচন্দ্র ঘোষ, শরৎচন্দ্র পর্যন্ত তার প্রচুর আখ্যান আছে। কিন্তু তবু দেখা গেছে, পরিবারের মধ্যে ব্যক্তি-আমি আর অপরের দ্বন্দ্বে কখনও পারিবারিক আমি নিজেকে আরোপ করতে পারে। এবং পাড়ার ছেলে আমার ভাইকে মেরেছে জেনে, যে ভাইয়ের সঙ্গে আমার সদ্ভাব ততটা না থাকলেও, আমি পাড়ার ছেলেকে পিটিয়ে আসতে এগিয়ে যাই। এটা শুধু আমার মধ্যে জন্মানো এক বোধ নয়, অন্যেদের কাছেও পরিবার একটা সত্তা হয়ে দাঁড়ায়, এবং সদস্যদের ওপর দায়িত্ব এসে পড়ে একই সত্তার চিহ্ন বহন করার— তা গৌরবের হোক, অগৌরবের হোক। অন্যেরাও বলে তুমি অমুক পরিবারের ছেলে না, আর পিতৃতান্ত্রিক প্রাধান্যের সূত্রে, 'তুমি অমুকের ছেলে না? ছিঃ, তোমার এই কাজ! বাপের নাম ডোবালে?' শুধু পার্শ্বিক বিস্তার নয়, সময়ক্রম ধরে পরিবারের বিস্তারকেই বলে বংশ, এবং বংশপরম্পরা— এবং তখন সেই পরম্পরারও একটি 'আমি'-র আমরা অংশীদার হয়ে যাই। তখন 'হবে না কেন, কত বড় বংশের ছেলে বা মেয়ে!' থেকে 'বংশের নাম ডোবালে!' পর্যন্ত নানা পর্যায়ের বাক্যাবলি আমাদের কাছে ধেয়ে আসে। ব্যক্তি-আমির পায়ের নীচে বংশের একটা ইট পাতা হয় তো আমার উচ্চতা বাড়ে। এই রকম ক্রমশ আরও অনেক ইট পাতা হতে থাকবে।

সমাজতত্ত্বের মামুলি জ্ঞানের সূত্র ধরেই আমরা যখন বংশকে পেরিয়ে যাই, তখন আমরা বাস্তব বা কল্পিত রক্তের সম্পর্ককে অতিক্রম করে যাই। কল্পিত রক্তের সম্পর্কও এক সময় প্রচুর তৈরি হত। 'সূর্যবংশ', 'চন্দ্রবংশ', 'কংসরাজের বংশধর' ইত্যাদিতে বংশের গায়ে একটা আলাদা মহিমা লাগত, যা আমাদের আমির বোধে আরও পলেস্তারা লাগাত। 'উচ্চ ঘর' তৈরি হত। এই ভাবে দেখা যেত যে রামায়ণ-মহাভারত বা পুরাণোক্ত রাজারা যদি সূর্যবংশ বা চন্দ্রবংশের হয় তো, অসমে ত্রিপুরায় কোচবিহারে উপজাতি থেকে আসা রাজারাও কোশাম্বির ভাষায় 'সংস্কৃতায়িত' হয়ে সূর্যবংশ বা চন্দ্রবংশের পরম্পরায় ঢুকে পড়ল। এই রকম ছিল পাঁজিতে নিক্ষিপ্ত ইতস্তত শব্দ— 'গোত্র'— তার একটা মানে বোধ হয় করা যায় এক-গোয়ালের গোরু। সেটাও ওই সূর্যবংশ ধরনেরই এক কাল্পনিক জন্মগত পরম্পরা, তবে এখানে গ্রহ-উপগ্রহকে না ধরে এক মুনি বা ঋষিকে ধরা হত বংশের প্রবর্তক হিসেবে— যেমন কশ্যপ বা ভরদ্বাজ বা আলম্বায়ন। এ পর্যন্তও রক্তের সম্পর্কের একটা সূত্র আছে। কিন্তু গ্রামের সূত্রে বামুনদের আত্মপরিচয় ছিল গাঁই, 'মেল'-টা কী বোঝাত তা অস্পষ্ট, অভিধানে বলে বাঙালি কুলীনদের ভাগ, তবে তারও সঙ্গে গ্রামের নামের একটা যোগ থাকত, যেমন ফুলিয়ার বা 'ফুলে'-র মেল।

অবশ্য এই উপমহাদেশে উচ্চ ঘরের আরও নানা রকম শর্ত তৈরি হয়েছিল, শুধু সূর্য চন্দ্রের সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক নয়, শুধু জন্মস্থান বা বাসস্থানের সূত্র নয়। রক্তের সম্পর্কের বাইরে গিয়ে দেখি, বামুন হলাম তো হিন্দুদের মধ্যে আপনা থেকেই উচ্চ ঘর, জমিদারের ছেলে হলেও তাই। অতি শিক্ষিত হলেও একটা সময় ছিল যখন চাষির ছেলের 'চাষা' নাম ঘুচত না, তারাশঙ্করের *সন্দীপন পাঠশালা*-তে তার এক তীব্র স্মৃতি আকীর্ণ আছে। এখন অবস্থাটা বোধহয় সামান্য বদলেছে। কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায় কোনও বৃহৎ 'আমি' তৈরি করতে পারেনি। তারা

যেহেতু বৃহদংশে মধ্যবিত্ত, তারা গাছেরও খায় তলারও কুড়োয়, তাই তাদের মধ্যে হাজার ঝগড়া। শাসকের পক্ষে, সে শাসক যত নষ্ট এবং পচা হোক, তোলাবাজির মনোরম ব্যবসায়ে লিপ্ত হোক, গণতন্ত্রকে যত ছিন্নভিন্ন করুক, তাদের পক্ষে একদল 'শিক্ষিত' মহাসুখে যোগদান করে কলাটা-মুলোটা আহরণ ও গ্রহণ করে; আবার অন্য এক দল শাসকের বিরোধিতা করে। এদের দু দলের মধ্যেও আবার প্রচুর ঝগড়াঝাঁটি থাকে, কাজেই শিক্ষিতদের মধ্যে থেকে কোনও ব্যাপ্ত আমি তৈরি হতে পারে কি না সন্দেহ। আমি এই বিতর্কের জায়গাতেই প্রশ্নটিকে ছেড়ে রাখছি, সমাজবিজ্ঞানীরা আমাকে উড়িয়ে দিলেও দিতে পারেন।

অবশ্যই 'শিক্ষিত' মানে ডিগ্রিধারীদের মধ্যেও বহুবিধ 'আমি' খাড়া হওয়ার সুযোগ আছে। যে প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা নিয়েছি তার ছাপ আছে— প্রেসিডেন্সি, যাদবপুর, জাভেরিয়ান, স্টিফেনিয়ান, বি ই কলেজ ইত্যাদি যেমন আছে, তেমনই আছে তার নানা খণ্ড, ১৯৮৫-র আই এ এস ব্যাচ, বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে, হয়তো এখানেও Class of 82 বা 96, প্রাক্তন ইংরেজি বিভাগ, যাদবপুর— এমন কত আত্মপরিচয় তৈরি হয়ে যায়। একটাই সান্ত্বনার কথা যে, সবগুলি আত্মপরিচয় প্রতিযোগিতা বা শত্রুতার চরিত্র বহন করে না। পরে আমাদের এ লেখা ওই দুটি চরিত্রের সঙ্গে আত্মপরিচয়ের সম্পর্ক নিয়ে একটু বেশি বিব্রত থাকবে। আছে ফুটবল টিম, হকি টিম, ক্রিকেট টিমের সদস্য 'আমি', আছে টিমের সমর্থক 'আমি', পাড়ার ক্লাবের 'আমি', আছে রাজনৈতিক দলের নেতা বা অনুগামী বা সদস্য 'আমি', আছে বিজ্ঞানী সম্প্রদায়ের আমি, আছে ব্যবসায়ী সংগঠনের 'আমি', আছে মজদুর ইউনিয়নের 'আমি'। গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে পাশাখেলার দলের আমি (যদি এখনও থেকে থাকে), ফেসবুকের বন্ধু বা অন্যান্য গোষ্ঠীর আমি, ওয়াটস্যাপের গোষ্ঠীর আমি। অজস্র 'আমি'। আছে নানা কমিটি, কাউন্সিল, কংগ্রেসের অন্তর্গত 'আমি'। খুচরা ব্যবসায়ী সমিতির আমি। এমনি বহু বহু আমি। এক 'আমি'-র মধ্যে হাজার আমি ঢুকে পড়ে। তাই তো হওয়ার কথা। পরিবারেও তো ছেলে 'আমি', বাবা 'আমি', কাজের লোকের দাদাবাবু 'আমি', স্বামী 'আমি' ইত্যাদি কত পরিচয় তৈরি হয় পুরুষের; মেয়েদেরও তৈরি হয় নানা আত্মপরিচয়। প্রত্যেকে হয়ে উঠি নানা 'আমি'র গুচ্ছ বা বান্ডিল। দেখা যায় যে 'আমি'র পরিচয়ের জন্য শুধু ব্যক্তিই যথেষ্ট নয়, 'অপর'-কেও চাই। তার গোষ্ঠী, যে কোনও গোষ্ঠী এক দিকে নানা অপরের সঙ্গে তার বন্ধন, অন্যদিকে তার আমিত্বর একটা সম্প্রসারণও বটে। এ এক মজাদার বিপ্রতীপতা, অপর নইলে আমির পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না। গ্রন্থনবাদীরা (স্ট্রাকচারালিস্ট) এই জন্যেই বলেছেন, আমি কি নই সেইটাই আমার আসল পরিচয়, আমি কী সেটার আগে।

কিছু 'আমি' আমার পায়ের তলায় একটা করে ইট বসিয়ে দেয়, আমার সাহস বা আত্মবিশ্বাস বাড়ায়। সব 'আমি' তা পারে না। অবশ্যই শিক্ষা বা 'উচ্চশিক্ষা' 'আমি' লোকটার পায়ের তলায় এরকম কয়েকটা ইট লাগিয়ে দেয়, আমার মাথাটা আর-একটু আকাশের দিকে ওঠে। যতক্ষণ পর্যন্ত না বেকারির পাঁচিলে ধাক্কা খেয়ে তা মুখ থুবড়ে পড়ে। তবু শিক্ষা অনেক সময়, অন্যান্য কিছু ব্যাপক আত্মপরিচয়ের মতো আমাদের 'অহং'-কারও দেয়। 'শিক্ষিতে'-র অহংকার ('অশিক্ষিত' দের অনুকম্পা করার), ভদ্রলোকের অহংকার— কারণ ইংরেজি কায়দায় ইস্কুল-কলেজে গেলেই আমরা 'ভদ্রলোক' হয়ে যাই, আর সঙ্গে সঙ্গে দেশের একদল লোক আমাদের কাছে 'ছোটলোক' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যায়। আমরা তাদের শুধু মনে মনে করুণা করবার অধিকার পাই তা নয়, তাদের 'আপনি' সম্ভাষণ করা বিকল্প সম্বন্ধেও উদাসীন থাকি, যদি 'তুই-তোরা' না বলি তো 'তুমি-তোমরা' বলে তাদের চতুর্দশ পুরুষকে উদ্ধার করি। দেশের 'ছোটলোকেরা' যদি মুছে যায়, তবে হায়, দেশের 'ভদ্রলোক' বলেও কিছু থাকবে না। অন্ধকার না থাকলে যেমন আলোর মাহাত্ম্য বোঝা যায় না। বড় বংশে বা সচ্ছল পরিবারে জন্মালাম তো পায়ের তলায় কয়েকটা ইট নিয়েই জন্মালাম, যদিও আমাকে ওই ইটের পাঁজা থেকে ঠেলে ফেলে দিতে পারে। আরও কত আপতিক (না হলেও হতে পারত) আমিত্বের খাঁচা আমাদের তৈরি হয়— পার্লামেন্টের বা বিধানসভার সদস্য, কোম্পানির ডিরেক্টর বা বোর্ডের মেম্বার, নানা জীবিকার আত্মপরিচয় (অফিসার— গেজেটেড, নন-গেজেটেড), আপার ডিভিশন ক্লার্ক, লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক, গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি কর্মচারী— প্রত্যেক গোষ্ঠীর 'আমি'-তে অহংকারের মাত্রা নানাভাবে বণ্টিত হয়, কারও বেশি, কারও কম। তাদের শ্রেণিচিহ্নও থাকে— অফিসারে রিভলভিং চেয়ার, তাতে মোটা তোয়ালে, কেরানি বাবুর ক্ষেত্রে তার ব্যবস্থা নেই, হয়তো 'বড়বাবু'-র বা অফিস সুপারিন্টেনডেন্টের জন্য তা আছে।

অফিসারদের এই আমির জাতিভেদপ্রথার একটি গল্প পাঠকেদের উপহার দিতে ইচ্ছে হচ্ছে, জানি না তা 'আরেক রকম'-এর জন্য একটু বেশি লঘু হয়ে যাবে কি না। এটি গল্প নয়, সত্য ঘটনা, অধুনালুপ্ত রাইটার্স বিল্ডিং-এর করিডর থেকে শোনা। সেখানে সম্ভবত সেক্রেটারি, জয়েন্ট, অ্যাডিশনাল ও ডেপুটি সেক্রেটারিদের জন্য একটি আলাদা মূত্রত্যাগস্থান ছিল, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারিদের জন্য ভিন্ন আর একটি। এক বিকেলে জনৈক সেক্রেটারি তাঁর পাশের খোপে জনৈক স্থিত সেক্রেটারি এক অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারিকে ওই নৈমিত্তিক কাজ করতে দেখে একটু বিস্মিত হলেন, ভ্রূ কুঞ্চিত করে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি এখানে'? সহ-সচিব সবিনয়ে উত্তর দিলেন, 'স্যার

আপনি নিজেই আজ বিকেলে আমার প্রমোশনের ফাইল সই করেছেন, আমি ডেপুটি সেক্রেটারি হয়েছি।' সেক্রেটারিটি বিরক্তি লুকিয়ে ফেললেন, স্মিত মুখে বললেন, 'ওয়েলকাম'। যাকে ইংরেজিতে 'আপওয়ার্ড মোবিলিটি' বলা হয়, তা কখনও কখনও দুর্বল আর পশ্চাৎপদ 'আমি'-কে কিছুটা স্বস্তির পরিসর দিতেই পারে। জীবিকার 'আমি' তো কতদিকেই কতভাবে তৈরি হয়।

আমাদের ভারতীয় হিন্দু সমাজে জাতপাত আর-একটা আত্মপরিচয়ের খাঁচা তৈরি করে। এ এমনই খাঁচা, যার বাইরে কেউ বেরোতে পারে না। এটা কোনও রক্তের পরিচয় নয়, কিন্তু জন্মের সঙ্গে এর যোগ আছে। আমরা জাতে জন্মাই, জাত নিয়ে মরি। তুমি কায়ক্লেশে ধর্ম বদল করতে পার, তাও এখন বিজেপি-হিন্দু পরিষদ খাঁড়া উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, গোরক্ষার মতোই 'ধর্ম' রক্ষাও তাদের একটা কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে— তবু ধর্মের যদি-বা বদল সম্ভব, জাতের বদল আর সম্ভব নয়। পুরাণে সেই বিশ্বামিত্রকে কত না কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল বামুন হওয়ার জন্য, তাও তার আর বেশি সমান্তরাল আখ্যান পাই না। এই যে জাতপাতের 'আমি' তা দুদিকে কাটে। উঁচু জাত হলাম তো আমিটা একটা সুখকর বা স্বস্তিকর অবস্থান দেয়— অবশ্যি সাধারণভাবে। ওই পায়ের তলায় ইট। কিন্তু তথাকথিত নীচু জাত— তারও নানা পরম্পরা আছে— হলাম তো সেই স্বস্তি থেকে আমি জন্ম থেকেই বিনাদোষেই বঞ্চিত হলাম। শিশু নিজের ইচ্ছায় পিতামাতা নির্বাচন করে জন্মায় না। কিন্তু এই উপমহাদেশে বহুলাংশ নিরপরাধ শিশু জন্মেই দেখে সে নানা বঞ্চনার আর অত্যাচারের সম্ভাব্য শিকার।

ধর্মের 'আমি'-র গায়ের জোর বেশ বেশি তা তো আমরা পদে পদে টের পাই। ঊনবিংশ শতাব্দীতে দেশপ্রেমের মধ্যে হিন্দুত্বের আমি এতই প্রকট হয়েছিল যে, হিন্দু রাজা নিজেদের দুর্বলতার জন্য মুসলমান রাজার কাছে হেরে গেল তো ভেতো বাঙালি হিন্দু 'আমি' দুঃখে মর্মবেদনায় মুষড়ে পড়লাম। রাজা হারাল তার নিজের দোষে বা দুর্বলতায়, আর আমি, এক ছাপোষা বাঙালি, সে জিতলে আমার কী ঘেঁচু লাভ হত জানি না, হারলে আমার কী এল-গেল তার হিসেব নেই— কিন্তু আমি কবিতায় গল্পে নাটকে মহা হা-হুতাশ শুরু করে দিলাম। যেন রাজার জিত আমার জিত, রাজার হার আমার হার! এ কি কোথাও কোনও দিন হয়েছে— রাজার স্বার্থ আর প্রজার স্বার্থ পুরোপুরি এক হয়েছে? রাজপুত রাজারা তাদের হিন্দু প্রজাদের কোলে করে রেখেছে, তাদের উপর অত্যাচার করেনি? 'রাজকাহিনী'-তে ভিলদের ওপর অত্যাচার কারা করেছিল? হিন্দু জমিদাররা হিন্দু প্রজাদের খাজনার দায়ে কাছারিতে এনে চাবুক মারেনি? তবু আমরা রাজার দুঃখে নাকের জল চোখের জল এক করে ফেললাম, তখনকার শত্রু যে ইংরেজরা তাদের নিয়ে ট্যাঁ-ফোঁ করলাম না। আর মুসলমান বুদ্ধিজীবীরাও ভাবলেন মুসলমান শাসক যেহেতু তাঁদের ধর্মের লোক, তাই শাসকদের জয় তাঁদের জয়, মুসলমান শাসকদের পরাজয় তাঁদের পরাজয়। যেন তাঁদের শাসনে আপামর মুসলমান প্রজাও খুব সুখে ছিল! মুসলমান জমিদার মুসলমান প্রজাদের উপর খাজনার জন্য অত্যাচার কম করেছে! ধর্মের আমি মাঝে মাঝেই আমাদের এ রকম বিড়ম্বনায় ফেলে।

রাষ্ট্রের আমির আরও নানা চেহারা আছে। ভারতের মতো বহুভাষী দেশে তার সঙ্গে ভাষার 'আমি' এসে জুড়ে যায়। অসমিয়া আমি, বাঙালি আমি-র নিষ্ঠুর সংঘাত যে হঠাৎ সামনে এসে পড়েছে, তার পিছনে যে বাঙালি আমির আধিপত্যের একটা ইতিহাসও আছে, সেকথা এখন তুললে হয়তো বাঙালিরা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠবেন। কিংবা ধরা যাক ভারতীয় হকি দল, ক্রিকেট দল। যেহেতু আমি এই দেশের অধিবাসী, সেহেতু তা 'আমার' দল হতেই হবে। রাষ্ট্র আমাদের বাধ্য করে না এ ব্যাপারে, কিন্তু রাষ্ট্রিক সংস্কৃতি আমাদের মধ্যে এই অভ্যাস ঢুকিয়ে দেয়। জাতীয় পতাকা, তেরঙ্গা নিশান, অশোক চক্রের মতো নানা চিহ্ন, সরকার, মিলিটারি, সীমানা-যুদ্ধ আমাদের সামনে 'জাতীয়' নানা চিহ্ন আর ঘটনা হাজির করে, আমরা সহজেই তার সঙ্গে মিলিত হই। খেলার দলের প্রসঙ্গে বলি, এখানে কে ভালো খেলছে তার প্রশ্ন নেই, আমাদের দল হারলে আমি শয্যা নেব, জিতলে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে গলা ভাঙব। কিন্তু জাতীয় ক্রিকেট দলের সদস্যদের সঙ্গে আমার দৈনন্দিন যাপনের কী সম্পর্ক আছে? শচীন তেন্ডুলকার খুব মহৎ-হৃদয় ব্যক্তি, তাঁর দানধ্যানের জন্য তাঁকে শ্রদ্ধা করতে আমার অসুবিধে নেই। কিন্তু যখন শুনি যে তাঁর ডজনখানেক মোটরগাড়ির মধ্যে একটার দাম ষোল কোটি টাকা, তখন নিজেকে প্রশ্ন করি যে, তাঁর সঙ্গে আমার যাপনের যোগ কোথায়, কোন্ গণিতে আমার আমি তাঁর আমির সঙ্গে মিলতে পারে? তিনি তাঁর মতো করে ভালো থাকুন, আমি আমার মতো করে, কিন্তু তাঁর বা ধোনির বা বিরাট কোহলির আমির সঙ্গে আমার আমির কোনও দূরবর্তী সম্পর্ক স্থাপনের ইচ্ছে আমার হবে না, জাতীয়তার খাতিরেও না। এ কথা আরও মনকে পীড়িত করে যখন দেখি যে, বাংলাদেশের সঙ্গে ভারত হেরে গেলে, বা উলটোটা ঘটলে ফেসবুকে পরস্পরের নিন্দেমন্দ করার দুটো পক্ষ খাড়া হয়ে যায়। ভারতীয়রা বাংলাদেশিদের অকৃতজ্ঞ বলতে থাকে আর বাংলাদেশিরা ইতিহাস ঘেঁটে তাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর নানা 'কুকর্ম'-এর নজির উদ্ধার করে।

বিশেষ করে আদিবাসীদের ক্ষেত্রে নৃগোষ্ঠীগত পরিচয় বা

ethnicity আবার আরেক ধরনের 'আমি'-র উদ্ভব ঘটায়। আর ধর্মের 'আমি' তো মাথার শিং উঁচিয়ে খাড়াই আছে, তাকে এড়িয়ে পালাবে এমন সাধ্য কার? এখন তো এই উপমহাদেশে ধর্ম খুব উদ্যমী। ধর্মের তাত্ত্বিক বা দার্শনিক চেহারা নিয়ে কম লোকই মাথা ঘামিয়ে মরতে যায়, তার পুজো-আচ্চা, ঢাকঢোল, ধুনুচি নৃত্য, গুরুদেব, 'বাবা-মা'-দের খান্ডার উপস্থিতি, রিকশো স্ট্যান্ডে শনির থালা, শুক্কুরবারে লুচি খাওয়া, খুঁটি পুজো, বিসর্জন, চান তীর্থযাত্রা নিয়ে সে জমজমাট উদ্‌যাপন। কিন্তু ধর্ম কি মানুষের 'আমি'-কে সবসময় একটা বড় পরিসর দিতে পারে? কোথায় পারে? খ্রিস্টানদের মধ্যে তৈরি হল ক্যাথলিক, প্রোটেস্ট্যান্ট, অ্যাংলিক্যান, জেসুইট আরও কত দল,— এমনকি আমেরিকার মর্মন বা ক্রিয়েশনিস্টদের সম্প্রদায়। শেষের দল মনে করে ঈশ্বর দশহাজার বছর আগে এক সকালবেলায় পৃথিবী তৈরি করেছিল। মুসলমানদের শিয়াসুন্নিতে তৈরি হয়েছে যুযুধান ভেদরেখা, আগা খাঁর রমরমা সত্ত্বেও আহমদিয়া সম্প্রদায় পাকিস্তানে খুব সুখে বাস করছে না। হিন্দুদের মধ্যে উচ্চবর্ণের হাতে নিম্নবর্ণের বঞ্চনা আর নির্যাতন কুৎসিত চেহারা নিয়েছে দক্ষিণ উত্তর পুব পশ্চিম— ভারতের সমস্ত কোণে। ভারতের নানা প্রান্তে এই 'জাতপাত' অবশ্য ইংরেজিতে যাকে 'রিচ ডিভিডেন্ড' বলে তাই দেয়। জাতের ভিত্তিতে ভোট হয়, চাকরি হয়, শিক্ষামন্ত্রী নিজের জাতের উপাচার্য খুঁজে বার করেন বা অধ্যাপক। সেখানে দলের সঙ্গে জাতের রসায়ন নইলে কাজ হয় না। তবে হিন্দু 'আমি'-র পরিচয়ও দলিতদের যথেষ্ট আত্মরক্ষা দেয়নি। পাশাপাশি 'জাতীয়তা' বা রাষ্ট্রীয়তা আর একটা 'আমি'-র আধার। বস্তুত পক্ষে ধর্ম আর জাতীয়তা— এই দুয়ের সম্পর্ক নিয়ে পৃথিবীর ইতিহাস রক্তাক্ত হয়ে আছে, প্রায় দু-হাজার বছর ধরেই। আর অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, জাতীয়তার চেহারাও ইতিহাস প্রায়ই বদলে দেয়। বিশ শতকের প্রথম অর্ধকালের জাতীয়তা আর পরের অর্ধকালের জাতীয়তা ভারতের ক্ষেত্রে এক থাকেনি। আবার পাকিস্তানের জাতীয়তা ১৯৭১-এর পর কাটা পড়েছে, বাংলাদেশের বাঙালির নতুন জাতীয়তা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। সেই জাতীয়তার মধ্যেও মৌলবাদী আর অমৌলবাদীদের মধ্যে বিচ্ছেদ তো প্রায়ই সামনে চলে আসে।

আগেই বলেছি, পরিবারের আমি, বংশের আমি, জাতের আমি— এদের সঙ্গে আমার জন্মের একটা সম্পর্ক আছে। জন্মসূত্রে ওই পরিচয়গুলি আমার অর্জিত হতই। দেশের বা রাষ্ট্রের আর ধর্মের আমি কিছুটা আপতিক। আমি অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র বা ধর্মে জন্মাই, কিন্তু আমি ইচ্ছে করলে বা সুযোগ পেলে রাষ্ট্র বা ধর্ম বদল করতে পারি, ধর্মের কথা তো আগেই বলেছি। বহু ভারতীয় বাংলাদেশি, পাকিস্তানি, কোরীয়, ফিলিপিনো, চিনা, জাপানি ইংল্যান্ড বা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হয়ে গেছে। উপরে বর্ণিত অন্যান্য আমিও আপতিক, জীবনের পথে এগোতে এগোতে উপার্জন করা। কিন্তু সব আমির ওজন, সম্মান, সুযোগ যে একরকম নয় তা আমরা বুঝতে বেশি সময় নিই না।

আমরা জানি যে সব 'আমি' নিয়ে আমরা অহংকার করার অবস্থায় থাকি না। আমরা এক বৈদ্য সহপাঠী একবার আমাকে তাঁর এক আত্মীয় কলকাতা করপোরেশনের সেক্রেটারি বা কারও কথা খুব গর্বের সঙ্গে শুনিয়েছিল। তিনি আলাপ হওয়ার পর তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কী করা হয়?' সে তখনও বেকার জেনে বলেছিলেন, 'বৈদ্যের ছেলে, কিছু করে খেতে হবে তো? কাল একটা দরখাস্ত লিখে আমার কাছে দিয়ে যাবি।' বলা বাহুল্য, এই প্রশংসনীয় ছাউনি মেলে না আমি যদি তথাকথিত নীচু জাত হই, দলিত হই, যদি প্রশাসনে বা ক্ষমতার আসনে আমার জাতের লোক না থাকে। তাই আমাকে জন্মের পর থেকেই এক প্রত্যাশাহীন, অপমানপূর্ণ অহংকার-প্রতিষেধক জীবনে ঢুকে পড়তে হয়, যেখানে এক সময় উঁচু জাতের ঘেন্না আর নানা অমানুষিক বিধিনিষেধ (সড়কে গলায় ঘন্টা বেঁধে চলতে হবে, মেয়েরা তাদের বুক ঢাকতে পারবে না, উঁচু জাতের বাড়িতে খেতে দিলে আলাদা পাত্রে খাবে, খাওয়ার পর তা ধুয়ে দিতে হবে), এমনকি তাদের হাতে 'মার খাওয়া' বা কারণে-অকারণে খুন হওয়া ছিল ভবিতব্য। আমেরিকার কালো মানুষদের আর আদি আমেরিকানদের, অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের ইতিহাস তো সকলেই জানে। শিক্ষা আর সাংবিধানিক অধিকার আমাকে কিছু সুযোগ দিয়েছে, কিন্তু এখনও মানুষের সম্মানজনক ভিত পেতে আমাদের অনেক দেরি। দলিতরা গুজরাতে নবরাত্রে মেয়েদের নাচ দেখলে খুন হয়ে যায়, গোঁফ রাখলে পিটুনি খায়। কখনও কোনও অজুহাতই দরকার হয় না, নিছক হাতের সুখ করবার জন্য দলিতরা হচ্ছে তথাকথিত উঁচু জাত আর তাদের ধামাধরাদের নরম লক্ষ্য। ধর্ষণের লক্ষ্য যেমন নারীরা, নারীদের 'আমি' ওইরকম একটি দুর্বল আমি। শিশুদের আমি সেই রকম বয়স্কদের আমির স্নেহ আর পালনের উপর নির্ভরশীল— আর-একটি দুর্বল আমির দৃষ্টান্ত।

আর এইসব নানা 'আমি' নির্মাণের বহুজটিল জালের মধ্যে মানুষের 'আমি'-র যে একটা আরও বড়ো ভিত্তি আছে, আমি 'মানুষ' সেটা তো হারিয়েই গেছে। মানুষের মধ্যেও যে শারীরিক আর প্রাকৃতিক ভাবে দুটো 'আমি' ছিল পুরুষ আর নারীর— (প্রকৃতির স্বাভাবিক খেয়ালে একটি তৃতীয় লিঙ্গের একটি 'আমি'-ও এখন নিজেকে প্রকাশ করছে), তাকে পুরুষের 'আমি' এতদিন এতই পর্যুদস্ত ও নাস্তানাবুদ করে রেখেছিল যে এখনও নারীর সেই মূর্ছিত মোহগ্রস্ত অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পেরেছে কি

না সন্দেহ। এই আমি দুটির সম্পর্ক বেশ মজার। প্রকৃতিই এ দুটিকে পরস্পর নির্ভর করে তুলেছে, অথচ সামন্তযুগে পুরুষ যুদ্ধবিগ্রহের ফুর্তি আবিষ্কার করে তুলনায় দুর্বল নারীর আমিকে এমন করে কব্জা করে ফেলেছি যে তা থেকে নারীরা এখনও পুরোপুরি মাথা তুলতে পারেনি। এ দুয়ে মিলে যে সবচেয়ে বড় আমিটা, মানুষের আমি, তা বোধহয় আর আমাদের হিসেবের মধ্যে আসে না।

৪. এই আমিদের সম্পর্ক: ভালোবাসা, সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা, শত্রুতা

আরও কত কত আত্মপরিচয় তৈরি হয়ে যায় মানুষের, আমি তার ক-টাই বা তালিকায় আনতে পারলাম। সমাজবিজ্ঞানে কত ধরনের প্রাথমিক আর গৌণ গোষ্ঠী তৈরি হয় তার তালিকা পাঠকেরা পাবেন, আমি আমার শৌখিন চর্চাকে অতদূর নিয়ে যেতে পারব না।

প্রশ্ন হল, এই এত 'আমি'র সঙ্গে অন্য 'আমি'র অর্থাৎ আমির সঙ্গে অপরের (অপরও তো আর-একটা 'আমি') মধ্যে সম্পর্ক কী হবে, কী হওয়া উচিত? বলা বাহুল্য, 'উচিত' আর বাস্তব কখনওই এক হয় না। তবু মানুষের সভ্যতার ইতিহাস খুঁজলে এটা বোঝা যায় যে, মানুষের নির্মাণে, সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশে এক সময় সহযোগিতার ভূমিকা খুব বেশি ছিল।

পারিবারিক স্তরে এই সহযোগিতার নাম 'প্রেম' বা ভালোবাসা। পরিবার তৈরিই হয় দুটি বৃহৎ আমি, পুরুষ ও নারীর পরস্পরের শারীরিক আর মানসিক সহযোগে। এখন যদিও নানা দেশে সমকামীদের বিবাহ বিধিসংগত হচ্ছে, তা যে পরিবার বা সংসার গঠন করে তা একটা গুরুত্বপূর্ণ অর্থে সম্পূর্ণ হয় না, এই কারণে যে, তারা রক্তমাংসের সন্তান উৎপাদন করে না, যদিও সন্তান প্রতিপালনে তাদের বাধা নেই বলেই মনে হয়।

পুরুষ আর নারীর দুই 'আমি' সেদিক থেকে, প্রচলিত সংস্কারে, প্রাকৃতিকভাবে পরস্পর-মুখাপেক্ষী, অন্তত সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন পরিবার তারা তৈরি করে, এবং পরিবারের বিস্তার ঘটায় সন্তানের জন্ম দিয়ে। এই কাজে সামাজিকভাবে নিযুক্ত বা পরস্পরের ইচ্ছায় মিলিত— দু পক্ষের মধ্যে এক ধরনের সহযোগিতা অবশ্যই দরকার, প্রেম থাক আর না থাক। অন্তত সন্তানের জন্মদানের এবং লালনপালনের জন্য। তাতেও নানা সমস্যা তৈরি হয় তা আমি জানি, দৈনিক খবরের কাগজগুলি নানা বীভৎস আর মর্মান্তিক আখ্যান আমাদের উপহার দিয়েই চলেছে। পরিবারের সন্তানদের পরস্পরের মধ্যেও ভালোবাসা, সহযোগিতার পাশাপাশি প্রতিযোগিতার ছকও তৈরি হয়ে যায়। 'তোর দাদাকে/দিদিকে/ভাইকে/বোনকে দ্যাখ্ তো!' এই বাণী একাধিক সন্তানের সংসারে প্রায়ই বর্ষিত হয়, আর পাশের বাড়ির ছেলে বা মেয়ের সঙ্গে তুলনা তো আছেই।

হয়তো আমাদের উপরের চারটির মধ্যে শেষ তিনটির উল্লখ করাই উচিত ছিল— সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা, শত্রুতা। কারণ ভালোবাসা একটি মানসিক বোধ, আর বাকি তিনটি হল আচরণ, অন্তত শত্রুতাকে, বোধের পাশাপাশি আচরণ হিসেবেও ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু আমরা চারটিকেই আচরণ বা সক্রিয়তা হিসেবে দেখতে চাই।

সমস্ত ব্যক্তিগত 'আমি' এবং প্রতিষ্ঠানগত 'আমি' সম্ভবত (কথাগুলি ভয়ে ভয়ে বলি, অ্যামেচারের দ্বিধা নিয়ে, তাই 'হয়তো', 'সম্ভবত', 'মনে হয়' ইত্যাদি দ্বিধাবাচক এবং কুণ্ঠিত শব্দাবলি একটু বেশি-বেশি আসবে) এই চারটি প্রক্রিয়ার দ্বারাই আক্রান্ত হয়। বিশেষ করে এই সমাজ প্রতিযোগিতা থেকে শত্রুতায় যাওয়ার নানা প্ররোচনা তৈরি করতে বিশেষ নিপুণতা দেখাচ্ছে। ভাইয়ে ভাইয়ে মুখ দেখাদেখি থাকছে না, সহপাঠী ছাত্রছাত্রীদের তাদের অভিভাবকেরা কেউ কেউ বলছেন, 'খবরদার তোমার খাতা টুম্পাকে দেখাবে না', প্রতিবেশীরা জমি নিয়ে মামলা করতে ছুটছেন, রাজনৈতিক দল অস্পষ্ট আদর্শগত কারণে (সুকুমার রায়ের 'চলচ্চিত্তচঞ্চরী'-র দুই প্রতিষ্ঠানের ওরা বলে "কেন্দ্রগতং নির্বিশেষং' আর আমরা বলি 'কেন্দ্রগতং নির্বিশেষং চ'-জাতীয়, যদিও জানি এটা আমার নির্বোধ সরলীকরণ) দু-তিনভাগে ভাগ হয়ে পরস্পরের 'শত্রু' হয়ে উঠেছে, নাটকের দল ভাঙছে, রাষ্ট্রসত্তা গড়ে তোলার জন্য নেতারা দুই জাতি তত্ত্ব তৈরি করেছেন, এবং ভঙ্গুর রাষ্ট্র প্রসব করছেন, পৃথিবীর নানা রাষ্ট্রে শক্তি পরস্পরের বিরুদ্ধে ভয়াবহ বিশ্বযুদ্ধে মত্ত হচ্ছে। অনেক শত্রুতাই সাময়িক, এবং অসম্পূর্ণ— সেটা সুখের কথা। বাড়িতে স্বামী-স্ত্রী এবং দুই ভাইয়ের মধ্যে দুই দলের সমর্থক দেখা যায় না তা নয়। যদিও মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের সমর্থক এবং সংবাদ মাধ্যম এ দুটি দল সম্বন্ধে 'চিরশত্রু' কথাটা ব্যবহার করে তবু মনে হয় তাঁদের মধ্যেও কখনও কখনও বোঝাপড়া এবং হৃদ্যতাবিনিময় হয়।

আমি উলটো বৃত্তান্তগুলিকে প্রাণপণে ভুলে থাকছি না। ভাইয়ে ভাইয়ে মিল হয়, অন্তত আগে শরৎচন্দ্রীয় আখ্যানে তো হতই, ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট দাঙ্গাবিধ্বস্ত কলকাতায় হিন্দুমুসলমানের অশ্রুসিক্ত আলিঙ্গন দেখা যায়, যুদ্ধ থামে, নানা ধরনের বোঝাপড়া, সহযোগিতার উত্তর-ইতিহাস তৈরি হয়, রুষিয়ার সভাপতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতিকে গণ্ডদেশে চুম্বন করেন, যুদ্ধে পরাজিত জাপান আমেরিকায় দ্রব্য রপ্তানি করে সে দেশে বাণিজ্যিক ঋণের সংকট তৈরি করে। এ দুটোই সত্য। সত্য বলেই আমরা বাঁচি, এগিয়ে যাই।

আর দ্বিতীয় কথা এই যে, কখনও কখনও শত্রুতাও দরকার

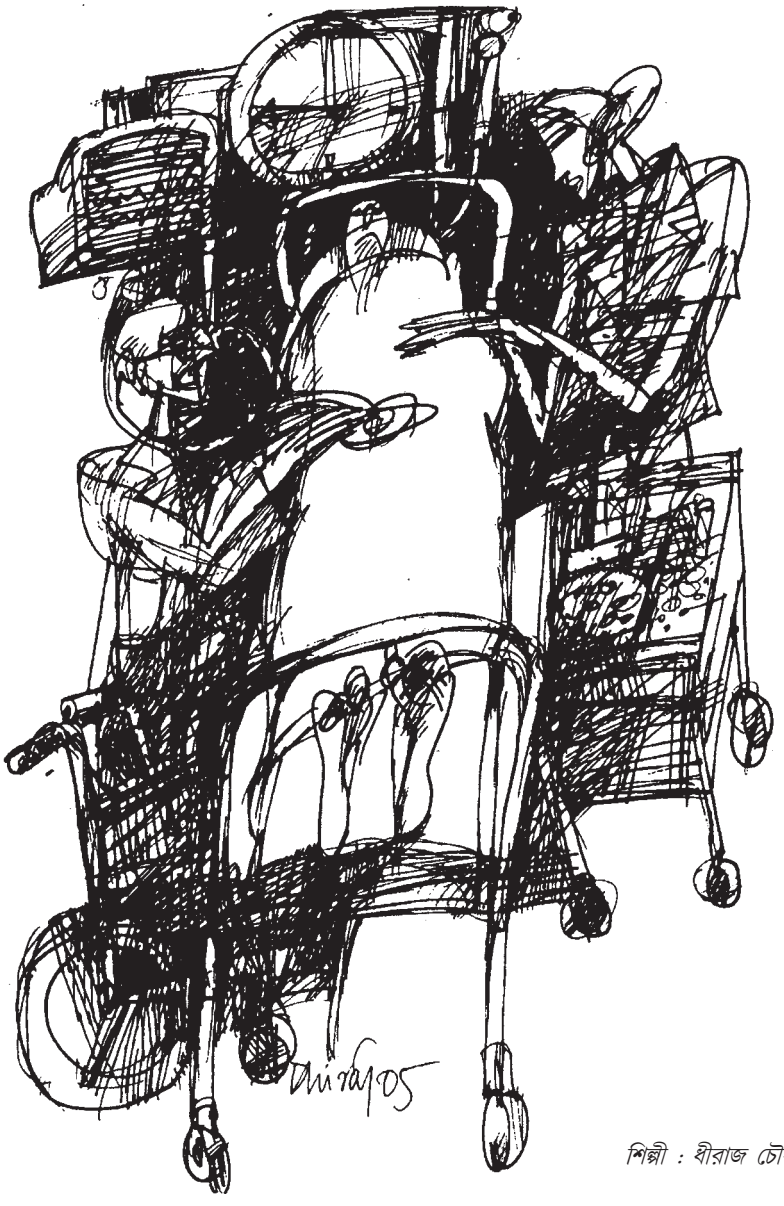

শিল্পী : ধীরাজ চৌধুরী

হয় না এমন নয়। যারা এতদিন বঞ্চিত রইল, পড়ে পড়ে মার খেল, মানুষ হিসেবে তাদের উঠে আসা, মানুষের অধিকার অর্জন করা— কঠিন লড়াই ছাড়া হয় না, কারণ পুঁজিবাদ-মুগ্ধ মধ্যবিত্তের পৃথিবী তাদের কথা খেয়ালই করে না। তাই শ্রমিকদের ধর্মঘট করতে হয়, কখনও বিপ্লব করতে হয়, নারী প্রান্তিক মানুষ আর দলিতদের অন্ধ আর বধির পৃথিবীকে ধাক্কা দিয়ে বলতে হয়, 'আমরা আছি, আমরা মানুষের অধিকার চাইছি, আমাদের কথা শোনো'। এ শত্রুতা অবশ্য অকারণ হিংসার শত্রুতা নয়। তার দৃষ্টান্তও ভূরি ভূরি তৈরি হয়। 'তুই আমার উন্নতিতে বাধা, আগে তোর প্রমোশন হবে, কাজেই আমি তোর নামে চুকলি খাব, তোর নামে ওপরওয়ালাকে লাগাব'— যেখানে প্রতিযোগিতা প্রমোশন পায় শত্রুতায়। তা থেকে 'তুই আমার ধর্মের নোস, কাজেই অইউ (QED)— তুই আমার শত্রু'— এই শয়তানি যুক্তির শত্রুতা, বিপুল ঘৃণার শত্রুতায় প্রায়ই পৌঁছে যাই আমরা।

তবু এ সবের মধ্যে সেই 'আমি'টাকে খুঁজতে হয়, যে 'আমি' হল 'মানুষ', অন্য সব 'আমি'-র চেয়ে বড়ো, সব অপরকে নিরস্ত করে সত্য হয়ে থাকে। মানুষের মনের মধ্যে, গোপনে। কে জানে কত জন সেই সন্ধান করছে। কেউ কেউ করছে।

সেই সন্ধান চলুক।

UTTORA

Good Living Got Better

Our New Project

At

Bagdogra, Darjeeling District

Luxmi Portfolio Ltd.

রুমি

নবনীতা দেবসেন

মিমি রুমি পাপুন। ওদের বাড়িতেই আমার প্রথম দেখা অশোকদার সঙ্গে। অশোকদা তখন বুদ্ধদেব বসুর পরম ভক্ত আর প্রতিভা বসুর স্নেহধন্য, ঝলমলে এক তরুণ বুদ্ধিজীবী। তাঁদের সঙ্গে আছেন নরেশ গুহ, অরুণ সরকার, নিরুপম চট্টোপাধ্যায়। মিমি রুমি পাপুনের সঙ্গেও অশোকদার হৃদ্যতা ছিল গভীর। অশোকদা চিরকালই ছোটোদের সঙ্গে মিশতে ভালবাসেন। আর রুমি পাকাবুড়ি হয়ে বড়োদের সঙ্গে মিশতে ভালোবাসত। দুই ছেলেমানুষ ভাই-বোনের দিদি মিমি কোনোদিনই ছেলেমানুষ হবার সুযোগ পায়নি তেমন করে, আমি অবিশ্যি তার ছোটোবোনের বন্ধু হয়েও মিমিকে নাম ধরে ডাকতুম। বুদ্ধদেব বসুর পরিবারে ছোটোদের এই একটা বিলিতি কায়দা ছিল, বড়োদের নাম ধরে ডাকা, মামা কাকা দাদা এসব না বলে পুরো নাম, পদবিসমেত, উচ্চারণ। আমার পুরোনো বাড়ির আদবকায়দায় সেটা খুব অস্বস্তিকর লাগত। আমার থেকে রুমি দু-বছরের ছোটো আর মিমি দু-বছরের বড়ো, আমি ফিট করে গিয়েছিলুম তাদের মাঝখানে। মিমি আর আমি এক কলেজে একসময়ে বিএ পড়েছি, এক ক্লাসে যদিও নয়, এক কমন রুমে আড্ডা মেরেছি। কিন্তু ছোটো থেকে আমার ভাব ছিল রুমির সঙ্গেই বেশি যদিও সে ছিল চার বছরের জুনিয়র। অথচ কী আশ্চর্য বয়েস হবার পরে মিমি জ্যোতির সঙ্গেই আমার বেশি ভাব রইল, যদিও তারা তখন বিদেশ-প্রবাসী, কেননা রুমির দ্বিতীয় স্বামী রামির সঙ্গে কোনোদিনই সামাজিকভাবে মেলামেশার সুযোগ হয়নি আমার, তিনি লাজুক মানুষ। মাত্র একবারই দেখা হয়েছিল। রুমির প্রথম স্বামী প্রদীপ ঘোষ ছিলেন আমাদের পুরোনো বন্ধু। সহপাঠী। স্বদেশে, বিদেশে। তিনি একাই থাকেন কলকাতায়, মাঝে মাঝে দেখা হয়ে যায়। তিনিও খুব একটা মিশুকে মানুষ নন। কিন্তু অশোকদার কাছেও প্রদীপের দেখা পেয়েছি। রুমি-প্রদীপের ছেলে, মেয়ে বুয়ান, নিয়ান বিদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত। রুমি যেত মাঝে মাঝে ছেলে-মেয়ে-নাতি-নাতনির কাছে। রুমি কাল চলে গেল তার মা-বাবা-ছোটোভাইয়ের কাছে। আর বোনপো গোগোর কাছে। চলে গেলেন বলতে পারছি না, অসুবিধে হচ্ছে।

বুদ্ধদেব, প্রতিভা ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ ছেড়ে যাবার পরে অশোকদার বাড়িতেও মাঝে মাঝে দেখা হয়েছে রুমির সঙ্গে, কিন্তু খুব বেশি নয়। অশোকদা খুব স্নেহ করতেন রুমিকে। নরেশদাও। 'রুমির ইচ্ছা' নরেশদার পদ্য শ্রেষ্ঠ আধুনিক বাংলা কবিতার মধ্যে ঠাঁই পেয়েছে। আজ রুমি চলে গেল, কী ভাগ্যিস সে খবর শোনার জন্য বসে নেই ওরা কেউই। বুদ্ধদেব বসুর রুমিকে লেখা পত্রাবলির যে সটীক সংকলন রুমি প্রকাশ করেছে তার জন্য বাঙালি পাঠক চিরকৃতজ্ঞ থাকবে। অনেক রকমের কাজে হাত দিয়েছে রুমি।

ছেলেবেলা থেকে ২০২ রাসবিহারী এভিনিউতে 'কবিতাভবনে' বই আর ছবির মধ্যে বেড়ে উঠেছে রুমি, আর পড়াশুনোর মধ্যে। তার প্রত্যেকটাই রুমি নিজের জীবনে স্বচ্ছন্দে প্রয়োগ করেছে। ইন্ডিয়ানা থেকে পিএইচডি করে এসে, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছে, 'বিকল্প' প্রকাশনা খুলে বই প্রকাশের কাজ করেছে, ছবি কেনা-বেচার আঙিনাও খুলেছে, যাতে মধ্যবিত্ত মানুষ সাধ্যের মধ্যে ছবি কিনতে পারেন। সহায়ক ছিলেন ভ্রাতৃপ্রতিম সোমনাথ। রুমির সঙ্গে আমার শেষ দেখা শানু লাহিড়ীর লেখা আর ছবি ঝলমলে ইংরেজিতে অচিন্ত্যনীয় বাংলা রান্নার বই টেবলড (Tabled)-এর উদ্‌বোধনে। সবাই তাড়াহুড়োর মধ্যে বাড়ি ফিরে এলুম, ভালো করে কথাও হল না রুমির সঙ্গে। আমরা যাদবপুরে একসঙ্গে পড়িনি বটে কিন্তু সবকিছুই একসঙ্গে করেছি। ভর্তি হওয়া থেকে শুরু। বুদ্ধদেব বসু একদিন আমাকে আর রুমিকে (দময়ন্তী বসু) নিয়ে পাঁচ নম্বর বাসে করে চললেন যাদবপুরে। উদ্দেশ্য, আমাদের ভর্তি করা। আমি এমএ ওয়ানে, রুমি বিএ ওয়ানে। কিন্তু ভর্তি হওয়া হল না। কেননা তখনও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদনপত্রই ছাপা হয়নি। রেজিস্ট্রার মশাই পি সি ভি মল্লিক বললেন, 'তাতে কিছু হবে না, তোমরা হাতে লিখে আবেদনপত্র জমা দিয়ে যাও'। বলে দুজনের হাতে দু-খানি বড়োসড়ো কাগজ দিলেন। বুদ্ধদেব আমাদের ডিক্টেশন দিলেন, আর আমরা আবেদনপত্র লিখলুম, শেষকালে সই করে জমা। যাদবপুরের বিএ ক্লাসের প্রথম পড়ুয়া রুমি। এমএ ক্লাসের আমি। হাত-ধরাধরি ফিরে এলুম দুজনে হাসিখুশি। ভারতবর্ষের প্রথম তুলনামূলক সাহিত্যের বিভাগ খুলল, রুমিকে আর নবনীতাকে নিয়ে।

শব্দের ঠিকুজি-কুলজি

সুভাষ ভট্টাচার্য

শব্দের অর্থ বা প্রয়োগক্ষেত্র অভিধানের প্রধান বিষয় হলেও শব্দ কোথা থেকে এল, তার অভিযাত্রা কোন পথে, এসবও তো রীতিমতো কৌতূহলজনক বিষয়। একথা সব বিশেষজ্ঞই স্বীকার করেন যে, সাধারণ শব্দার্থ-অভিধানে ব্যুৎপত্তি ব্যাপকভাবে দেখাবার সুযোগ নেই, প্রয়োজনও নেই। এই কথাটা মেনে নিয়ে কেবল ব্যুৎপত্তি-অভিধানের কথাই বলব। আমরা লক্ষ করেছি যে, ব্যুৎপত্তি বা etymology সম্বন্ধে আমাদের বাঙালি অভিধানকারদের দৃষ্টিভঙ্গি মোটেই মেলে না পাশ্চাত্যের বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিভঙ্গি বা ধারণার সঙ্গে।

বাংলায় আজ পর্যন্ত মাত্রই গুটিকতক ব্যুৎপত্তি-অভিধান রচিত হয়েছে। তার মধ্যে দুটি সুকুমার সেনের, একটি ইংরেজি ভাষায়— Etymological Dictionary of Bengali, অন্যটি ব্যুৎপত্তি-সিদ্ধার্থ বাংলা কোষ। কিন্তু বলতে বাধা নেই এ-দুটি কোনো বিচারেই প্রকৃত ব্যুৎপত্তি-অভিধান হয়ে ওঠেনি।

ব্যুৎপত্তি বা etymology বলতে কী বোঝায় তা পরিষ্কার করেছে অক্সফোর্ড— অক্সফোর্ড হাউসের মতে etymology হল 'an account of the origins and developments of a word'. ঠিক এখানেই বাংলা অভিধানগুলো পিছিয়ে আছে। বাংলায় ব্যুৎপত্তি দেখাতে গিয়ে অভিধানকারেরা শব্দের origin বা উৎপত্তি যদি-বা দেখান, শব্দের বিকাশ বা বিবর্তন সম্পর্কে আগ্রহী নন তাঁরা। তৎসম শব্দ হলে তার প্রকৃতি-প্রত্যয় দেখানো হয়, আর অতৎসম হলে কোন দেশজ বা বহিরাগত ভাষা থেকে শব্দটি এসেছে তার উল্লেখ করা হয়। এমনকী, সুকুমার সেনও তাঁর দুটি বাংলা-ইংরেজি অভিধানে এর বেশিকিছু করেননি। তাঁর Etymology বাংলা ভাষার প্রথম ব্যুৎপত্তি-অভিধান, অবশ্য ইংরেজিতে লেখা তা। ওই বইয়ে সেন মহাশয় শব্দের অর্থ দেখাতে যত কথা ব্যয় করেছেন, তার উৎস নির্দেশ করতে ততটা করেননি। এমনকী, অনেক বছর পরে লেখা তাঁর ব্যুৎপত্তি-সিদ্ধার্থতেও অর্থেরই প্রাধান্য। দু-একটা দৃষ্টান্ত দেখাই যায়—

কোয়াশা বি. শীতের ভোরে ধোঁয়াটে জলকণার আবরণ < সং কুহকবাসক।

কোমর বি. কটিদেশ, শরীরের মধ্যভাগ < ফা।

২০০৭-এ বিমলেন্দু দাম রচনা করেন একটি ব্যুৎপত্তি-অভিধান— বাংলা শব্দের উৎস সন্ধানে। সেখানেও আছে 'কোমর' শব্দটি। অর্থ মাজা বা কটিদেশ। তবে এক ধাপ এগিয়ে ফার্সি শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে— কমর। যার উল্লেখ সুকুমার সেন করেননি। বিমলেন্দু দামের অভিধানে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবছাভাবে শব্দের বিবর্তনের একটা ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। কোথাও কোথাও প্রতিবেশী ভাষার শব্দের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, যেমন 'পসার' শব্দের ক্ষেত্রে। কন্নড় ভাষায় শব্দটির কী রূপ তা দেখানো হয়েছে। এদিক থেকে সুকুমার সেনের ব্যুৎপত্তি-সিদ্ধার্থ-র চেয়ে বিমলেন্দু দামের অভিধান একটুখানি এগিয়ে। অবশ্য বিমলেন্দু দামের অভিধানে শব্দসংখ্যা খুবই কম।

দুই

কিন্তু ব্যুৎপত্তি দেখাতে গিয়ে অভিধানকার যদি শব্দের মানে আর সাক্ষাৎ উৎস বা immediate source-এ আটকে থাকেন, তাহলে সেটা তো মোটেই উৎস-সন্ধান হল না। শব্দের বিবর্তন বা ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত করাই ব্যুৎপত্তি-অভিধানের প্রকৃত লক্ষ্য হওয়া উচিত। অভ্র বসুর 'শব্দগল্পদ্রুম'-এ কিছুটা হলেও সে-চেষ্টা দেখা গেছে। এক-একটা শব্দ নিয়ে তার সম্পর্কে গল্পচ্ছলে তার ইতিহাস বা 'পদরেখা' ধরবার চেষ্টা করেছেন অভ্র। 'প্রকৃত ব্যুৎপত্তি-অভিধানের দিকে একটা আত্মপ্রত্যয়ী পদক্ষেপ। অভ্র-র অভিধানে শব্দসংখ্যা বড়োই কম। তা নিয়ে আক্ষেপ অহেতুক, কেননা অভ্র নিজেই বলেছেন পূর্ণাঙ্গ 'কেজো একটি অভিধান' রচনা করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। আমরা অবশ্য বলি, আর একটু সময় ব্যয় ক'রে একখানা পূর্ণাঙ্গ ব্যুৎপত্তি-অভিধান রচনা করলেই কি ভালো করতেন না অভ্র? একটা ইতিবাচক পদক্ষেপ তো তিনি করেইছেন।

তিন

এ দেশে শব্দকোশে ব্যুৎপত্তি দেখানোর রেওয়াজ বেশি দিনের নয়। সংস্কৃত অভিধানে শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় দেখানো হত। কিন্তু

ওই পর্যন্তই। বাংলা অভিধানে ব্যুৎপত্তির আভাস দেওয়া হলেও পৃথক ব্যুৎপত্তি-অভিধান একেবারেই হাল আমলের ব্যাপার। অথচ সপ্তদশ শতকের ইংরেজি অভিধানেও ব্যুৎপত্তি দেখানো হত। শুধু তা-ই নয়, ইংল্যান্ডে ওই শতকে একাধিক ব্যুৎপত্তি-অভিধান রচিতও হয়েছিল। প্রথমটি স্টিভন স্কিনার-এর (Stephen Skinner 1623-67) Etymologicon linguae anglicanae, যা প্রকাশিত হয়েছিল স্কিনার সাহেবের মৃত্যুর পরে। দ্বিতীয়টি Gazophylacium Auglicanum, প্রকাশকাল ১৬৮৯। এর রচয়িতা কে তা জানা যায় না।

ইংরেজি ভাষায় ব্যুৎপত্তি-অভিধানের রচনা তার পরেও থেমে থাকেনি। ফ্রান্সিস্কাস ইউনিয়াস (Franciscus Junius), অক্সফোর্ড-স্কলার এড্ওআর্ড বার্নার্ড (Edward Bernard) প্রভৃতি আভিধানিকেরা সপ্তদশ শতকের পরে ব্যস্ত থেকেছেন ব্যুৎপত্তি-অভিধানের রচনায়। মজার কথা, সেই সময়ের অনেক বইয়ের শিরোনাম লাতিনে লেখা হত। বিস্ময়ের কথা, কেউ-কেউ ব্যক্তিনাম আর স্থাননামেরও ব্যুৎপত্তি অনুসন্ধান করেছেন।

ফরাসি ভাষায়ও ব্যুৎপত্তি-অভিধান রচিত হয়েছে তিনশো বছর আগে। একটি দৃষ্টান্ত হল জ়িল মেনাজ়-এর অভিধান, Les origines de la langue Francaise Gilles Ménage. লাতিন গ্রিক স্প্যানিশ প্রভৃতি ভাষায়ও ব্যুৎপত্তি-অভিধান রচিত হওয়ার খবর পাই আমরা।

চার

আগেই বলেছি, ব্যুৎপত্তি বলতে একটা শব্দের মূল গঠনটাকেই কেবল বোঝায় না, কেবল প্রকৃতিপ্রত্যয়কেও বোঝায় না। একটা শব্দের উৎসসমেত তার বিবর্তনকে বোঝায়। উৎপত্তি থেকে বিকাশের স্তর পর্যন্ত শব্দের যাত্রাপথটিকেও চিহ্নিত করতে হয়। ব্যুৎপত্তির এটাই বৃহত্তর অর্থ। বাংলায় আজ পর্যন্ত একটিমাত্র অভিধান এই কাজ করেছে, অবশ্যই সীমিতভাবে। বলছি হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'-এর কথা। এখানে একটুখানি দেখে নেব হরিচরণ কীভাবে শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করেছেন। মনে রাখতে হবে হরিচরণের 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' কোনো ব্যুৎপত্তি-অভিধান নয়, সাধারণ শব্দার্থ অভিধান। অথচ তিনি বহু শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখিয়েছেন ব্যাপক বিস্তারে। আমি দুটি-তিনটি শব্দ নিচ্ছি উদাহরণ হিসেবে—

আলুণি, -নি বিং [সং অলবণিক > প্রা আলোণিয় (প্রা.ম), -ণিঅ > বা (আ লোণি) আলুণি, -নি]

কাঁজি, -জী বি [সং কাঞ্জিক, -ঞ্জী > প্রা কংজিঅ (প্রা.ম), দ কংজী > বা ৺জি, -জী; হি কাঁজি, ঠ কাজী, P Canja; E Congee, conjee (rice-preparation) Campos]

শুধু কি এই? হরিচরণ 'কুড়ি' শব্দটির উৎস সন্ধান করতে গিয়ে ON বা প্রত্ন-নরওয়েজীয়, OE বা প্রত্ন-ইংরেজি, AS বা অ্যাংলো-স্যাক্সন উৎস বিচার করেছেন, আর সেইসঙ্গে হিন্দি ও মারাঠি উৎসেরও তুলনা এনেছেন। একটা শব্দ সংস্কৃত থেকে প্রাকৃত ও অপভ্রংশের স্তর হয়ে কীভাবে বাংলায় এল তা দেখিয়েছেন নিপুণভাবে। ইংরেজ আভিধানিক এরিক পার্ট্রিজ (Eric Partridge) ঠিক এভাবেই শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখিয়েছেন তাঁর বিখ্যাত Origins বইয়ে। কিন্তু সে তো ১৯৫৮ সালে। আর হরিচরণ অনেকটা সেই কাজই করেছেন প্রায় ত্রিশ বছর আগে, তাও কোনো ব্যুৎপত্তি-অভিধানে নয়, করেছেন একটি শব্দার্থ-অভিধানে।

পাঁচ

একথা অবশ্য ঠিক যে, ব্যুৎপত্তির প্রথম পর্যায় শব্দের immediate source বা সাক্ষাৎ উৎসের খোঁজ। বাংলায় তৎসম শব্দের বেলায় প্রকৃতি-প্রত্যয়, আর অতৎসম শব্দের বেলায় মূল উৎসের পরিবর্তিত রূপ। এমন বহু শব্দ আছে যেগুলোর সাক্ষাৎ উৎস সম্বন্ধে কোনোই সংশয় নেই। তাদের রূপ-বদলও বেশ সহজে বোঝা যায়। কোনো-একটা শব্দ বিদেশি কোনো ভাষা থেকে এসে থাকলে তার যাত্রাপথ অনেকসময়েই কুটিল নয়, বরং সরল। 'জিনিস' শব্দটা যে আরবি 'জিন্স্' থেকে এসেছে এই তথ্য এতটাই নিশ্চিত যে, এ নিয়ে সংশয় বা বিতর্কের কোনো সুযোগ নেই। ইংরেজি crush শব্দটির মূল খুঁজতে গিয়ে দেখা যায় শব্দটি এসেছে মধ্য ইংরেজি বা Middle English-এর *cruschen* থেকে, যা আবার এসেছে প্রত্ন-ফরাসি বা Old French cruisir থেকে, *cruisir* এসেছে প্রত্ন-জার্মান *Krostian* থেকে। তাহলে বিবর্তনটা এভাবে দেখানো যায়— *crush* < ME *cruschen* < OF *cruisir* < OG *Krostian.* এমন অনেক শব্দই আছে যেগুলোর উৎস সম্বন্ধে এতখানি নিঃসংশয় হওয়া যায় না। ইংরেজি *dog*-এর উৎস দেখাতে গিয়ে পার্ট্রিজ বলেছেন শব্দটি এসেছে প্রত্ন-ইংরেজি *docga* থেকে, কিন্তু সেইসঙ্গে তিনি একটি মন্তব্য যোগ করেছেন— probably echoic. এই probably echoic কথাটাই বুঝিয়ে দিল যে সংশয় আছে। আগেই বলেছি বাংলা ভাষার ব্যুৎপত্তি-অভিধানগুলোয় শব্দের সাক্ষাৎ উৎস বা প্রত্যক্ষ উৎস দেখিয়েই কাজ সারা হয়। সুকুমার সেন যেমন ব্যুৎপত্তি দেখিয়েছেন এইভাবে—

চুন < সং চূর্ণ
চুনারি < সং চূর্ণকারিক
চাঁপা < সং চম্পক
শাড়ি < সং শাটিক

পাশাপাশি দেখা যাক এরিক পার্ট্রিজ তাঁর Origins বইয়ে কীভাবে ব্যুৎপত্তি দেখিয়েছেন। আমরা almond শব্দটা নিচ্ছি—

almond: ME almande: OF alemande (MF-F

amande): Late VL *amandula* (cf Rum *mandula,* var of *migdala*): L *amygdala*: Gr *amugdale,* perh from Asia Minor— if not the Orient— but cf H *magdī'el* (or *meged'el*), 'Precious gift from God', and OProv *amela.*

এখানে বলে দিই ME মধ্য-ইংরেজি, OF প্রত্ন-ফরাসি, VL ভালগার লাতিন, L লাতিন, H হিব্রু, OProv প্রত্ন-প্রভাঁসাল।

আরও বলি, সুপরিচিত hammer শব্দের ব্যুৎপত্তি সন্ধান করতে গিয়ে পার্ট্রিজ মধ্য-ইংরেজি, প্রত্ন-ইংরেজি, জার্মানিক, প্রত্ন-ফ্রিজিয়ান, মধ্য হাইজার্মান, প্রত্ন-নরওয়েজীয় উৎসের সঙ্গে তুলনা করেই ক্ষান্ত হননি, সংস্কৃত 'অশ্ম' শব্দটিরও উল্লেখ করেছেন। এতে কি একথাই বোঝা গেল না, যে পার্ট্রিজ মনে করেন, কোনো-একটা শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখাতে হলে শব্দটির কেবল মূলের হদিশ দেওয়াই যথেষ্ট নয়, আত্মীয়পদবাচ্য বা cognate ভাষাগুলোয় শব্দটির কী রূপ তাও দেখা দরকার। যেমন তিনি hummer-এর বেলায় লক্ষ করেছেন যে, কোনো কোনো ভাষায় পাথরের অনুষঙ্গ এসেছে। অর্থাৎ কোথাও কোথাও তাহলে হাতুড়ি পাথর দিয়েও তৈরি হত।

পার্ট্রিজ এইভাবে শব্দের ব্যুৎপত্তির সুবাদে এক-একটা শব্দের বিবর্তন বা ইতিহাসই বিবৃত করেছেন। মনে পড়ছে অক্সফোর্ডের কথাটা— ব্যুৎপত্তি হল শব্দের উৎস ও বিবর্তনের বিবৃতি।

ছয়

Etymology বা ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে অক্সফোর্ড ডিকশনারি যা বলেছে সেটা সাধারণভাবে গ্রহণীয় হলেও এর মধ্যে আরও কিছু কথা আছে। শব্দের বিবর্তন মানে তো শব্দের ইতিহাস। সেই ইতিহাসকে ধরতে হলে শব্দের ভিতর-বাহির দুটোর উপরই সন্ধানী দৃষ্টি দেওয়া চাই। ইতিহাসের প্রসঙ্গে একটা অসামান্য অভিধানের কথা বলতে হয়। সেটি অক্সফোর্ডের 20th Century Words, লেখক জন এইটো (John Ayto)। প্রকাশকাল ১৯৯৯। ১৯০০-০১ থেকে বিংশ শতকে যত নতুন শব্দ ইংরেজি ভাষায় এসেছে সেগুলো বিবৃত হয়েছে। প্রতিটা শব্দ কার কোন রচনায় বা কোন সংবাদপত্রে প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল তা দেখানো নিখুঁতভাবে। এর আগে Shorter Oxford English Dictionary-তেও আমরা শব্দের ইতিহাসের, প্রথম ব্যবহারের হদিশ পেয়েছি। তবে এত খুঁটিনাটি সেখানে নেই। ব্যুৎপত্তির একটা দিক যদি হয় শব্দের ইতিহাস, তাহলে বলব, শব্দের প্রথম ব্যবহার নথিভুক্ত করা একান্তই জরুরি। অথচ আমাদের ভাষায় তেমন উদ্যোগ আজ পর্যন্ত দেখা যায়নি। আরও একটা কথা— কোনো শব্দ লিখিতভাবে কবে প্রথম পাওয়া গেল তার রেকর্ড করা গেলেও শব্দটি নিশ্চয় মানুষের মুখে মুখে অনেক আগে থেকেই ব্যবহৃত হয়েছে। তার হিসেব কীভাবে পাওয়া সম্ভব?

পাশ্চাত্যের ভাষাবিজ্ঞানীরা এবং বিশেষভাবে ব্যুৎপত্তি-বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন যে, শব্দের গঠন আর গঠনগত বিবর্তন যতটা জরুরি, ততটাই জরুরি শব্দের অর্থগত পরিবর্তনের (Semantic change) বিবৃতি। ইংরেজির কথাই ধরা যাক। Navigation শব্দটা বহুকাল পর্যন্ত সমুদ্রে জাহাজের গতিপথের প্রসঙ্গেই ব্যবহৃত হত। এখন তো বিমান বা সাধারণ গাড়ির গতিপথ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও দিব্যি ব্যবহার করা হচ্ছে। ব্যুৎপত্তি-অভিধানে এই shift বা পরিবর্তনের একটা ইশারা থাকা একান্তই দরকার। ইংরেজি treacle শব্দটার অর্থ শুরুতে ছিল বুনো জন্তু, naughty-র অর্থ ছিল অকর্মণ্য। বাংলায়ও এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। 'আলোক' শব্দের অর্থ গোড়ায় ছিল দেখা, দর্শন। 'গহ্বর' গোড়ায় ছিল বিশেষণ— গভীর। গর্ত অর্থটা এসেছে পরে। এর কারণ, যে-গাহ্ ধাতু থেকে শব্দটা নিষ্পন্ন হয়েছে, তার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে গভীরতার।

ইংরেজিতে ব্যুৎপত্তি-অভিধান রচিত হয়েছে অনেকগুলো। উইকলির An Etymological Dictionary of Modern English, ক্লাইনের A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language, বার্নহার্টের Dictionary of Etymology, হোল্টহাউজেনের জার্মান ভাষায় লেখা Etymologisches Wörterbuch der englischen Sprache ইত্যাদি। এছাড়া পুরোনো দিনের স্কিট (Skeat) বা অনিয়ন্স-এর (C.T. Onions) ব্যুৎপত্তি-অভিধান তো আছেই।

ব্যুৎপত্তির বিবৃতিতে ধ্বনিপরিবর্তন, শব্দের মূল গঠন, বানানের পরিবর্তনও দেখাতে হয়। 'ইংরেজিতে cupboard শব্দের প্রথম রূপ ছিল cup board, alone ছিল all one. এর হদিশ ব্যুৎপত্তি-অভিধানে থাকবে না কেন?

অক্সফোর্ডের একটি অভিধানে— New Oxford Dictionary of English (NODE 1998, 2005)— শব্দের উৎসকাল গোড়াতেই দেওয়া হয়েছে। সেখানে abacus শব্দটার বিবৃতিতে প্রথমেই Late Middle English কথাটা বলে দেওয়া হয়েছে। অথচ, ওটা একটা সাধারণ শব্দার্থ অভিধান, মোটেই কোনো ব্যুৎপত্তি-অভিধান নয়।

খুবই আক্ষেপের কথা, আমাদের ভাষায় হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় যেটা করে দেখিয়েছেন বহু বহু শব্দে, সেটা পরে কেউ আর ধরে রাখলেন না। আমাদের ভাষায় ভাষাবিষয়ক তথ্যসংগ্রহের বা তথ্যসংরক্ষণের কোনো বিধিবদ্ধতা নেই। কোন শব্দ কবে প্রথম ব্যবহৃত হয়েছে, কোন রচনায়, কেউই জানে না তা, কেউ তা নথিভুক্ত করে রাখে না। তবু বলি, ইচ্ছে, কাণ্ডজ্ঞান, অনুসন্ধানী দৃষ্টি আর নিষ্ঠা থাকলে যাকে সত্যি-সত্যি ব্যুৎপত্তি-অভিধান বলে, তা কি প্রস্তুত করা যেত না? হরিচরণ যা পেরেছেন, আজ সত্তর-আশি বছর পরেও কেন তা পারা যাবে না?

বয়স এবং

অমিয় দেব

বয়স

আর সামনে না তাকাতে পারাই কি বয়স? অথচ মানুষ তো সামনে তাকাতেই অভ্যস্ত। আজ হল না, কাল তো হতে পারে— এমন আশাই তার স্বভাব। পান্ডোরার ঝাঁপি থেকে যতই বদখদ বেরোক না কেন, তলায় তো আশার ঝলক থাকে। বয়স কি সেই আশার অন্তর্ধান? যতই ভুল করুক মানুষ তার কর্মের বিরাম নেই— এমন এক কথা তাঁর *ফাউস্ট* কাব্যের 'স্বর্গীয় প্রস্তাবনা'-য় ঈশ্বরকে দিয়ে প্রকারান্তরে মেফিস্টোকে বলিয়েছিলেন গ্যোয়টে, সেই মেফিস্টোকে, মানুষ-লাটাই হাতে পেয়ে যার প্রবর্তনা শুধু, ঐশ ছক উল্টে, মানুষী আত্মার অন্তিম দখল। সেই ছক যে উল্টোবার নয়, মেফিস্টো যে তার নিজের রিপুরই শিকার হবে, তা এ-কাব্যের ভরতবাক্য হতে পারে, কিন্তু তার সমুদয় সর্গ মানুষের ইহজাগতিক কৃৎকর্মেই ব্যাপৃত। বস্তুত, মেফিস্টো যখন ফাউস্টের সঙ্গে তার চুক্তিতে বলে সে ইহকালে তার দাস হবে বটে, কিন্তু পরকালে ফাউস্টকে তার, মানে মেফিস্টোর, দাস হতে হবে, তখন ফাউস্ট জানায় তার সব তৃষ্ণাই ইহলৌকিক, পরলোক নিয়ে সে আদৌ ভাবিত নয়।

বয়স, বলা বাহুল্য, এক ইহলৌকিক অভিজ্ঞতা। এর পরেই কি সেই প্রাচীন ভারতীয় চতুরাশ্রমের বানপ্রস্থ? আর তাতে প্রচ্ছন্ন থাকতে পারে এক দাবানল? অন্তত কোনো প্রত্যাবর্তন নেই বানপ্রস্থ থেকে। এই মুহূর্তের মধ্যবিত্ত কুলে অবশ্য এমন বানপ্রস্থ ঘটে মাঝে মাঝে একটু উল্টোচালে, ব্যোমযানে উড়ে গিয়ে পরবাসী পুত্রকন্যার সংসারে অতিথি হয়ে— নির্বেদ ছাড়া আর কোনো দাবানল যেখানে নেই। বয়স হয়েছিল কিনা জানি না আমাদের সেই অনেকদিনের বিদেশবাসী নিঃসন্তান বন্ধুর, স্ত্রীবিয়োগের পর যিনি বারবার দেশে এসে তাঁর স্থাবর-অস্থাবরের বিলিব্যবস্থা করে ফিরে গিয়ে কিছুদিন পরেই একা একা তাঁর চেয়ারে বসে ইহলোক ত্যাগ করলেন এবং কয়েকদিন তা কেউই জানল না। ইচ্ছামৃত্যু নয় নিশ্চয়ই! গোণাগুণতিতে অনেক এগোলেই যে বয়স হল তা নয়, পঁচানব্বুইতেও কেউ ছিয়ানব্বুই-জোড়া কর্ম ফাঁদতে পারেন। মহাত্মা গান্ধী তো একসময় ভেবেছিলেন একশো পঁচিশ বছর বাঁচবেন— সত্যাগ্রহের যে তাঁর শেষ নেই। দেশভাগের বেদনা বুকে নিয়ে আর একশো পঁচিশে নিঃসন্ধিগ্ন না থাকলেও, আটচল্লিশের জানুয়ারিতে তাঁর নিঃসংশয় ভবিষ্যৎ পুরোপুরি রচিত হয়ে ছিল। তাঁর বয়স হয়নি। নাথুরামের গুলিতে তা-ই আরো প্রমাণ হল। বয়স রবীন্দ্রনাথেরও হয়নি। তাঁর তথাকথিত শেষ কবিতা, আমরা জানি, মুখে মুখে রচিত হয়েছিল ৩০ জুলাই ১৯৪১-এর সকালবেলা, লিখে রাখছিলেন রানী চন্দ। সেদিনই তাঁর অপারেশন হবে জেনে তিনি কবিতাটা শুনতে চান এবং শুনে বলেন, একটু গোলমাল আছে, অপারেশনের পরে সুস্থ হয়ে সংশোধন করবেন। কবিতার কাছ থেকে তিনি আদৌ বিদায় নেননি।

স্ফিংসের সেই ধাঁধা যার সদুত্তর দিয়ে থেবাইকে তার কবলমুক্ত করেছিলেন ওইদিপউস—কোন সে প্রাণী যে সকালে চারপায়ে দুপুরে দুপায়ে ও সন্ধেয় তিনপায়ে হাঁটে—তাতে বার্ধক্যের লাঠির কথা আছে। কিন্তু সেই লাঠি শারীরিক সহায়। আর আমরা যে-বয়স নিয়ে কথা বলছি তা মনের স্থবিরতা। লাঠিধারী শরীরেও মন জেগে থাকতে পারে। আবার লাঠি ধারণ না করেও মন ঘুমিয়ে পড়তে পারে। হাতে লাঠি নেই, ত্বকে কুঞ্চন নেই, অথচ মনে হাজারো কুঞ্চন— এমন মানুষ আদৌ বিরল নয়। তার সম্বল বুঝি-বা স্মৃতি। তাও নিকট স্মৃতি তত নয় যত না দূর স্মৃতি। আবার এমন নয় যে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়িয়ে অনুপূর্ব অতীত ভেসে উঠছে। এই স্মৃতি এলোমেলো। কখনো পুকুর, কখনো দিঘি। ঝাঁপাঝাপির দৌড় বেশি, বা দৌড় কম। সাইকেল মানে চড়া নয়, পা ঢুকিয়ে প্যাডেল করা। আস্ত মফস্‌সল, তবে শহর। রাস্তায় বিজলিবাতি আছে, যদিও বাড়িতে লন্ঠন। ইত্যাদি ইত্যাদি নানা টুকরো জুড়ে এক কাঁথা। তা গায়ে দিয়ে কি সামনে শূন্যতা নিয়ে বসে থাকার নাম বয়স?

অথচ এই সেদিনও বলেছি, কাল কিছু করবার থাকলেই হল। নিজের সঙ্গে কোনো কড়ার, কোনো আরব্ধ কিন্তু অসমাপ্ত কর্ম সম্পাদন, এতদিন এখানে ওখানে যা পেয়েছি তার

প্রত্যর্পণের প্রস্তাবে আগ্রহ—আজ থেকে কালে এক উৎসরণ। কিন্তু তা না হয়ে যদি কাল আজেরই প্রেত হয়ে আসে, এক মড়া আজ, এবং তাই চলতে থাকে ক্রমাগত, একের পর এক মড়া আজ, কাল অন্তর্হিত, তাহলে? তাহলে যা দাঁড়ায় তা এক পিছনে মুখ রেখে হাঁটা, যেন, ওফেলিয়া বর্ণিত, হ্যামলেট ওফেলিয়ার মুখে চোখ রেখে 'গেট দী টু এ নানারি' বলতে বলতে ওফেলিয়ার ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হচ্ছে—তার চোখ পিছনে তার পা সামনে—নারকীয় প্রেতসদৃশ।

বয়স যদি মৃত্যু ঘটিয়ে তুলত তবে তো সব চুকেই যেত, তা নিয়ে এই বাগ্‌বিস্তারের প্রয়োজন হত না। কিন্তু বয়স যা করে তা না মেরেও মৃতের মতো বাঁচিয়ে রাখে। এক ভবিষ্যহীন বর্তমান যার শুধু ধুকপুকটাই আছে, কিন্তু তা থেকে কোনো সুখদুঃখ, ভালোমন্দ, অর্থ বা অর্থহীনতা উদ্‌গত হচ্ছে না। বিস্বাদ নয়, স্বাদহীন : তিক্ত নয়, কটু নয়, কষায় নয়, লবণাক্ত নয়, অম্ল নয়, নয় মধুর। দান্তের নরকে যারা বহির্দ্বারে ভিড় করছে, পাপ-অপাপ কোনোটাই করেনি, মাঝি কারণের নৌকোয় আকেরন পেরিয়ে ভিতরে ঢোকার যাদের অধিকার নেই, এই অবস্থা তাদের তুল্য। করুণ, অনুদ্ধারণীয়। 'বয়স' লেখা এক বিষণ্ণ গেট দিয়ে প্রবেশ, কিন্তু অন্তর্যাত্রা নিষেধ।

নাগরিকপঞ্জি

'বয়স' ব্যতিরেকেই কিনা জানি না, ১৯৫৬-র ভাষাভিত্তিক রাজ্য-পুনর্গঠন পরবর্তী দু-একটা প্রশ্নের সর্বদা সদুত্তর পাই না। এই মুহূর্তে একশো বছরের ভয়াবহতম বন্যায় কেরল বিধ্বস্ত। কেন বন্যা সেই প্রশ্ন এখন তুলছি না, যদিও কোনো এক সময় হয়তো তুলতে হবে। এখন কথা বলছি ত্রাণ নিয়ে। ত্রাণে কি কেবল মালয়ালিদেরই অধিকার, নাকি কেরলে বাসরত যে-অন্য ভাষাভাষী ভারতীয়েরাও সমান বন্যার্ত, তাদেরও? প্রশ্নটা অমানবিক, কিন্তু অসমে জাতীয় নাগরিকপঞ্জি নিয়ে যে-গোলোযোগ হচ্ছে তার পরিপ্রেক্ষিতে হয়তো তেমন অমানবিক নয়। নিরক্ষর বা অর্ধসাক্ষর মানুষকে নথিপত্র দেখাতে বলার মধ্যে একধরণের অবাস্তবতা আছে যা আমরা পূর্ণসাক্ষর বা তথাকথিত শিক্ষিত মানুষেরা হয়তো পুরো বুঝতে পারি না। তাছাড়া দেশভাগের মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতাও তো আমাদের অনেকেরই নেই। দলিল দস্তাবেজ ঘেঁটে বা বই পড়ে খানিক হয়তো অনুমান করতে পারি, কিন্তু কোন ভয়ে, কী আশঙ্কায় তার জমিজমা বা বাড়িঘর ছেড়ে মানুষ পালায় তা কি পুরো হৃদয়ংগম করতে পারি? বাস্তুত্যাগ কি লোভে ঘটে? অন্য দিকে, দণ্ডকারণ্যের টাঁড় মাটির উদ্বাস্তু পত্তনি ছেড়ে যখন মরিচঝাঁপিতে আসতে চায় মানুষ তখন কেন অমন হইহই করে ওঠি? বলতে থাকি, পিপীলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে। মানুষের অধিকার কথাটা শুধু নিশেনে টাঙিয়ে রাখার জন্য বুঝি!

'অনুপ্রবেশ' কথাটার মধ্যে একটু পাচার-পাচার গন্ধ আছে। আড়কাঠি মারফত যেমন চাবাগানে চাবাগানে একদা 'কুলি' আমদানি হয়েছিল, তেমন কিছু নয় তো! তাছাড়া, তা নিয়ে যে-ধর্মের রাজনীতির আভাস পাওয়া যাচ্ছে তাও বিভাজনমূলক। তা রদ না হলে কিন্তু সমূহ সর্বনাশ। অন্ধ হলেও তো প্রলয় বন্ধ থাকে না! উপরন্তু উচ্চতম আদালতের নির্দেশে যে-কাজ হচ্ছে তা নিয়ে আগে থেকেই রাজনৈতিক ভবিতব্য বেঁধে দেওয়া কি বিধিসম্মত?

এদেশে অনেক কিছুই আমরা করি উপর থেকে; যার সঙ্গে কথা বলছি তার স্তরে নামতে না পারলে ভুল হতেই পারে। আমি চাইলাম এই, তিনি দিলেন ওই; একটা কোঠায় ট্যাঁরা পড়ে গেল। এমনি কয়েকটা ট্যাঁরা পড়লেই তো হয়ে গেল, পঞ্জিতে তাঁর নাম উঠল না। বিপন্নের প্রতি চাই আরো সহানুভূতি; যেহেতু আমি সত্য খুঁজছি, মিথ্যা নয়, তাই চাই আরো কম কর্তৃত্বপরায়ণতা। আবার লক্ষকোটি মানুষের পঞ্জি তৈরি করছি, ভুল তো আমারও হতে পারে : প্রথম তালিকায় যাঁর নাম উঠল দ্বিতীয় তালিকায় তাঁর নাম বাদ পড়ে গেল, বা মা-বাবার নাম উঠল ছেলেমেয়ের নাম উঠল না। নাগরিক পঞ্জিকরণ তো বস্তুত লোকগণনারই কাজ; কোনো আদালত নয় যাতে অভিযুক্তকে প্রমাণ করতে হবে তিনি নির্দোষ, অর্থাৎ অ-নাগরিক নন।

কয়েক দশক জুড়েই যে-সমস্যা পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে তা শরণার্থী সমস্যা। পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকা থেকে শিশু ও নারীসহ কত নৌকোবোঝাই শরণার্থীই তো ইউরোপের তটে তটে এসে পৌঁচেছে (কারো কারো যে সলিলসমাধি হয়নি তাও নয়), আশ্রয় কোথাও পেয়েছে কোথাও পায়নি— এখন বুঝি-বা সকল দরজাতেই খিল তোলা হয়ে গেছে বা যাচ্ছে। আর এই মুহূর্তের সবচেয়ে আর্ত আমাদের একদা-প্রতিবেশী (তদানীন্তন আরাকানবাসী) রোহিঙ্গারা যাদের মেরে-ধরে নির্যাতন করে পালিয়ে আসতে বাধ্য করেছে মায়ানমার সেনাবাহিনী। মায়ানমারের রোহিঙ্গা-দ্বেষ আজকের নয়, ১৯৮২-র লোকগণনাতেই রোহিঙ্গাদের বাদ দিয়ে রাখা হয়েছিল। সাম্প্রতিক রোহিঙ্গা-নিধন রাষ্ট্রপুঞ্জের চোখে গণহত্যা হলেও মায়ানমার তা মানতে রাজি নয়। রোহিঙ্গাদের নাকি ফিরিয়ে নেবার ব্যবস্থা হচ্ছে। কিন্তু তারা, বিশেষ করে যারা বাংলাদেশের শরণার্থী-শিবিরে আছে, তারা মায়ানমার ফিরে যেতে রাজি নয়। কী ভবিষ্যৎ রোহিঙ্গাদের? কোনো মস্ত মরিচঝাঁপি কি আছে কোথাও যেখানে তারা নিজেদের পুনর্বাসিত করতে পারে, অপরের দয়ার উপর নয় আপন শ্রমের উপর নির্ভরশীল?

অসম নাগরিকপঞ্জিতে যাদের শেষ পর্যন্ত ঠাঁই হবে না, তাদের জন্যও কি কোনো মরিচঝাঁপি আছে? নাকি অনধিকারের অগৌরবে তারা প্রক্ষিপ্ত হয়ে থাকবে দান্তের ওই চির-অস্থায়ীদের মতো?

সমাজমাধ্যম ও আলোচনার গণতন্ত্র

অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়

গণতন্ত্রে আলোচনার গুরুত্ব আছে, এই কথাটা এতই পুরনো যে বললে মনে হয়, এ আর বলার কী আছে? কিন্তু অনেক পুরনো কথাই নতুন পরিস্থিতিতে নতুন করে বলতে হয়, তা নিয়ে ভাবতেও হয়। আর তখন, সেই নতুন পরিস্থিতির কল্যাণেই, পুরনো কথার নতুন মানে খুঁজে পাওয়া যায়। গণতান্ত্রিক আলোচনা কিংবা আলোচনার গণতন্ত্র— যে দিক থেকেই দেখি না কেন, গত কয়েক বছরে একটা নতুন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া বা সমাজমাধ্যমের কল্যাণে। আমাদের আলোচনা এবং তর্কবিতর্কের অস্বাভাবিক এবং অকল্পিতপূর্ব ব্যাপ্তি ঘটেছে, গভীরতা বেড়েছে কি না, সেটা অবশ্য অন্য প্রশ্ন, এবং সেই প্রশ্নটাই আমাদের এই আলোচনার প্রধান তাগিদ।

তার আগে একটা কথা পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। মিডিয়া শব্দটা এ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে বটে, বহুব্যবহারে আজ তা প্রতিষ্ঠিতও হয়েছে, এতটাই প্রতিষ্ঠিত যে, তাকে আর নড়ানো যাবে বলে মনে হয় না, কিন্তু একটা গোড়ার কথা খেয়াল রাখা ভাল— সমাজমাধ্যম নাগরিকদের সরাসরি পরস্পরের সঙ্গে কথা বলার যে সুযোগ করে দিয়েছে তাতে 'মাধ্যম'-এর পুরনো অর্থ এ ক্ষেত্রে আর খাটছে না। বস্তুত, মাধ্যম-নির্ভর সম্প্রচার বা কথোপকথনের যে ধারণা এত দিন ধরে চলে আসছে, প্রথমে পত্রপত্রিকা এবং পরে টেলিভিশন মারফত যার প্রসার ঘটেছে, ডিজিটাল সংবাদমাধ্যমেও সেই ধারা বজায় ছিল এবং আছে। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ার নানান পরিসরে আমরা যে ভাবে বিচরণ করছি, তাতে ওই পুরনো ধারণা আর কার্যকর নয়। সেখানেও মাধ্যম আছে ঠিকই, কিন্তু অন্য অর্থে— আমরা নিজেরাই বিভিন্ন ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর মধ্যে সেতু বন্ধনের কাজ করে চলি, আক্ষরিক অর্থেই 'বন্ধু'র মাধ্যমে বন্ধন তৈরি হয়, বন্ধন বিস্তৃত হয়।

সমাজমাধ্যমের এই বৈশিষ্ট্যের কথাটি মাথায় রেখেই আমরা গণতন্ত্র এবং মিডিয়ার পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণের চেষ্টা করতে পারি। এই বিশ্লেষণের জন্য যে ধারণাটিকে বিশেষ ভাবে ব্যবহার করতে চাই তার নাম ডেলিবারেটিভ ডেমোক্র্যাসি— আলোচনানির্ভর গণতন্ত্র। সমাজতাত্ত্বিক য়ুরগেন হাবেরমাস-এর 'পাবলিক স্ফিয়ার' বা জনপরিসর-এর ধারণা ও তত্ত্বকাঠামোকে কাজে লাগিয়ে এই আলোচনানির্ভর গণতন্ত্রের তাত্ত্বিকরা বহু মূল্যবান কাজ করেছেন। এখানে সেই সব কাজের মধ্যে থেকে একটি বিশেষ অংশকে বেছে নিতে চাই। গণতন্ত্রের সঙ্গে মিডিয়ার সম্পর্কই সেই অংশের প্রধান উপজীব্য। সমাজতাত্ত্বিক লিঙ্কন ডালবার্গ এই বিষয়ে দীর্ঘ দিন ধরে গবেষণা করে চলেছেন। হাবেরমাসকে তিনি যে ভাবে পড়েছেন, তার অনুসরণে বলতে পারি, জনপরিসরে গণতান্ত্রিক আলোচনা সার্থক হতে পারে, অর্থাৎ গণতন্ত্রের প্রসারে সহায়ক হতে পারে, যদি সেই আলোচনা হয় 'Open, Reasoned and Reflexive'— মুক্ত, যুক্তিসঙ্গত এবং আত্মবাচক। এই তিন শব্দে নিহিত আছে তিনটি শর্ত। গণতান্ত্রিকতার শর্ত।

সমাজমাধ্যমের পরিপ্রেক্ষিতে শর্ত তিনটিকে স্বতন্ত্র ভাবে লক্ষ করা দরকার, কারণ তারা প্রত্যেকে স্বতন্ত্র ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আবার, এই তিনটির পারস্পরিক সম্পর্কও খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কিছুটা জটিল বলেই তার গুরুত্ব আরও বেশি।

প্রথমত, আলোচনাকে মুক্ত হতে হবে। এই মুক্তির একাধিক মাত্রা। এক, আলোচনার পরিসরে সকলের জন্যই যেন দ্বার অবারিত থাকে। দুই, কেবল দ্বার অবারিত থাকলে চলবে না, সকলের কথা বলার সমান সুযোগ এবং অধিকার থাকা চাই। অর্থাৎ কেউ যেন তার সামাজিক বা অন্য ধরনের অবস্থানের কারণে বেশি বা কম গুরুত্ব না পায়। আমাদের মতো দেশে দ্বিতীয় মাত্রাটি একটু বেশি মাত্রায় প্রাসঙ্গিক, কারণ আমাদের সমাজ আজও কথা বলা এবং শোনার ক্ষেত্রে ভয়ানক রকমের অ-সমান এবং, আক্ষেপের কথা, আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত সমাজেও সেই উচ্চাবচতার প্রকোপ খুবই প্রবল— এ ব্যাপারে ভদ্রলোক-মুখী বাঙালি সমাজ আবার আরও এককাঠি বাড়া। শিক্ষা যে আমাদের সমাজে ঐক্যের হাতিয়ার না হয়ে অনেকাংশেই অনৈক্যের সহায় হয়ে থেকেছে, তার পিছনে

বাঙালি ভদ্রলোকের সাংস্কৃতিক আধিপত্য ও অভিমানের একটা বড় ভূমিকা আছে। এই কারণেই বিশেষ করে মনে রাখা দরকার যে, আলোচনার আগেই যদি আলোচকদের দরদাম ঠিক হয়ে যায়, তা হলে মুক্ত আলোচনা অসম্ভব।

তর্ক উঠতে পারে, একটা বাস্তবোচিত নিয়ন্ত্রণ না থাকতে তো মুক্ত পরিসরের নামে হট্টমেলার আসর বসবে, সেই নৈরাজ্যে যথার্থ আলোচনার অবকাশই থাকবে না। এখানেই উপরোক্ত দ্বিতীয় শর্তটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। যুক্তিসঙ্গতির শর্ত। আলোচনায় যিনি যোগ দিচ্ছেন তাঁকে যুক্তির দাবি মেনে চলতে হবে। নিজের কথা প্রতিষ্ঠায় এবং অন্যের কথা খণ্ডনে যুক্তির পথে থাকতে হবে। এই মৌলিক শর্ত না মানলে বলতে হবে, এই আলোচনা তাঁর জন্য নয়। অর্থাৎ মুক্ত গণতান্ত্রিক পরিসর যুক্তিনির্ভর আলোচনার জন্যই মুক্ত, কারণ যুক্তিনির্ভরতা গণতন্ত্রের অপরিহার্য ধর্ম। এবং এই ধর্ম যথাযথ ভাবে পালন করলে উচ্চাবচতার সমস্যারও মোকাবিলা করার একটা পরিষ্কার রাস্তা থাকবে। তার কারণ, যুক্তিই যদি কষ্টিপাথর হয়, তবে কে বড়, কে ছোট, কে পণ্ডিত, কে অপণ্ডিত, সেই সব প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়বে। এই নীতি কার্যকর করা আমাদের মতো সমাজে কঠিন, সে কথা আগেই বলেছি, কিন্তু নীতিটা স্পষ্ট থাকলে সেই কঠিন কাজে এগোনোর সুবিধে হয় বইকী, তখন কেউ 'আমি যা বলছি ঠিক বলছি' বলে কথা শুরু করলে বা অন্যদের দাবিয়ে দিলে তাঁকে বিনীত ভাবে বলা যায়— আজ্ঞে, মানতে পারব না, আপনি অত্যন্ত সম্মানিত, কিন্তু আপনি আর আপনার কথা এক নয়, আপনার কথার মূল্য তার যুক্তিতে, এবং যুক্তিতেই। আমাদের দেশে রকের আড্ডা থেকে টিভি চ্যানেলের বিতর্কসভা— সর্বত্র বহু মাতব্বরের অলজ্জ দাপট দেখে এই কথাটা অহরহ বলতে ইচ্ছে করে।

জানি, যুক্তির পক্ষে এই নিঃসংশয় সওয়ালে সংশয় জাগতে পারে, আপত্তি উঠতে পারে এই মর্মে যে, যুক্তিবাদকে ঈশ্বরের ভূমিকায় বসালে আর এক আধিপত্য তৈরি হয়, সেটা যথার্থ গণতন্ত্রের অনুকূল নয়। এই তর্কের পরিপ্রেক্ষিতটি নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ— যুক্তিবাদের নামে এক ধরনের চিন্তার আধিপত্য আরোপ করার তৎপরতা আমরা অনেক দেখেছি, এক কালে যেমন দেখেছি সমাজতন্ত্রের 'বৈজ্ঞানিক যুক্তি'র নামে 'প্রগতিবাদ'-এর দাপট, অন্য এক কালে তেমনই দেখেছি বা দেখে চলেছি বাজারতন্ত্রের 'অভ্রান্ত এবং অলঙ্ঘ্য' নিয়মের দোহাই দিয়ে 'উন্নয়ন'-এর আধিপত্য। এই একমাত্রিকতার অভিযান সম্পর্কে সচেতন থাকা, তাকে প্রতিরোধ করার জন্য প্রস্তুত থাকা অবশ্যই জরুরি। কিন্তু লক্ষ করলে দেখা যাবে, এদের কোনওটিই যুক্তির ধর্ম মেনে চলেনি, চলে না, যুক্তির নামে আসলে বিশ্বাসকেই চাপিয়ে দেয়। অন্য দিকে, যাঁরা এই চাপিয়ে দেওয়ার বিরোধিতা করতে গিয়ে যুক্তির মূল্যকেই অস্বীকার করেন, তাঁদের বিশ্বাসকে তাঁদের বিশ্বাস হিসেবে মর্যাদা দিতে পারি, কিন্তু তাঁরা যদি নিজের মতকে যুক্তি দিয়ে যাচাই করতে নারাজ থাকেন, তবে তাঁদের সঙ্গে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক মতবিনিময়ের কোনও রাস্তা খুঁজে পাওয়া যায় না।

এখানেই তৃতীয় শর্তটির বিশেষ গুরুত্ব। রিফ্লেক্সিভ-এর প্রতিশব্দ হিসেবে আমরা আত্মবাচক শব্দটিকে ব্যবহার করেছি, কারণ সেটাই প্রচলিত। তবে এখানে কেবল আত্মবাচকতার কথা বলা হচ্ছে না, আত্মবিশ্লেষণের কথাও জোর দিয়ে বলা হচ্ছে, বলা হচ্ছে নিজের মতকে বিশ্লেষণ করার কথা। যতটা তীব্র ও তীক্ষ্ণ ভাবে অন্যের মতকে, ভিন্ন মতকে, সর্বোপরি বিপরীত বা বিরুদ্ধ মতকে বিশ্লেষণ করি, নিজের মতকেও সেই একই কষ্টিপাথরে যাচাই করা দরকার, তবেই যথার্থ আলোচনানির্ভর গণতন্ত্র সচল এবং সতেজ থাকবে। কথাটা একেবারেই নতুন নয়, কিন্তু কথাটা অত্যন্ত জরুরি। এই শর্তটি পূর্ণ না হলে মুক্ত আলোচনা বা বিতর্কের শক্তি সীমিত থেকে যায়, সেই মুক্তি বড়জোর সহাবস্থানকে সম্ভব করতে পারে, যেখানে বিভিন্ন মত যে যার নিজের নিজের প্রকোষ্ঠে বিরাজ করে, সেইখানে সীমিত থেকেই যে যার নিজের কথা বলে, প্রকৃত আদানপ্রদানের মাধ্যমে এগোতে পারে না। এবং তার ফলে সেই আলোচনায় যুক্তির ভূমিকাও সীমিত থেকে যায়, কারণ বিভিন্ন মতের পারস্পরিক যাচাই না হলে যুক্তি সার্থক হয় না।

সমকালের সমাজমাধ্যমে আলোচনানির্ভর গণতন্ত্রের কতটা প্রসার ঘটছে, তার বিচার করতে চাইলে এই তিনটি শর্ত কত দূর মান্য হচ্ছে, সেটা একটা প্রধান মাপকাঠি হিসেবে গণ্য করতে হবে। এবং তা করতে গেলেই বড় রকমের প্রশ্ন উঠবে। আপাতদৃষ্টিতে সমাজমাধ্যম একটি মুক্ত পরিসর। কার্যত যে কেউ সেখানে হাজির হতে পারেন, যতক্ষণ খুশি সক্রিয় থাকতে পারেন, যা খুশি বলতে পারেন, যার সঙ্গে ইচ্ছে আলাপ করতে উদ্যোগী হতে পারেন। সেই উদ্যোগ সব সময় সফল না হতে পারে, ফেসবুকের মতো পরিসরে 'বন্ধুত্ব'-এর আবেদনে সাড়া না মিলতে পারে (যদিও টুইটারের ক্ষেত্রে কাউকে 'অনুসরণ' করতে কোনও বাধা নেই), কিন্তু তাতে আলোচনার পরিসরটিকে 'মুক্ত নয়' বলা চলবে না, কারণ যে কোনও ধরনের মুক্ত-পরিসরই ব্যক্তিস্বাধীনতাকে মান্য করে— আথেন্সের 'আগোরা'তেও কাউকে জোর করে আলোচনায় যোগ দিতে বাধ্য করা হত না, এমনকী সোক্রাতেসের দুর্নিবার আকর্ষণও তাঁর যুক্তিনিবিড় কথারই টান, তার অধিক কোনও জোর তিনিও খাটাতে পারতেন না।

কিন্তু তার পরেও সমাজমাধ্যমের মুক্তির দৌড় নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। সত্যিই কি অবারিত আলোচনার সুযোগ সেখানে

আছে? সমস্যাটা বাধার নয়, নিয়ন্ত্রণের নয়, আতিশয্যের। সোশ্যাল মিডিয়ায় অধিকাংশ কথোপকথনই (কথা, স্থিরচিত্র, অডিয়ো, ভিডিয়ো, সমস্ত প্রকরণের মাধ্যমে আদানপ্রদানকেই বৃহৎ অর্থে 'কথোপকথন' বলছি) কতকগুলো ছকের মধ্যে ঘোরাফেরা করে, তার বাইরে অন্য বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাইলে কেউ সরাসরি বাধা দেয় না, কিন্তু ছকবাঁধা বিষয়ের বিপুল প্রবাহে সেই ছক-ভাঙা কথোপকথনকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া সহজ হয় না। এক অর্থে সমাজমাধ্যমের অনিয়ন্ত্রিত চরিত্রটাই তার যথার্থ মুক্তির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কথাটা আপাতশ্রবণে স্ববিরোধী মনে হতে পারে, কিন্তু একটু ভাবলে তার যুক্তিটা বোঝা যায়। একটা বিরাট সভায় সবাইকে যদি প্রাণ খুলে যে কোনও বিষয়ে যার সঙ্গে খুশি কথা বলার স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তা হলে আলোচনার মুক্ত পরিসর নিশ্চয়ই থাকে, কিন্তু সমস্ত বিষয়ে আলোচনার পক্ষে সেই মুক্তি বাস্তবে কতটা কার্যকর হবে? তার মানে এই নয় যে, সমাজমাধ্যমে আলোচনার বিষয় নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। তেমন প্রস্তাব সরাসরি অ-গণতান্ত্রিক, এবং তা সমাজমাধ্যমের আত্মাকেই বিনাশ করবে। কিন্তু সহজ সমাধান নেই বলে সমস্যাটাকে অস্বীকার করা চলে না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন যুক্তিসঙ্গতি নিয়ে। এই ধর্মটি সমাজমাধ্যমের আলাপ আলোচনায় একাট দোলাচলের মধ্যে থাকে। বিভিন্ন বিষয়ে যখন কোনও প্রশ্ন তোলা হয়, তখন সচরাচর যুক্তি দিয়েই তোলা হয় সেটা। অন্তত যুক্তির একটা মোড়ক থাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। কিন্তু অনেক সময়েই দেখা যায়, সেই মোড়কটা দ্রুত খুলে পড়তে থাকে, পূর্বনির্ধারিত ধারণা বা বিশ্বাস আধিপত্য বিস্তার করে, অচিরেই যুক্তির বাঁধ ভেঙে প্রবল বেগে ঢুকে পড়ে তীব্র কথা-কাটাকাটির বেনোজল, প্রায়শই তাতে মিশে যায় বিদ্বেষের গরল। যথার্থ যুক্তিসঙ্গত আলোচনার দাবি মেটানো সহজ নয়, সে জন্য অনেকখানি আত্মসংযমের প্রয়োজন হয়, যে সংযম না থাকলে অন্যের কথা শোনা যায় না। সমাজমাধ্যমের পরিসরটি আত্মপ্রকাশকেই প্রশ্রয় দেয়, নিজেকে জাহির করার মানসিকতায় ক্রমাগত ইন্ধন জোগাতে থাকে। সেটা চরিত্রগত ভাবেই আত্মসংযমের প্রতিকূল।

এবং সেই কারণেই সমাজমাধ্যমের প্রচলিত প্রবণতার সঙ্গে তৃতীয় শর্তটির বড় রকমের বিরোধ আছে। সেই দুনিয়ায় আত্মবিশ্লেষণের প্রবণতা দুর্লভ বললে কম বলা হয়। নিজেকে, নিজের মতামত বা বিশ্বাসকে বাইরে থেকে, নিরপেক্ষ ভাবে দেখা, বিচার করা এবং যুক্তির নিরিখে সংশোধন করার মানসিকতা আমাদের সমাজে এমনিতেই সুলভ নয়। এখানে নিজের মত ভুল বা অসম্পূর্ণ বলে স্বীকার করাকে সাধারণত পরাজয় হিসেবেই দেখার রীতি। সমাজমাধ্যমে সেই রীতি আরও অনেক বেশি জোরদার হওয়াই প্রত্যাশিত, কারণ সেখানে 'পরাজয়' ঘটে হাটের মাঝে, বহুজনসমক্ষে, তাই তার 'লজ্জা' ও অ-সহনীয়। অতএব মতবিনিময়ের আসলে আত্মসংশোধনের প্রয়োজন যখন সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, তখনও সেটা মেনে নিতে পারি না আমরা, প্রাণপণ নিজের মতটাকেই আঁকড়ে ধরে চিৎকার করে চলি, কিংবা আহত অভিমানে চুপ করে যাই।

এই বাস্তব দুর্ভাগ্যজনক, দুঃখেরও বটে। কারণ ডিজিটাল দুনিয়া সত্যিকারের মুক্ত, যুক্তিসঙ্গত, আত্মবিশ্লেষণী আদানপ্রদানের এক অ-পূর্ব সুযোগ এনে দিয়েছে। সেই সুযোগ ঠিক ভাবে কাজে লাগাতে পারলে গণতান্ত্রিক জনপরিসরের, আক্ষরিক অর্থেই, আদিগন্ত প্রসার ঘটতে পারে। কী ভাবে তা সম্ভব করে তোলা যায়, সেটা গণতন্ত্রের অনুশীলনের একটা খুব বড় প্রশ্ন হওয়া দরকার। রাজনৈতিক দল সেই অনুশীলন করবে বলে ভরসা হয় না, কারণ তাদের লক্ষ্য মুক্ত আলোচনা নয়, যথাসম্ভব ভোট জোগাড় করা। এই লক্ষ্যটি অনিবার্য ভাবেই গণতান্ত্রিক আলোচনার পথ রোধ করে দাঁড়ায়, কারণ সেই আলোচনার পথটা খোলা, সে পথ যে কোনও দিকে যেতে পারে, তাতে নির্বাচনী সংহতি ব্যাহত হবে। বিভিন্ন গুরুতর প্রশ্নে আমাদের দেশে যে রাজনৈতিক বিতর্ক চলে, তার চরিত্র লক্ষ করলেই এই সত্য স্পষ্ট হয়ে যায়। অনেক সময়েই পরিষ্কার বোঝা যায়, একটি দল বা তার নায়কনায়িকারা যুক্তির পথে হাঁটলে যে অবস্থানে পৌঁছবেন, সে পথ থেকে নিজেদের নিবৃত্ত করে রাখছেন, পাছে ভোটের ক্ষতি হয়।

কিন্তু নাগরিক সমাজ? তার তো ভোটের দায় নেই। সেই সমাজ কেন গোষ্ঠীতন্ত্র ছেড়ে একটা সত্যিকারের মুক্ত আলোচনার অবকাশ তৈরি করতে পারে না? কিসের বাধা? রাজনীতির একটা প্রভাব তার উপরেও পড়ে নিশ্চয়ই। নাগরিক সমাজের সঙ্গে দলতন্ত্রের যে দূরত্ব গণতন্ত্রের স্বার্থে কাম্য বলে মনে করা হয়, সেটা ভারতের মতো দেশে সম্ভব নয়, তাই ওই প্রভাব থাকবেই। কিন্তু তার পাশাপাশি, বা তার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েই আর একটি প্রভাবও কাজ করে। সেটা নিছক অভ্যাসের। আমরা সমাজমাধ্যমে যে আচরণ করি, তার অনেকটাই আমাদের সমষ্টিগত অভ্যাসের ফল— সব্বাই করে বলে সব্বাই করে তাই।

সমষ্টিগত অভ্যাস ভাঙার কাজ অত্যন্ত কঠিন। ব্যক্তির পক্ষে স্বাভাবিক ভাবেই সেটা সম্ভবপর নয়। আবার সমষ্টিও নিজের অভ্যাস ভাঙতে পারবে, এটা মনে করা কঠিন— নিজের বাইরে বেরিয়ে সে কাজ করবে কী করে? কিন্তু তার মানে এই নয় যে, হাল ছেড়ে দিতে হবে। পথটা সম্ভবত খুঁজতে হবে সেই বহুচর্চিত মধ্যপন্থায়। ব্যক্তি এবং সমষ্টির মাঝখানে দাঁড়িয়ে। কিছু মানুষ সমবেত হয়ে সমষ্টিগত অভ্যাসের বাইরে দাঁড়াতে পারেন, আত্মকেন্দ্রিক অহঙ্কারের বশ না হয়ে আলোচনার একটা

শিল্পী : রবীন মণ্ডল

নতুন ধারা তৈরি করতে পারেন, যে আলোচনায় সকলেই সমান ভাবে যোগ দিতে পারেন, যে আলোচনা কেবল যুক্তির সার্বভৌমত্ব মানে, কোনও উচ্চাবচতার পরোয়া করে না, যে আলোচনায় প্রতিটি ব্যক্তি নিজের মতকে সেই আতসকাচের নীচে ফেলে বিচার করেন না যা তিনি অন্যের মত যাচাইয়েও প্রয়োগ করে থাকেন, এবং সেই আতসকাচ যুক্তি দিয়েই তৈরি। এমন উদ্যোগ একটা নয়, অনেক তৈরি করা যায় যদি, তা হলে হয়তো ক্রমশ সমষ্টির চিন্তায় ও আচরণেও তার একটা প্রভাব পড়বে। এবং তা যদি পড়ে, তখন কিন্তু সেই আচরণও দ্রুত পালটাতে পারে। সমষ্টিকে নাড়াতে সময় লাগে, কিন্তু এক বার নাড়াতে পারলে সে অনেক সময়েই দ্রুত সচল হয়ে ওঠে।

সমাজমাধ্যমের একটা মস্ত সুবিধে হল, সে যে কোনও ধরনের উদ্যোগকেই ধারণ করতে পারে। পাঁচ জন মানুষও যদি নিজেদের মতো করে একটা মুক্ত আলোচনার পরিসর তৈরি করেন, তাকে সে প্রত্যাখ্যান করবে না। পাঁচ থেকে পঁচিশ, পঁচিশ থেকে পাঁচ লক্ষে পৌঁছনো যাবে কি না, সেটা অনিশ্চিত। কিন্তু অনিশ্চিত কথাটার উল্টো পিঠে বাস করে আর একটি শব্দ, তার নাম সম্ভাবনা। সমাজমাধ্যমকে ব্যবহার করে গণতান্ত্রিক জনপরিসর নির্মাণের সম্ভাবনা, তার বিস্তারের সম্ভাবনা। যে সমাজে আমরা এখন বাস করি, তা এই সম্ভাবনা পূরণের খুব বেশি ভরসা দেয় না। কিন্তু সেই কারণেই রাজনীতির প্রয়োজন এত বেশি। যে রাজনীতি সমাজের বাস্তবকে বদলাতে চায় এবং সে জন্য নাগরিকদের সংগঠিত করে। সমাজমাধ্যম সেই সংগঠনের একটি প্রকরণ। ক্রমশ প্রকরণ হিসেবে তার গুরুত্ব বাড়ছে, বাড়বে।

কিন্তু একই সঙ্গে এ কথাও মনে রাখা দরকার যে, সমাজমাধ্যম কখনওই রাজনীতির বিকল্প হতে পারে না। আলোচনার রাজনীতি, আলোচনানির্ভর রাজনীতি কখনওই আলোচনাসর্বস্ব রাজনীতি হতে পারে না। এই কথাটা আপাতশ্রবণে খুব মামুলি বলে মনে হতে পারে, কিন্তু সমাজমাধ্যমের একটা নিজস্ব মোহ আছে— ছদ্ম-রাজনীতির মোহ। আমরা যদি ফেসবুক-টুইটার তোলপাড় করে ভাবি, রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করলাম, তবে বড় ভুল হবে, এবং আরও বড় ক্ষতি। সমাজমাধ্যমের সমকালীন গতিপ্রকৃতি সঙ্কেত দেয়, সেই আশঙ্কা বিলক্ষণ আছে। সুতরাং, শেষ পর্যন্ত, সমাজমাধ্যম হইতে সাবধান!

গান্ধী সত্যের সন্ধানে

সৌরীন ভট্টাচার্য

তাঁর গোটা জীবনটাকে গান্ধী একটা খোলা বই করে তোলার চেষ্টা করেছেন। গান্ধীর ক্ষেত্রে এ কথাটা শুধু কথার কথা নয়। তিনি বার বার বলেছেন তাঁর সব কথা ও লেখা যাচাই করতে গেলে তাঁর জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে তা করতে হবে।

এই কথার মানে ঠিকমতো করা যাবে কীভাবে। একটা সহজ উপায় হল কাজকে কথার সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া। তাতে গান্ধীর মতো মানুষেরা বলে উঠতেই পারেন, ওতে হবে না। কারণ, জীবনে আমি যা করেছি বা করার চেষ্টা করেছি তার সব যে আমি লিখে যেতে পেরেছি তা কে বলল। অনেকেই তা পারেন না। গান্ধী বোধহয় তা করতেও চাননি। কেননা লেখক হওয়া তাঁর জীবনের লক্ষ্য নয়, জীবনটাকে আরব্ধ লক্ষ্যের মতো গড়ে তোলাই জীবনের লক্ষ্য। লেখা যে-অর্থে রচনাকর্ম, গান্ধীর কাছে তাঁর জীবন সেই অর্থে অবশ্যই এক রচনাকর্ম। এবং তাঁর লেখার চেয়ে সেই জীবনের অগ্রাধিকার প্রাপ্য। গান্ধী লিখেছেন বিস্তর। লিখেছেন এবং বলেছেন। তাঁর লিখনশৈলীর খ্যাতিও যথেষ্ট। তাঁর ভাষার বাইবেল সদৃশ সরলতার প্রসিদ্ধি সুপ্রতিষ্ঠিত। তাও আমরা তাঁর ইংরেজি রচনাশৈলীর সঙ্গেই মাত্র পরিচিত। এ কথাও খেয়াল করা দরকার যে হিন্দ স্বরাজ এবং আত্মচরিতের মতো জরুরি বই মাতৃভাষা গুজরাতিতেই লেখা।

এসবই ঠিক কথা। কিন্তু তা সত্ত্বেও গান্ধীর বেলায় তাঁর জীবনের অগ্রাধিকারের দাবি অন্য অর্থে স্বীকার করে নিতে হবে। জীবনটাকে হাতের তালুতে নিয়ে মৃৎশিল্পীর মতো তিনি গড়ে তুলেছেন। যেন এ জীবন অন্য কারো জীবন। ঘটনাক্রমে জীবনটা হয়তো তাঁর নিজের। কিন্তু নিজের কিনা সেটা সত্যিই খুব বড়ো কথা নয়। মানুষের জীবন, আমাদেরই মতো এক মানুষের জীবন। তাকে দিয়ে কী কতটা করিয়ে নেওয়া যায় এই যেন তাঁর পরীক্ষা। মানতেই হবে অত্যন্ত বিপজ্জনক এ পরীক্ষা। কেননা কোনো জীবনই ঠিক একলার জীবন নয়। গান্ধী জীবন তো নয়ই। কত মানুষ জড়িয়ে সে জীবনে। কত মানুষের জীবন ছারখার হয়ে যাবার সম্ভাবনা ও বিপদ রয়েছে এ পরীক্ষায়। মনে হয় জানতেন কথাটা। তাই তাঁর পরীক্ষা যে তাঁরই, এরকম এক বোধ কাজ করত মনে হয় মনের মধ্যে। নিজের জীবনের পরীক্ষাটাকে অন্যের জন্যে কোনো সুভাষিতাবলি করে তুলতে চাননি তিনি। কারও কাছে তাঁর জীবন কোনো গাইডবুক বা ম্যানুয়াল নয়। শিক্ষণীয় উপদেশ পেতে চাইলে সেই গোড়ার কথায় ফিরে যেতে হবে। প্রত্যেকের জীবন যার যার নিজের মতো করে গড়ে নিতে হবে। এবং সে জীবনের সমস্ত দায়দায়িত্ব নিজেকেই নিতে হবে।

এক অর্থে স্বাধীনতার উপরে পরম আস্থা। আমাদের জীবনটা প্লাস্টিক আর্টের এক উপকরণ। একবার মাত্র, এই একবারের জন্যই এরকম এক উপকরণ আমাদের হাতে এসেছে। আমাদের শিল্পকর্ম এই এবারের মতো আমাদের রচনা করে যেতে হবে। কিন্তু ওই যে অন্যেরা জড়িয়ে থাকে। তার জন্য নৈতিকতার জবাবদিহি কী হবে, এ প্রশ্নের উত্তর আছে কিনা জানি না। গান্ধী নিজে এ প্রশ্নে কতটা বিব্রত ছিলেন তাও সরাসরি জানি না। গান্ধী গবেষকেরা তাঁদের নিবিড় সন্ধানে সে-কথা হয়তো আমাদের জানাবেন। যদিও এসব কথা জানা যায়, না ভেবে নিতে হয় নিজেদের মতো তাও জানি না। নৈতিকতার এই মাত্রায় ভাবতে গেলে বিষাদগ্রস্ত হওয়া একান্ত অনিবার্য। গান্ধীর মতো একটা জীবন, যেখানে সারাক্ষণ লোকের ভিড়, সেখানে বিষাদবিলাসের সময়ই-বা কোথায়। বিষাদভূমির উপযুক্ত নির্জনতার অবসর কে দেবে তাঁকে। নাকি শিল্পীকে কেউই কিছু সহজে তুলে দেয় না, শিল্পীকে সবই খুঁজে নিতে হয়। কাঠকুটো, ভাঙাচোরা জিনিস, ঝরাপাতা, সবই যেমন পড়ে থাকে এধার-ওধার, শিল্পী শুধু তাকিয়ে দেখেন আর সংগ্রহ করেন নিজের কাজে লাগাবেন বলে। এও তাই। বিষাদেরও যদি প্রয়োজন পড়ে তবে তাও তাঁকেই খুঁজে নিতে হবে। একটা ছবি আছে, কস্তুরবার মৃত্যুর পরে। গান্ধী বসে আছেন চেয়ারে, একলা। পিছন থেকে নেওয়া ছবিটা। মনে হয় নিজের বাঁ-হাতের 'পরে মাথাটা নোয়ানো। কস্তুরবার জীবনটাও কি তখন একবারের জন্য তুলে ধরেছিলেন নিজের হাতের তালুতে। জানি না।

গান্ধীর সত্যের দিকে যাত্রা আসলে আত্মোপলব্ধির দিকে যাওয়া। নিজেকে খুঁজে পাওয়া। আমরা নানাভাবে আমাদের চারপাশে এত কিছুর চাপে আচ্ছন্ন থাকি যে বেকসুর নিজেকে হারিয়ে ফেলি আমরা। অহরহ ঘটে এ জিনিস। ঘটে যে তাও তেমন খেয়াল হয় না। গান্ধীর এই পথ খোঁজা সহজ হয়নি মোটেই। দ্বিধা দ্বন্দ্বের দোটানায় ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন। ধর্মের সঙ্গে জোড়াতালির জন্য বহু ধিক্কার বর্ষিত হয়েছে তাঁর মাথার উপরে। সে সমস্যা আজও মেটেনি। কিন্তু ধর্মও সহজে ধরা দেয়নি তাঁর কাছে। তা দেবার কথাও নয়।

ওঁদের পারিবারিক বিশ্বাস ছিল বৈষ্ণব ধর্মে। হাভেলিতে যাবার চল ছিল ওঁদের। কিন্তু তা গান্ধীর ভালো লাগত না। জাঁকজমক পছন্দ হত না। তা ছাড়া নানারকম অনৈতিক কাজকর্মের গল্প চালু ছিল। যা হয় আর কি! কোনো টান তৈরি হয়নি গান্ধীর মনে তখন। গান্ধীর স্কুলজীবনে অন্য অনেক কিছু পড়ানো হত, কিন্তু কোনো ধর্মশিক্ষা হয়নি।

বরঞ্চ গান্ধীকে ছোটোবেলায় দেখাশোনা করতেন যে মহিলা, রম্ভা, তাঁর কাছে অনেক কিছু পেয়েছিলেন। ভূতের ভয়ের থেকে ত্রাণ পেতে তিনি শিখিয়েছিলেন রামনাম করতে। পোরবন্দরে থাকার সময়ে বাবার সামনে যে রামায়ণ পাঠ হত তা গান্ধীর মনে গভীর ছাপ ফেলেছিল। এইভাবে আস্তে আস্তে রামায়ণ, তুলসীদাসের রামায়ণ, ওঁর ভিতরে জায়গা করে নিয়েছিল।

এর পরে রাজকোটে গিয়ে শোনা হল ভাগবত। প্রথমে যার কাছে ভাগবত পাঠ শুনেছিলেন তার পড়া ভালো লাগেনি। কিন্তু ভাগবতে যে ধর্মীয় আবেগ তৈরি হতে পারে সেই বোধ মনে এসেছিল। ভাগবত নিজে নিজে যেটুকু পড়েছিলেন তা গুজরাতিতেই পড়েছিলেন। কিন্তু বড়ো বদল এল পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের পাঠ শুনে। মূল সংস্কৃতে। সে অনেক পরে। গান্ধীর একুশ দিনের অনশনের সময়ে। তখন আক্ষেপ হচ্ছে এসব ভালো বই আরো আগে কেন তাঁর শোনা হল না। ছোটো বয়সে ভালো জিনিস শুনলে মনের মধ্যে তার ছাপ পড়ে।

রাজকোটে বিভিন্ন ধর্মের ব্যাপারে একরকমের সহনশীলতার শিক্ষা তাঁর হয়েছিল। বাবা মা হাভেলি ছাড়াও শিবমন্দির, রামমন্দির এসব জায়গাতে যেতেন। তাঁদের অনেক মুসলমান ও পার্সি বন্ধুও ছিলেন। ফলে এইভাবে ধর্মের নানা ধারার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল ক্রমে ক্রমে। এইরকম সময়ে মনে বিরূপতা এসেছিল শুধু খ্রিস্টধর্মের ব্যাপারে। খ্রিস্টান মিশনারিরা স্কুলের ধারে দাঁড়িয়ে হিন্দুধর্মের নামে, এই ধর্মের দেব-দেবীদের নামে, খারাপ কথা বলতেন। সেটা গান্ধীর ভালো লাগত না। তা ছাড়াও চেনা এক হিন্দু খ্রিস্টান হয়ে সাহেবি পোশাক পরে তাঁর আগের ধর্মের নামে অকথা-কুকথা বলতেন। এর কোনো কিছুই গান্ধীর পছন্দ হয়নি।

গান্ধী নিজের আত্মচরিতে বেশ বিশ্লেষণাত্মকভাবে লিখেছেন যে ওইরকম সময়ে, যখন একটা সহনশীলতা আসছে মনের মধ্যে, তখনও কিন্তু ঈশ্বর বিষয়ে ঠিক কোনো বিশ্বাস কোনো অর্থে পোক্ত হয়নি ওঁর মনে। এইরকম সময়ে বাবার সংগ্রহ থেকে মনুস্মৃতি আসে ওঁর হাতে। সৃষ্টিতত্ত্ব ইত্যাদি অংশ গান্ধীর ভালো লাগেনি। এবং এক ধরনের প্রতিক্রিয়ায় তিনি খানিকটা নিরীশ্বর চিন্তার দিকে ঝুঁকেছিলেন। নানারকম সন্দেহের দোলায় যখন দুলছেন তখন ওঁর এক তুতো ভাই বলে যে বয়স হলে এসব সন্দেহের নিরসন নিজেই সে করতে পারবে। মনুস্মৃতির খাওয়া-দাওয়া সংক্রান্ত বিধিনিষেধও মনে ধরেনি। এবং মনুস্মৃতি থেকে তিনি অহিংসার কিছুই পাননি।

কিন্তু এই কাছাকাছি সময়ে নিজের চিন্তায় এ কথাটা ধরা পড়ে যে নৈতিকতা সব জিনিসের মূল ভিত্তি। আর সত্যই হল নৈতিকতার সার বস্তু। এইরকম সময় থেকে সত্যের ধারা ওঁর মনের মধ্যে দানা বাঁধতে থাকল। দিনে দিনে সে সত্যের সংজ্ঞাও মনের মধ্যে বিস্তার লাভ করল। সত্য আর শুধু মিথ্যার বিপরীতের কোনো ধারণা নয়। সত্য নৈতিক জীবনের সারাৎসার। ক্রমে ক্রমে এই সত্যের সাধনাই হয়ে উঠবে তাঁর সারা জীবনের মূল সন্ধান। নিজের জীবনটাকেও তো এর জন্যে গড়ে তুলতে হবে এক নৈতিক আদলে। নিজের অন্তরাত্মাকে এতটাই স্পর্শবহ করে তুলতে হবে যে অতি মৃদু কম্পনও যেন সেখানে ধরা পড়ে। সত্যের সামান্য বিচ্যুতিও যে ঘটল এ কথাটা সময়ে টের না পেলে বিচ্যুতির প্রতিকারের সম্ভাবনাও থাকে না। সত্য এবং তার আনুষঙ্গিক ধারণাগুলি একেবারে শাণিত করে তুলতে হয়। হাওয়ার সামান্যতম হেরফের তা যেন ভিন্ন ভিন্ন সুরে বাজে।

ব্যারিস্টার গান্ধী বিলেত থেকে ফিরে বম্বে বন্দরে নামছেন। জুন মাসের আরব সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ তোলপাড় করছে বাইরে আর গান্ধীর ভিতরে চলছে অস্থিরচিত্ত অনিশ্চয়ের দোলাচল। আইন ব্যবসায়ে তাঁর কোনো ভবিষ্যৎ আছে কিনা সে বিষয়ে তখন তিনি কোনো ধারণাই করে উঠতে পারছেন না। আইনের পাঠ নিয়েছেন কিন্তু বাস্তবে নেমে কীভাবে কী করবেন তার কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না। তা ছাড়া ভারতীয় আইন শেখা হয়নি। হিন্দু ও মুসলমান আইনের কিছু জানেন না। ফলে গান্ধী এইসময়ে নিজেকে নিতান্ত আতান্তরে পড়েছেন বলে ভাবছেন। স্যার ফিরোজশাহ মেহতার তখন দারুণ নামডাক। তবে ওসব দূরের নক্ষত্র। দাদাভাই নওরোজিও তখন বিলেতে। কেউ কেউ পরামর্শ দিচ্ছে তাঁর সঙ্গে দেখা করে সাহায্য চাইতে। তা আবার হয় নাকি। অত বড়ো মানুষকে এইরকম ব্যক্তিগত ব্যাপারে

বিরক্ত করা যায় নাকি। যদিও যেখানে দাদাভাইয়ের বক্তৃতা থাকে সেখানে শুনতে যান আর মুগ্ধ হন। ঘরের এক কোণে বসে বক্তৃতা শুনে চলে আসেন। নিজের সমস্যার কোনো সুরাহা হয় না। শেষে কারও একজনের পরামর্শে দেখা করেন ফ্রেডেরিক পিনকাট বলে এক ইংরেজ ভদ্রলোকের সঙ্গে। ভারতীয় ছাত্রদের প্রতি তিনি খুব স্নেহপ্রবণ। এই পিনকাট গান্ধীকে খুব উৎসাহ দেন। বলেন সবাইকে ফিরোজশাহ মেহতার মতো হওয়ার দরকার পড়ে না। তিনি মোদ্দা কথা যা বললেন তা এই, গান্ধীর সাধারণ পড়াশোনাটা একটু কম, সে দিকটা খানিক ঠিক করে নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। কিছু বইপত্রের কথাও গান্ধীকে তিনি বলে দিলেন। যাই হোক পেশার ব্যাপারে এইরকম এক অবস্থায় গান্ধী দেশে ফিরলেন।

দাদার মারফত আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা হল ড. মেহতা ও তাঁর দাদা ও পরিবারের সঙ্গে। এই ড. মেহতার সঙ্গে বিলেতেই পরিচয় হয়েছিল। এখন সে পরিচয় আরো অন্তরঙ্গ হল। এখানে এমন একজন নতুন মানুষের সঙ্গে দেখা হল গান্ধীর যাঁর প্রভাব তাঁর জীবনে অসামান্য। তিনি রায়চাঁদভাই। ভালো নাম রাজচন্দ্র। কবি। ইনি ড. মেহতার দাদার জামাতা। রত্নালংকারের ব্যাবসা এঁর পেশা। গান্ধীর সঙ্গে যখন আলাপ হচ্ছে তখন এঁর বয়স পঁচিশের মতো। প্রথম আলাপে এঁর চরিত্রগুণ ও জ্ঞানগম্যিতে গান্ধী মুগ্ধ। এরকম প্রথম মুগ্ধতা অনেক ক্ষেত্রে দ্রুত কেটে যায়। এক্ষেত্রে মোটেই তা হয়নি। ভদ্রলোকের একটা গুণ ইনি শ্রুতিধর। একবার শুনেই সবকিছু মনে রাখতে পারেন। গান্ধী ইউরোপীয় ভাষার যত শব্দ জানতেন গড়গড় করে তার এক লম্বা তালিকা বলে গেলেন। ভদ্রলোককে সেই শব্দগুলো আবার বলে যেতে হবে। তিনি তৎক্ষণাৎ যে অনুক্রমে গান্ধী শব্দগুলো বলেছিলেন সেই ক্রমানুসারে সেগুলোকে আউড়ে গেলেন। এইসব দেখে-শুনে গান্ধী অবাক হলেন কিন্তু এ ব্যাপারে তার বেশি কিছু না।

যে-জায়গায় এই রায়চাঁদভাই গান্ধীকে জিতে নিলেন তা অন্যত্র। এঁর চরিত্রের সে দিকটা গান্ধী জেনেছেন পরে আস্তে আস্তে। ভদ্রলোকের অসামান্য শাস্ত্রজ্ঞান, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র আর আত্মোপলব্ধির তীব্র আকাঙ্ক্ষা, এই গুণগুলো গান্ধীকে পেয়ে বসল। গান্ধী আস্তে আস্তে দেখতে পেলেন এই মানুষটি তাঁর জীবনকে উৎসর্গই করেছেন এই নিজেকে জানার বা উপলব্ধি করার দায়ে। মুক্তানন্দের কবিতার এই কয়েকটি পঙ্‌ক্তি ওঁর হৃদয়ে চিরকালের জন্য উৎকীর্ণ হয়ে আছে—

আমার দিনের প্রতিটি কাজে যখন দেখি তাঁকে
নিজেকে আমি ধন্য বলে মানি;
তখন জানি উনিই আমার অলক্ষ্য সেই সুতো
যে সুতোয় জড়িয়ে থাকে মুক্তার এই জীবন।

রায়চাঁদভাইয়ের এই ভক্তজীবন তাঁর কেজো ব্যাবসার জীবনে কোনো অন্তরায় হয়নি কখনো। মণিরত্নের সমঝদার হিসেবে তাঁর রীতিমতো খ্যাতি ছিল। অজস্র ব্যস্ততার মধ্যে কাটে তাঁর সারাটা দিন। সবসময় সঙ্গে রাখেন, কাজের টেবিলেও, কোনো-না-কোনো ধর্মগ্রন্থ আর একটা ডায়েরি। তাঁর ওই ব্যস্ত ব্যাবসার কাজে তিনি মগ্ন থাকেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর জীবনটা ওখানে নেই। কাজের শেষে হাতে তুলে নেন ওই বই আর লেখার ডায়েরি। বস্তুত তাঁর সব প্রকাশিত লেখাই ওই ডায়েরির পাতা থেকে উঠে আসে।

জীবনে এমন হয় না তা তো নয়। আমাদের দৈনন্দিনের বাজারেই দেখেছি এমন মানুষ। সামান্য সবজি নিয়ে বসেন, একটা ঝাঁকায় করে। কুমড়ো, কাঁচালঙ্কা, ওল, এইরকম টুকিটাকি। চেহারাটা প্রসন্ন। সঙ্গে থাকে একজন, ভাইপো বা ভাগনে। আর থাকে বেশ কিছু বই আর একটা খাতা। খদ্দের এলে জিনিস ওজন করেন। ফাঁক পেলেই সেই ভাইপো বা ভাগনে বই থেকে পড়ে শোনায়, মাঝে মাঝে নোট লেখে খাতায়। জিজ্ঞাসা করেছিলাম একদিন, কী বই পড়েন। চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্য চরিতামৃত, এই জাতীয় বই। ওল কুমড়োর সঙ্গে মেশাতে পারলে, রত্নালংকারের সঙ্গেই-বা মেশানো যাবে না কেন। রায়চাঁদভাই তাই মিশিয়েছিলেন। গান্ধীকে খুব টেনেছিলেন তিনি।

রায়চাঁদভাইয়ের যে-দিকটা গান্ধীকে খুব আকর্ষণ করেছিল তা হল ওঁর শান্ত চিত্তের প্রসন্নতা। মানুষটি যেন তাঁর নিজের জগতেই একান্ত আপন মনে বসবাস করতেন। সংসারের অন্য সব কিছুতেই তিনি আছেন, আবার নেইও। আমরা সত্যি এমন মানুষ কেউ কখনো দেখি না তা নয়। সবসময়ে আমরা হয়তো তাঁদের সেভাবে ঠিক চিনে নিতে পারি না। তিনি আমাদের পাশেই আছেন। আবার তিনি তাঁর নিজের মধ্যেই আছেন, আমরা সেখানে থেকেও নেই। পাঁচ জনের সঙ্গে থাকা আর একা হওয়া, যুগপৎ চলতে থাকে এই খেলা। এটা পারার মধ্যে একরকমের অনাসক্তি হয়তো আছে। গান্ধীর কাছে খুব চমকপ্রদ লাগছে এই ব্যাপারটা যে রায়চাঁদভাই অত মেতে থাকছেন যেন ব্যাবসার কাজে, আবার মুহূর্তের মধ্যে তুলে নিচ্ছেন তাঁর বই, তাঁর খাতাকলম। থাকা না-থাকার যৌগপত্যের এই রহস্য থেকে তিনি একথা পেয়েছিলেন যে আসলে রায়চাঁদভাই সবসময়েই তাঁর ঐশী সত্তায় বিলীন হয়ে আছেন। তাঁর ব্যাবসার কাজে যখন তিনি মন দেন তখনও তাঁর সে ঐশী সত্তার বিলোপ ঘটে না, তাই ব্যাবসার গায়েও লাগতে পারে অন্য আলোর স্পর্শ। এমনি করে সংসারী আমাদের সব কাজেই নানা আলোর রং ফুটে উঠতে পারে।

গান্ধী তখন পুরো ব্রিফলেস ব্যারিস্টার, যখনই কথা হত,

রায়চাঁদভাই ওঁকে নিবিড় ধর্ম প্রসঙ্গে আলোচনায় ভরিয়ে তুলতেন। কোনো কেজো সম্পর্কের ধুলোবালি তখন লাগেনি ওঁদের আলোচনায়। এদিকে গান্ধীর নিজের মনে তখন ধর্ম বিষয়ে নিজের থেকে খুব তেমন কোনো টানটোন তৈরি হয়নি। তাও রায়চাঁদভাইয়ের কথাবার্তায় তিনি অন্য কোনো স্বাদ গন্ধ পাচ্ছেন। গান্ধী অকপটে বলছেন যে, এর পরে অন্য অনেক ধর্মগুরুর সাক্ষাৎ তিনি পেয়েছেন। নানা বিশ্বাসের নানা মানুষের শিক্ষার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছে এর পরে। কিন্তু ঠিক এমন কোনো মানুষকে আর তিনি পাননি। এই মানুষটির কথাগুলো কেমন সরাসরি পৌঁছে যেত তাঁর মধ্যে। তাঁর বুদ্ধির দীপ্তি, আবার একইসঙ্গে তাঁর নৈতিক তীব্রতা তাঁকে একেবারে ভিতর দিকে ছুঁয়ে যেত। কেমন যেন অন্তরের মধ্যে এই বোধ আপনি এসে যেত যে এই একজনকে সবটুকু নিঃশেষে বিশ্বাস করা যায়। যেকোনো নৈতিক সংকটে তিনি হতে পারেন পরম আশ্রয়।

এই পর্যন্ত এসেও গান্ধী কিন্তু ভেসে যাচ্ছেন না। রায়চাঁদভাই হয়তো তাঁর পরম আশ্রয়, কিন্তু তাঁকে গুরুর আসনে বসাতে পারছেন না। তাহলে গুরুর জন্যে গান্ধীর মনে আরো বড়ো কোনো আসন পাতা। সে আসন তাঁর শূন্যই রইল তখনকার মতো।

কী চাইছেন গান্ধী এখন। বলা শক্ত। যে-ধারণায় মনে করা হয় গুরু সন্নিধানে ছাড়া জ্ঞান নেই সে ধারণার বশবর্তী হয়ে এক ধরনের উপনিষণ্ণ হওয়ার কথা ওঁর মাথায় হয়তো থাকছে এমন হতে পারে। একটা কথা বলছেন পরিষ্কার করে। গুরুকে হতে হবে পূর্ণ জ্ঞানী। পূর্ণতা শুধু সন্ধানের ব্যাপার, তা হয়তো চিরকালই অপ্রাপ্য। তার দিকে কেবল এগোনো যায়, পাওয়া যায় না। এই অসম্পূর্ণতার বোধই হতে পারে এক চলমান শক্তি। আর যাবার পথে পথে যদি সেই বোধের ক্রমবিস্তারের সম্ভাবনা আমরা মেনে নিই তাহলে আমাদের হাতে থাকবে কেবল চলা। তবে কি তাই আমাদের ধর্ম।

গান্ধী এই রায়চাঁদভাইকে তাঁর জীবনের তিন জন আধুনিক মানুষের সঙ্গে এক সারিতে বসাচ্ছেন। অন্য দুজন তাঁকে প্রভাবিত করেছেন তাঁদের বইয়ের মাধ্যমে আর এই রায়চাঁদভাই সরাসরি ব্যক্তিগত সংযোগে। অন্য দুজনের একজন তলস্তয়, তাঁর বই দ্য কিংডম অব্ গড ইজ উইদিন ইউ, আর একজন রাসকিন, তাঁর বই আনটু দিস লাস্ট।

শিল্পী : সুরজিৎ সরকার

কেমন চলছে রাজ্যের তেলেভাজা শিল্প?

অর্ধেন্দু সেন

টাটা বিড়লা হবার সংগতি নেই অথচ কিছু একটা করার ইচ্ছা আছে, প্রয়োজন আছে, রাজ্যের এমন মানুষকে মুখ্যমন্ত্রী বছর দুয়েক আগে উপদেশ দিয়েছিলেন ছোটো করে শুরু করতে। বলেছিলেন তেলেভাজা অথবা মিষ্টির দোকান দিয়েও গাড়ি বাড়ি করা যায়। হাসিঠাট্টা হয়েছিল বটে, কথাটি কিন্তু খাঁটি। বাংলা আজকে যা ভাবে গোটা দেশ কালকে ভাববে সে কথা। এই আপ্তবাক্য আবার প্রমাণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। দেশের বেকারদের তিনি বলেছেন পকোড়া ভাজার কথা। বাংলায় বড়ো শিল্প হবে না সে-কথা মুখ্যমন্ত্রী আগেই বুঝেছেন। কিন্তু ঘটা করে মেক ইন ইন্ডিয়া করেও যে কিছু হবে না বুঝতে প্রধানমন্ত্রীর সময় লেগেছে। তা লাগুক। এই দুই নেতা নেত্রী যে অন্তত একটি বিষয়ে একমত হয়েছেন সে আমাদের সৌভাগ্য।

মানুষ কি সাড়া দিয়েছে এই ডাকে? মুখ্যমন্ত্রীর মনের কথা প্রকাশ্যে আসার পরে ভেবেছিলাম কর্পোরেশন লাইসেন্স ফি-তে একটা বড়ো ছাড়ের ঘোষণা করবে। সস্তায় দোকানঘর তৈরি করে দেবে। প্রতি মাসে ক-টা নতুন দোকান হল ফলাও করে বলা হবে। কয়েক জন করে লাইসেন্সিদের ডেকে নেওয়া হবে একুশে জুলাইয়ের মঞ্চে। কিছুই যখন হল না তখন মনে হল যে উল্লেখযোগ্য সাড়া পাওয়া যায়নি। কিন্তু খবর নিয়ে দেখলাম রাজ্যে তেলেভাজা আর মিষ্টির ব্যাবসা বেড়ে চলেছে। হাওড়া কলকাতায় প্রতি বছর মিষ্টির দোকানের লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে কয়েক হাজার আর তেলেভাজার দোকান তো লাইসেন্স ছাড়াও হচ্ছে। তবে সমস্যা যে নেই তাও নয়।

দুই ব্যাবসাই কি লাভজনক? মিষ্টির দোকান বলতে যদি ভাবি গাঙ্গুরাম বা বাঞ্ছারামের কথা, তেলেভাজা বলতে বুঝি কালিকা অথবা বাগবাজারের পটলাবাবুর দোকান তাহলে তো নিশ্চয়ই লাভজনক। কিন্তু এঁরা ব্যাবসা করছেন বহু যুগ ধরে, কেউ একশো বছরের উপর। নতুন যারা আসবে তারাও কি লাভের মুখ দেখবে? খুব বেহিসাবি না হলে কিন্তু লাভ হবারই কথা। মিষ্টি অনেক রকমের তাই মিষ্টির দোকানের অর্থশাস্ত্র জটিল। সে তুলনায় তেলেভাজার অঙ্ক সহজ।

তেলেভাজার ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর হল বেগুনি, আলুচপ আর ফুলুরি। পরে কিছু দেবতা জন্ম নিয়েছেন— মোচার চপ, ক্যাপসিকামের চপ, পেঁয়াজি ইত্যাদি। তাদের হিসেবের বাইরে রাখলেও চলবে। আলুর চপ আর বেগুনির দাম কলকাতায় পাঁচ টাকা বা ছ-টাকা। ফুটপাথে কিনলেও তাই, দোকানে কিনলেও। একটা বেগুনির সঙ্গে দু-টাকায় পঞ্চাশ গ্রাম মুড়ি নিন, কাঁচা লঙ্কা ফ্রি। হয়ে গেল আপনার বিকেলের জলখাবার। প্রশ্ন হল বেগুনি আলুচপ বানাতে খরচ কত? গিন্নিকে ডেকে বলতে হবে না দশটা করে ভেজে আনতে। আমি কলকাতার এক অভিজাত ক্লাবের শেফের কাছে খোঁজ নিয়েছি যার ছেলে আমেরিকায় ডাক্তার, মেয়ে কানাডায় ম্যানেজমেন্ট পড়ছে। তিনি খরচ বেশি করতে পারেন, কম করবেন না।

প্যাট্রিক গোমসের হিসেবে আলু, বেগুন, তেল, ব্যাসন, নুন, মশলা এবং গ্যাসের খরচ মিলিয়ে তিন-সাড়ে তিন টাকা। একেবারে ছোটো ব্যবসায়ী যারা, তারা বসবে ফুটপাথের এক ধারে। কড়াইয়ে দেখবেন গোটা ছয়েক বেগুনি ফুটছে। তারা ঘণ্টা চারেক বসে হয়তো একশো পিস বিক্রি করবে। ব্যাবসা বাড়াও না কেন জিজ্ঞাসা করলে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকবে। প্রশ্নটাই ঠিকমতো বুঝতে পারবে না। যদি দেখেন বসেছে ফুটপাথ জুড়ে, গনগনে আগুন, বড়ো কড়াইয়ে বিশটা চপ একসঙ্গে, তাহলে বুঝবেন সে দিনে হাজারটা বিক্রি করতে পারে। রবীন্দ্রসদন থেকে হাজরা পর্যন্ত হাঁটলে এমন অনেক ছেলেকে পাওয়া যায়। বৌমাটি দেখবেন পাশে বসে তেলেভাজা ঠোঙায় পুরছে। পয়সা নিচ্ছে, খুচরো ফেরত দিচ্ছে। মাসে কুড়ি দিন বসলে মন্দ লাভ হয় না। চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার। যাদের পাকা দোকানঘর আছে তাদের আরও বেশি।

তেলেভাজার ইতিহাস আমরা কতটুকু জানি? হুতোমের নকশায় ফুলুরি আর বেগুন ভাজার কথা আছে। 'তেলেভাজা' কথাটা সম্ভবত প্রথম আসে তার কিছুদিন পরে ফার্মা কেএলএম প্রকাশিত 'সচিত্র গুলজার নগর'-এ। বাবু 'ওল্ড টম' নিয়ে বসলেন, ভৃত্যকে বললেন তেলেভাজা নিয়ে আসতে। তাই মনে হয় তেলেভাজার দোকানগুলো শুরু হয়েছে ১৮৫০ বা ১৮৬০-এর দশকে। পুরোনো যে দোকানগুলো এখনও রয়েছে তাদের

জন্ম ১৯২০ নাগাদ। এদের মধ্যে সবচেয়ে নামকরা হল সাহুদের ‘নেতাজির চপের দোকান’। নেতাজি কলেজে পড়ার সময়ে এই দোকানে আসতেন। তাঁর জন্মদিনে এখনও বহু মানুষকে বিনা পয়সায় তেলেভাজা খাওয়ানো হয়। বাগবাজারের বিখ্যাত দোকানগুলোও এই সময়কার। শুনেছি শ্রীরামকৃষ্ণদেব বরানগরের একটি দোকানের তেলেভাজা পছন্দ করতেন। সেই দোকানটিও হবে ১৮৬০ বা ১৮৭০-এর দশকের। বিবেকানন্দ তেলেভাজা খেতেন বলে শুনিনি তবে শিমুলিয়ার বাড়ির চত্বরে ছিল চাচার দোকান। ফাউল কাটলেট নিশ্চয়ই খেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তো ভোজনরসিক ছিলেনই। যে খাবার ভালো লাগত তার ‘রেসিপি’ জোগাড় করতেন। জোড়াসাঁকোয় তাই নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা হত। এমনকী মেনুকার্ডও ছিল তাঁর সংগ্রহে। বিভিন্ন দেশ থেকে আনা সেই মেনু অনুযায়ী আজও খাবার তৈরি হয় কলকাতার একটি রেস্তরাঁয়। সে নাহয় হল। কিন্তু ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া সাহুর দোকানে গেছিলেন কোনোদিন আলুচপ খেতে? সেরকম কোনো উল্লেখ কোথাও দেখি না। বাংলা সাহিত্য এক নতুন দিশা পেতে পারত।

বলা বাহুল্য যে আলু না থাকলে আলুর চপ থাকত না। একই কথা বলা যায় শিঙাড়ার সম্বন্ধে। আলু আমাদের দেশে এনেছে পর্তুগিজরা, চারশো বছর আগে। বাংলায় আলু এসেছে অনেক পরে ইংরেজের কল্যাণে। ইংরেজের সাহায্য পাবার জন্য পর্তুগিজ বণিকেরা ওয়ারেন হেস্টিংসকে আলু খাইয়েছিলেন। ভালোই লেগেছিল নিশ্চয়ই। ১৮৩০-এর দশকে কোম্পানি বাহাদুর আলুর চাষে উৎসাহ দেন, উৎপাদন বাড়তে থাকে। বাঙালি নাকি শিঙাড়া খাচ্ছে ১৭৫০ থেকে। কলকাতায় হয়তো নয়, ঢাকা মুর্শিদাবাদে। তবে সে ছিল মাংসের শিঙাড়া, আমাদের দেশে এসেছে মধ্যপ্রাচ্য থেকে। শিঙাড়ার বৈষ্ণবীকরণ হয়েছে উনিশ শতকের মাঝামাঝি। আলুর শিঙাড়া আর আলুর চপ সমসাময়িক। বেগুনভাজা বিদ্যা ব্যালনের যতই প্রিয় হোক, বাঙালির বেগুনে আপত্তি ছিল। তাই নাম হয়েছিল বেগুন মানে গুণহীন। প্রাচীনকালে অবশ্য বার্তাকু ছিল কিন্তু আজকের বেগুন এসেছে ইউরোপীয়দের সঙ্গে।

মিষ্টির দোকান শুরু হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। ১৮২৬-এ ভীম নাগ। পরে নকুড়, নবীন চন্দ্র দাস, গাঙ্গুরাম। তিনশো বছর লেগেছে ‘মণ্ডা’-র ‘মিঠাই’ হয়ে উঠতে। ১৮৫০ নাগাদ এই ব্যাবসা সুপ্রতিষ্ঠিত তাই জন্ম হল লেডিকেনির। ভাববার বিষয় যে শিঙাড়া বিক্রি হতে লাগল মিষ্টির দোকানে কিন্তু তেলেভাজা বাইরে থাকল। কেন? শিঙাড়া এসেছে রাজারাজড়ার হাত ধরে। তেলেভাজাকে জনপ্রিয় করেছে শ্রমিক-শ্রেণি বিশেষ করে ভিন রাজ্য থেকে আসা শ্রমিক। তাই বুঝি তেলেভাজা জাতে উঠতে পারেনি?

ফিরে আসা যাক একবিংশ শতাব্দীতে । মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন তেলেভাজা বিক্রি করে বাড়ি করা যায়। আমরা দেখেছি উপার্জন ভালোই হয়। তবে ভাগীদার অনেক। আইনরক্ষক আছেন। পাড়ার দাদারা আছেন। বাড়িটা শেষপর্যন্ত কে তুলবে আগাম বলা মুশকিল। এই নিয়ে ক্ষোভ কম নয়। ফুটপাথের যেকোনো ব্যাবসাকে উৎসাহ দিতে হলে তোলাবাজদের কন্ট্রোল করতে হবে। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তেলেভাজার মুখ্যমন্ত্রী তোলাবাজেরও মুখ্যমন্ত্রী। লাইন টানা হবে কোথায়?

শুনে অবাক হইনি যে বাংলার কলেজে ৪০ পার সেন্ট সিট খালি থাকছে। মান্ধাতার আমলের না হলেও ম্যাকলের সময়কার ফিজিক্স কেমিস্ট্রি পলিটিক্স হিসট্রি আর কেউ পড়তে চাইছে না। শিক্ষার সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক থাকবে তো। মাথা খাটাতে হবে। নতুন সাবজেক্টের কথা ভাবতে হবে। তোলানমিক্স পড়ালে কেমন হয়? কার কাছে কত তোলা নেওয়া হবে? বেশি নেওয়া হলে ব্যাবসার ক্ষতি। কম নেওয়া হলে তোলাবাজের ক্ষতি। অপ্টিমাম রেট কী?

একই সমস্যা সিন্ডিকেটে। বেশি লাভ করতে গেলে মধ্যবিত্ত চটবে। তাতে দিদির ক্ষতি। অবশ্য বামপন্থীদের যা অবস্থা তাতে ক্ষতির পরিমাণ সীমিত হবার সম্ভাবনা। বাংলার শিশুরা আজ মায়েদের বলছে আমরা বড়ো হয়ে অটোরিকশা চালাব। এতে প্যাসেঞ্জার তোলা আর পয়সা তোলা— দুই বিদ্যার সংযোগ। অটোর রুট কে ঠিক করবে? একটা অটো ক-জন যাত্রী নেবে কত ভাড়া নেবে? খুচরো রাখার দায়িত্ব কার? এই বিষয়ে কোর্স চালু করুন দেখবেন সব সিট ভর্তি।

একের পর এক ব্রিজ ভেঙে পড়ছে। মুখ্যমন্ত্রী ভাবছেন ব্রিজে ওঠার মুখে একটা করে নীল-সাদা বোর্ড লাগিয়ে দেবেন—

বাম আমলের ব্রিজ / নিজ দায়িত্বে উঠিবেন

তাতে মুখ্যমন্ত্রীর সাংবিধানিক দায়িত্ব মিটবে কিন্তু বেচারা পথিক সে কী করবে? এটা সমস্যার স্থায়ী সমাধান হতে পারে না। সমাধান কোন পথে আসবে তা পাঠিকার বুঝতে বাকি নেই। তোলাবাজিকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপন করতে পারলে ব্রিজগুলোর ফাউন্ডেশন আপনিই শক্তপোক্ত হবে।

বেশ কিছুদিন হল রাজ্যে শিল্পপতিদের সমাগম হচ্ছে। আম্বানির মতো কর্ণধার মুখ্যমন্ত্রীর পাশে বসতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছেন। কিন্তু কেমন যেন মনে হচ্ছে এঁরা লক্ষকোটি টাকা বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দেন বটে বাস্তবে এক কানাকড়িও পাওয়া যায় না। তা ছাড়া বড়ো শিল্প মানেই দশ চাকার ট্রাক। সে তো আর মানুষ চাইছে না। তাই মুখ্যমন্ত্রী ঠিক করলেন ক্ষুদ্র শিল্পের সমাবেশ করবেন। কিন্তু কই সেই সমাবেশে তেলেভাজাকে তো দেখলাম না? বেগুনির কথা মুখ্যমন্ত্রীর মনে ছিল না? কবিগুরু চেয়েছিলেন সাহিত্যের ঐকতান সংগীত সভায়, একতারা যাহাদের তারাও সম্মান যেন পায়। বাণিজ্যিক সভায় তা বোধহয় হবার নয়। প্রয়োজনও নেই। তবে ছোটোদের সমস্যা ছোটো করে দেখা উচিত হবে না। এই শিল্পও যদি না চলে, লোকে বলবে কী!

জেহাদ: শান্তি-হিংসা-সন্ত্রাসবাদ ও আজকের দুনিয়া

মিলন দত্ত

জেহাদ এখন শিক্ষিত মধ্যবিত্তের কথাবার্তায় হামেশা এসে পড়ছে। সে আলোচনায় জেহাদকে (অবশ্যই অমুসলমানরা) সাধারণভাবে বেপরোয়া, অযৌক্তিক এবং সর্বাত্মক যুদ্ধ হিসেবে দেখা হয়। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, জেহাদ বলতেই অ্যাসল্ট রাইফেলধারী জঙ্গিদের ছবি ফুটে ওঠে। সহজ করে বললে জেহাদের দুটো প্রকার আমরা পাই, সশস্ত্র জেহাদ আর আধ্যাত্মিক জেহাদ। জেহাদ কিন্তু এতটাই সরল কোনো বিষয় নয়, বরং তা অত্যন্ত জটিল এবং বিতর্কিত। জেহাদ ব্যাখ্যা করে হাজার হাজার বই লেখা হয়েছে। তার পরেও জেহাদ নিয়ে হাজারো প্রশ্ন— জেহাদ কি কাফেরদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের ধর্মযুদ্ধের শরিয়তি নিদান, তা কি শুধুই যুদ্ধ আর হিংসা সংক্রান্ত, ইসলামি সন্ত্রাসবাদীদের গণসংহারের হাতিয়ার, আল্লার পথে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে নিজেকে নিয়োজিত করা না কি রিপু কামনা ও অন্যায় করার ইচ্ছা থেকে বিরত থেকে সৎ ও খোদা-বিশ্বাসী জীবনযাপন করার লড়াই? এ নিয়ে বহু দিন ধরে বিস্তর আলোচনা হয়েছে, হচ্ছে। কিন্তু জট ছাড়েনি। প্রশ্ন থেকে গেছে অমীমাংসিত। তাহলে ইসলামের বহুচর্চিত এই কৃত্যটিকে আমরা কীভাবে দেখব?

বাংলায় 'জেহাদ' সাধারণভাবে বিদ্রোহ বা প্রতিবাদ অর্থে বহুল প্রচলিত। বাঙালি কথায় কথায় যে জেহাদ ঘোষণা করে তা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য। শব্দটা ব্যবহারের সময় কারও সম্ভবত মনেই থাকে না যে জেহাদ আসলে মুসলমানদের অবশ্য পালনীয় একটি ধর্মীয় বিধান। জেহাদ বাঙালির প্রাত্যহিক ব্যবহারে ঢোকার সময় তার গা থেকে ধর্মগন্ধ এবং ধর্ম পরিচয়টা মুছে সে তার সুবিধামতো একটা অর্থ গড়ে নিয়েছে। বাংলা ভাষায় জেহাদের সর্বাত্মক সেকুলার প্রয়োগ থাকা সত্ত্বেও প্রচলিত এই অর্থটি কিন্তু অভিধানে নেই। সংসদ বাংলা অভিধানে 'জেহাদ'-কে বলা হয়েছে 'বিধর্মীদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের ধর্মযুদ্ধ'। বঙ্গীয় শব্দকোষে রয়েছে 'জেহেদ (আ. জেহাদ) মুসলমানদিগের ধর্মার্থ যুদ্ধ'। এমনকী ঢাকা বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধানেও 'জেহাদ' অর্থে 'ধর্মযুদ্ধ'-কে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। জেহাদকে 'ধর্মযুদ্ধ' বা 'পবিত্র যুদ্ধ' বলতে নারাজ মুসলমানদের একাংশ। তাঁরা বলেন, এটা পশ্চিমিদের তৈরি করা ব্যাখ্যা। জেহাদের সঙ্গে হিংসাকে জুড়ে তার একটা ভয়াবহ ছবি তৈরি করেছে।

আরবি জেহাদ শব্দটি এসেছে 'জুহ্‌দ' থেকে। অর্থ হল আপ্রাণ চেষ্টা, সংগ্রাম। বাংলাদেশ ইসলামি ফাউন্ডেশনের 'ইসলামি শব্দকোষ' গ্রন্থে জিহাদের অর্থ করা হয়েছে, 'চেষ্টা, পরিশ্রম, অধ্যবসায়, ধর্মযুদ্ধ'। ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য ধনপ্রাণ দিয়ে সব রকমের সংগ্রাম বা যুদ্ধই জেহাদ। যারা জেহাদ করে বা জেহাদে অংশ নেয় তাদের বলা হয় 'মুজাহিদ'। তারা কাফেরদের ধর্মান্তরিত করার মধ্যে দিয়ে ইসলামকে প্রসারিত করবে। কাফের আর পৌত্তলিকদের ধ্বংস করে ইসলামের বিস্তার ঘটাবে। বিধর্মী (কাফের), অবিশ্বাসী (মুনাফেক) এবং পৌত্তলিক (মুসরিক)-দের ইসলামে ধর্মান্তরিত করার জন্য যারা জিহাদে অংশ নেবে তাদের জন্য কোরানের (সুরা আনফাল ৮:৩৮) নির্দেশ, 'তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে যতক্ষণ না ফিতনা (অনিষ্ট, ক্ষতি) দূর হয় এবং আল্লাহ্‌র ধর্ম সামগ্রিক রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।' কোরান বা হাদিস জেহাদ ছাড়া মুসলমানের জন্য অন্য কোনো যুদ্ধ অনুমোদন করেনি। জেহাদ কোনো ব্যক্তিকে ধর্মান্তরিত করার বিষয় নয়। জেহাদ কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কৃত্যও নয়, তা করবে কেবলমাত্র একটি মুসলিম রাষ্ট্র বা মুসলমান শাসক। মুসলমানদের মধ্যে একটা বিশ্বাস রয়েছে, বিশ্বজুড়ে 'দারুল হরব' (অমুসলিম শাসিত বিধায় শত্রুর দেশ)-কে সম্পূর্ণ পরাভূত করে 'দারুল ইসলাম' (মুসলিম শাসিত রাষ্ট্র) কায়েম না হওয়া পর্যন্ত জেহাদ চলবে। মক্কা জয় করে কোরেশদের ধর্মান্তরিত করার পরে মুহাম্মদ বলেছিলেন, '(মক্কা) বিজয়ের পর আর হিজরত নেই, বরং রয়েছে জেহাদ আর নিয়ত (সংকল্প)। যদি তোমাদের জেহাদের ডাক দেওয়া হয়, তাহলে সেই ডাকে সাড়া দিয়ে বেরিয়ে পড়' (সহি বুখারি। হাদিস ৯৫০)।

কোরানে এবং হাদিসেও বলা হয়েছে, জেহাদ করতে গিয়ে শহিদ হলে সে সরাসরি জান্নাতে যাবে। কিয়ামতের দিন পর্যন্ত

তাকে কবরের নীচে অপেক্ষা করতে হবে না। জেহাদে মৃত্যু হলে তাদের 'গাজি' উপাধিতে ভূষিত করা হত। আবু হুরাইয়া নামে এক সাহাবি নবির কাছে জানতে চান, 'মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম কে?' নবি রসুল বলেছিলেন, 'যে মুমিন তার জান মাল নিয়ে আল্লাহর পথে জেহাদ করে' (সহি বুখারি শরিফ। হাদিস ৯৪৬)। পরেই ৯৮৭ সংখ্যক হাদিসে নবি বলেছেন, 'আল্লাহ তাঁর পথে জেহাদকারীর ব্যাপারে এ দায়িত্ব নিয়েছেন যে, সে মৃত্যুবরণ করলে তাকে বেহেস্ত দান করা হবে অথবা গাজি বানিয়ে নিরাপদে পুরস্কারসহ ফিরিয়ে আনা হবে।' দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবন সংলগ্ন অনেক গ্রামে বহু মানুষের পদবি গাজি। বাংলায় ইসলাম প্রতিষ্ঠায় তাঁদের ভূমিকার জন্যই সম্ভবত গাজি পদবি পেয়েছিলেন তাঁরা। ক্রমে গাজির ধর্মযোদ্ধা পরিচয় বিলুপ্ত হয়ে সে হয়ে ওঠে সুন্দরবনের সবচেয়ে বড়ো বিপদ বাঘের দমনকারী, বীর। সুন্দরবনে কিংবদন্তির নায়ক বড়খাঁ গাজি বা জেন্দাগাজি আজও হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে পূজিত। বাদা অঞ্চলে লৌকিক দেব-দেবীর মূর্তির পাশে ঠাঁই করে নিয়েছে গাজিরা।

কোরান এবং হাদিসে শহিদদের গুণকীর্তন এবং জান্নাতে তাদের অগ্রাধিকার থেকেই জিহাদের সঙ্গে সশস্ত্র যুদ্ধের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে অনেকের ধারণা। সুরা ফতেহার একটি আয়াতে (৪৮:১৭) আছে, 'অন্ধ, খঞ্জ ও রুগ্‌ণদের জন্য কোনো অপরাধ নেই (যদি তাঁরা জেহাদে অংশ না নেন); আর যে-কেউ আল্লাহ ও তার রসুলের আনুগত্য করবে আল্লাহ্‌ তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার নীচে নদী বইবে। কিন্তু যে-লোক পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে তিনি তাকে শাস্তি দেবেন।' কোরানে (সুরা তওবা ৯:২০) আছে, 'আল্লাহর কাছে তাদের সবচেয়ে বড়ো মর্যাদা আর তারা তো সফলকাম যারা বিশ্বাস করে, হিজরত করে ও ধনপ্রাণ দিয়ে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে।' আরো আছে (সুরা তওবা ৯:৪১), 'অভিযানে বের হয়ে পড়ো যুদ্ধসামগ্রী নিয়ে, (তা) হালকা হোক বা ভারী হোক, আর তোমরা ধনপ্রাণ দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করো। এ-ই তোমাদের জন্য মঙ্গল, যদি তোমরা বুঝতে পার।' জেহাদে যারা অংশ নিল তাদের যেমন পার্থিব এবং পারলৌকিক পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তেমনই জেহাদে যাদের অনীহা তাদের জন্য ভয়ানক সব পরিণতির কথাও বলা হয়েছে কোরানে। আল্লাহর পথে যুদ্ধ বলতে ঠিক কী বোঝায় তারও ব্যাখ্যা দিয়েছেন নবি: 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কলেমা ঊর্ধ্বে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করল, সে-ই আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করল' (সহি বুখারি। হাদিস ৯৬৭)।

হাদিসেও জেহাদকে সর্বোচ্চ স্থানে বসানো হয়েছে। হজরত মুহাম্মদ বলেছেন, 'এমন কোনো আমল (কর্তব্য, অনুশীলন) আমি পাই না যা জেহাদের সমতুল্য হতে পারে' (সহি বুখারি। হাদিস ৯৪৫)। নবি বলেছেন, 'আল্লার রাস্তায় মুজাহিদদের জন্য আল্লাহ জান্নাতে একশোটি স্তর প্রস্তুত রেখেছেন' (সহি বুখারি। হাদিস ৯৫২)। জেহাদে যারা অংশ গ্রহণ করবে তাদের জন্য পার্থিব লাভের প্রতিশ্রুতি রয়েছে কোরানে (সুরা ফতেহা ৪৮:১৯-২০): 'যুদ্ধে (তারা) লাভ করবে বিপুল সম্পদ।' এবং 'আল্লাহ তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তোমরা যুদ্ধে লভ্য বিপুল সম্পদের অধিকারী হবে।' যুদ্ধ করে যে সম্পদ অর্জিত হয় ইসলামে তাকে বলা হয়েছে মাল-এ-গনিমত অর্থাৎ গনিমতের মাল। মুহাম্মদের সময় থেকেই, যুদ্ধের শেষে সেই যুদ্ধার্জিত সম্পদ মুজাহিদদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার রীতি ছিল। গনিমতের মাল কীভাবে ভাগ হবে তারও বিধান রয়েছে কোরানে (সরা আনফাল ৮:৪১)। দরিদ্র আরবদের কাছে জেহাদের অংশ নেওয়ার জন্য গনিমতের মালও ছিল অন্যতম বড়ো কারণ। নবি তাঁর সহনাগরিকদের সে ব্যাপারে সাবধানও করেছেন। হাদিস গ্রন্থে (সহি বুখারি শরিফ। হাদিস ৯৫২) তার উল্লেখ আছে।

আল্লাহ্‌র রসুল নবি মুহাম্মদ নিজেই ছিলেন মুজাহিদ। মক্কা থেকে হিজরতের পর আমৃত্যু যুদ্ধ তাঁর পিছু ছাড়েনি। ওই সময়ের মধ্যে নবি স্বয়ং সাতাশটি যুদ্ধে অংশ নেন। বলাই বাহুল্য, ওই যুদ্ধগুলোতে তিনি প্রধান সেনাপতির ভূমিকা পালন করেন। আরব জাতিকে ধর্মীয় ও রাজনৈতিকভাবে ইসলামের অধীনে আনার জন্য জিহাদে যোগ দেওয়ার ডাক দিয়েছিলেন নবি। পরবর্তীকালে বিভিন্ন খলিফা, অটোমান সুলতানেরা এবং অন্যান্য প্রভাবশালী সামন্ত মুসলমান শাসকরা আগ্রাসনের হাতিয়ার হিসেবে জেহাদকে ব্যবহার করেছেন। গণ বিক্ষোভ দমনের জন্যও জেহাদকে ব্যবহার করেছেন মুসলিম শাসকরা। ইদানীংকালের জিহাদি সংগঠনের কোনো কোনো সদস্যের স্বীকারোক্তি থেকে জানা গেছে, তারা সরাসরি জান্নাতে পৌঁছোনোর লোভে জিহাদি হয়েছেন। বিশেষত যারা গায়ে বিস্ফোরক বেঁধে 'মানব বোমা' হয়ে গণ-সংহারের আয়োজন করে তারা আত্মঘাতী হামলা চালায় স্রেফ সরাসরি জান্নাতে পৌঁছোনোর লোভে।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর নিউ ইয়র্কে টুইন টাওয়ার ধ্বংসের পর থেকে গোটা বিশ্বজুড়ে কত জেহাদি গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে তার হিসেব রাখা প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। আফগানিস্থান থেকে সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার করার পরে ১৯৮৯ সালে আবদুল্লা জামান আর ওসামা বিন লাদেন আল-কায়দা নামে ইসলামি জঙ্গি সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেন। বিন লাদেনকে অবশ্য ২০১১ সালে পাকিস্তানে খুঁজে বের করে মার্কিনবাহিনী হত্যা করে। তার আগে আফগানিস্তানে পাকিস্তান সীমান্ত এলাকায় তালিবান প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এখনও বিভিন্ন দেশে যে জিহাদি গোষ্ঠীগুলো সক্রিয় তারা হল আল-কায়দা, ইসলামিক স্টেট ইন ইরাক অ্যান্ড লেভান্ত (আইএসআইএল) যারা 'আইএস' নামে অধিক পরিচিত, নাইজিরিয়ার ভয়াবহ জেহাদি গোষ্ঠী বোকো

হারাম, সোমালিয়ার আল-সাবাব, লিবিয়া এবং তিউনিশিয়ার আনসার আল-সারিয়া, ইন্দোনেশিয়ার জেম্মাহ ইসলামিয়া, ফিলিপিন্সের আবু সাইয়াফ আর মিশরের আনসার বাইয়াত আল-মাকদিস। এছাড়াও আছে পাকিস্তানের হরকত-উল-মুজাহিদিন, বাংলাদেশের জামাত-উল-মুজাহিদিন এবং আনসারুল ইসলাম। ২০১০ সালের পরে এদের কোনো কোনো সংগঠন আল-কায়দা বা আইএসের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছে। আন্তর্জাতিকভাবে সক্রিয় রাষ্ট্রবহির্ভূত বা নন-স্টেট সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে এখনও পর্যন্ত আইএস এবং আল-কায়দা সবচেয়ে প্রভাবশালী। ইউরোপ আমেরিকা সমেত বিশ্বের বহু দেশ থেকে ওই দুটি সংগঠনে যোগ দেওয়ার জন্য শিক্ষিত মুসলিম তরুণরা মাতৃভূমি ত্যাগ করেছে। তাদের একটাই উদ্দেশ্য: বিশ্বজুড়ে ইসলাম কায়েম করার লক্ষ্যে জেহাদে অংশ নেওয়া। কেরল থেকে অন্তত একুশ জন তরুণ সিরিয়া এবং ইরাকে গিয়ে আইএস-এ যোগ দিয়েছে। তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম জনসংখ্যার ভারতে এই সংখ্যাটা নেহাতই কম। বাংলাদেশ বা মালদ্বীপ থেকে আরো অনেক বেশি সংখ্যায় সেনা পেয়েছে জেহাদিরা। এই বাড়বাড়ন্তের পেছনে ধর্মপ্রাণ সাধারণ মুসলমানের একাংশের প্রকাশ্য এবং প্রচ্ছন্ন সমর্থনও রয়েছে। তবে মুসলিম সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের আস্থা নেই এই খুনখারাপির জেহাদে। তারপরেও জেহাদ নিয়ে সুফি এবং উদার মুসলমানদের আত্মশুদ্ধির তত্ত্ব বিশেষ ঠাঁই করে নিতে পারেনি।

মুহাম্মদের মৃত্যুর পরে ইসলামের বিস্তারের সময় জিহাদের ভয়ানক অপব্যবহার দেখে উদার ধর্মতাত্ত্বিক এবং মূলত সুফি পণ্ডিতেরা নবম এবং দশম শতকে জিহাদের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেন। তাঁরা বলেন, আল্লাহকে জানার সঠিক পথের অন্বেষণে ব্যক্তির আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টাই জেহাদ। তাঁরা পাঁচ প্রকার জিহাদের কথা বলেন:

১. হৃদয়ের বা আত্মার জেহাদ: মনের ভিতরের দুষ্টকে পর্যুদস্ত করতে অন্তরের সংগ্রাম তৌহিদের মাধ্যমে।

২. বাচনিক জেহাদ: সমাজের শত্রু এবং শয়তানদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম খুতবা ইত্যাদির মাধ্যমে।

৩. কলম ও জ্ঞানের জেহাদ: অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে ইজতিহাদ বা মুক্তবুদ্ধি ও স্বাধীন বিচারবুদ্ধির মাধ্যমে ইসলামি জ্ঞানের চর্চা।

৪. হাতের জেহাদ: নিজের কাজ বা অর্জিত সম্পদের সাহায্যে অশুভের বিরুদ্ধে লড়াই। যেমন হজযাত্রা, বয়স্ক বাবা-মার যত্ন বা ইসলামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ।

৫. তলোয়ারের জেহাদ: জিহাদের এই কোরান স্বীকৃত পথটি বহুল প্রচলিত, ব্যবহৃত এবং প্রচারিত। অস্ত্র নিয়ে আল্লার পথে যুদ্ধ করা।

বলাই বাহুল্য, সুফি ঘরানার তাত্ত্বিকেরা এবং উদারপন্থী আধুনিক মুসলমানেরা বলেন, ধর্মবিদ এবং আইনজ্ঞরা জেহাদকে যুদ্ধ বলে ব্যাখ্যা করলেও তার বুৎপত্তিগত অর্থ 'সংগ্রাম' তো কখনো মুছে যাবার নয়। তাঁদের মতে, কোরান এবং হাদিস একটু মন দিয়ে পড়লেই বোঝা যাবে কেবল হিংসা আর যুদ্ধের বাইরেও বিস্তারিত হয়েছে জেহাদের অর্থ। সুফিরা মনে করে জেহাদ আসলে ব্যক্তির অন্তরের সঙ্গে যুদ্ধ। নিজের ভিতরকার রিপু এবং আত্মার দূষণ প্রতিহত করার লড়াই। দেহ হল একটা নগর, আত্মা তার শাসক আর তাকে চারিপাশ থেকে ঘেরাও করে রেখেছে মানুষের ক্ষুদ্র কামনা-বাসনা। সেই কামনা আর বাসনাকে লাগাম পরানোই জেহাদ। সুফি তাত্ত্বিকেরা তাই জিহাদের দুটি প্রকারভেদের কথা বলেছেন: বড়ো জেহাদ (আল জেহাদ আল আকবর) এবং ছোটো জেহাদ (আল জেহাদ আল আসগর)। ভিতরের শত্রুকে পর্যুদস্ত করতে আল্লাহর পথে আধ্যাত্মিক লড়াই হল বড়ো জেহাদ। অস্ত্র হাতে যুদ্ধ হল ছোটো জেহাদ। কোনো যুদ্ধ থেকে ফেরার পরে এক সাহাবির প্রশ্নের উত্তরে মহম্মদ এ কথা বলেছিলেন বলে জানা যায়। জিহাদ নিয়ে নবির এই বাণী অনেকে বলেন হাদিস গ্রন্থে আছে। কোন হাদিসে? তার কোনো স্পষ্ট উল্লেখ মেলে না। কেউ বলেন তিরমিজি শরিফে, কেউ বলেন মুসলিম শরিফে। তবে সুফি তাত্ত্বিকেরা ছাড়াও উদারপন্থী পণ্ডিতেরা বড়ো জেহাদের ওই ব্যাখ্যাকে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেছেন।

আসগর আলি ইঞ্জিনিয়ারের দাবি, 'কোরানে জেহাদ সংক্রান্ত যে ৪১টি আয়াত আছে তার একটিতেও যুদ্ধ বা হিংসা নেই। বিংশ শতকের গোড়ায় যখন সন্ত্রাসবাদ আজকের মতো মাথাচাড়া দেয়নি, প্রখ্যাত ইসলামি ধর্মবেত্তা মৌলবি চিরাগ আলি জেহাদ সম্পর্কে একটা বইয়ে দেখিয়েছিলেন, কোরানে একটি বারের জন্যও জেহাদকে যুদ্ধ বা হিংসা হিসেবে দেখানো হয়নি। কোরানে জেহাদ কীভাবে আছে তা বোঝার জন্য সেটি একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ।' ইঞ্জিনিয়ার আরো অনেকটা এগিয়ে জেহাদকে বিশ্ব উষ্ণায়ন রদ করার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলেও দাবি করেছেন। কীভাবে? তার বক্তব্য, 'আমাদের লাগামছাড়া ভোগের পরিণতি বিশ্ব উষ্ণায়ন। ভোগের এই বিপজ্জনক পরিণতির কথা বিবেচনা করে আমরা এদের বিরুদ্ধে জেহাদ করতে পারি। সুফিরা তাঁদের সংযম এবং কৃচ্ছসাধনের মধ্যে দিয়ে এটাই করেছিলেন। ইঞ্জিনিয়ার বলেছেন, 'অপ্রয়োজনীয় ভোগবিলাসের মধ্যে দিয়ে যারা এই গ্রহকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, আমরা মুসলিম (আল্লাহ্‌র প্রতি সমর্পিত) এবং মুমিন (কোরান কথিত মূল্যবোধে বিশ্বাসী) হিসেবে অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বা জেহাদ করব।' এই ধরনের জিহাদ ব্যক্তিগত বা সংঘবদ্ধ— দুই রকমই হতে পারে। ব্যক্তি তার ভোগকে কমিয়ে পরিবেশ সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে যাবে। আর সংঘবদ্ধভাবে আমরা গোটা বিশ্বের

ভোগের বাড়াবাড়ি কমানোর জন্য শাসকের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারি।' বিশ্বের আজকের পরিস্থিতিতে একথা খানিকটা অবাস্তব মনে হলেও কেউ তো জেহাদের এইসব ব্যাখ্যায় বিশ্বাস করছেন। এই বিশ্বাস অবশ্যই আজকের মৌলবাদী ওয়াহাবি সালাফি সন্ত্রাসবাদীদের গণসংহারের বিপরীতে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সাদিয়া দেহলভি তাঁর 'সুফিজম: দ্য হার্ট অব ইসলাম' গ্রন্থে বলেছেন, 'জেহাদের নামে সংঘটিত হিংসা ও অপরাধ ইসলাম ও তার অনুসারীদের সম্বন্ধে সাধারণের ধারণাগুলোকে নষ্ট করেছে। ইসলামে জেহাদের সঙ্গে আধ্যাত্মিক সংগ্রামের অপরিহার্য সম্পর্ক। অথচ জঙ্গিরা তাকে অপহরণ করে অসহিষ্ণুতা আর হিংসার সঙ্গে ওতপ্রোত করেছে।'

তার পরেও আয়েসা জালাল ('পার্টিজান অব ইসলাম' গ্রন্থে) প্রশ্ন তোলেন, 'তাহলে ইসলাম অনুসারে জেহাদের সঠিক অর্থ কী? এর মানে কি যুদ্ধ? এর কোনো সহজ উত্তর নেই। কারণ মুসলমানদের মধ্যে প্রায় হাজার বছর ধরে এই প্রশ্নে মতপার্থক্য দূর করা যায়নি।' আয়েসা জানান, 'প্রাক্-আধুনিক যুগে দুটি পৃথক ধারণার সহাবস্থান ছিল। একটি ছিল পরিষ্কার রাজনৈতিক মতবাদ। সেখানে বলা হত, দারুল ইসলামের বিস্তৃতির জন্য ইসলামি শাসন এবং বিস্তৃতি অব্যাহত রাখতে জেহাদ হল প্রতিটি মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক। অন্যটি হল সুফি মতবাদের নিজের ভিতরকার জেহাদ। এই দুই মতের ফারাক বা বলা ভালো বিরোধ আজকেও সমানভাবেই রয়েছে।' যাকে আমরা সুফি মতবাদ বলছি, বাংলায় তাই মারফতি বা সহজিয়া ধারা। মূলধারার মুসলমানদের একটা বড়ো অংশই তাকে শরিয়তবিরোধী বলে কেবল প্রচার করে না, তারা মারফতিদের বিরুদ্ধে সক্রিয়ও বটে। মুর্শিদাবাদ জেলায় আজও মারফতি বা সুফিদের নিগৃহীত হতে হয় গোঁড়া মুসলিমদের হাতে।

জেহাদকে অনেকে সাহাদা (আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নাই এবং মুহাম্মদ তার রসুল), নামাজ, রোজা, হজ, জাকাতের মতো মুসলমানদের আর একটি ফরজ (অবশ্য পালনীয় কর্তব্য) বলে চিহ্নিত করেছেন। অর্থাৎ তাঁদের মতে জেহাদ ইসলামের ষষ্ঠ স্তম্ভ। তবে আচার হিসাবে জেহাদ কোনো সার্বক্ষণিক বা নিয়মিত কর্তব্য নয়। বরং নির্দিষ্ট সময়ে পালনীয় কর্তব্য। আগেই বলা হয়েছে, সুফিদের আস্থা নেই অস্ত্রের জিহাদে। তাঁরা মনে করেন, নিজের ভিতরকার কুপ্রবৃত্তিগুলোর সঙ্গে নিয়ত আধ্যাত্মিক লড়াই চালিয়ে যাওয়াই জেহাদ।

ইদানীং সারা বিশ্বজুড়ে আইএস, আল-কায়দা, বোকো হারাম, তালিবান, হিজবুল মুজাহিদিনদের মতো অসংখ্য মুসলিম সংগঠন নিজেদের জিহাদি সংগঠন বলেই পরিচয় দেয় (অথচ জিহাদি শব্দটাই ভুল। দেশি-বিদেশি সংবাদমাধ্যম তৈরি করে বিশ্বজুড়ে চালু করে দিয়েছে এই শব্দটা। জিহাদ যারা করে তারা জিহাদি নয়, মুজাহিদ)। আল-কায়দার কর্ণধার ওসামা বিন লাদেনও ছিল মুজাহিদ। তারা 'দারুল হরব'-কে 'দারুল ইসলাম' করার কাজে ব্রতী। বস্তুত ইসলাম সকল মুসলমানকে এই দায়িত্ব দিয়েছে। কোরানে সেই রকমই বলা হয়েছে। যে-সমস্ত মুসলিমপ্রধান রাষ্ট্রে এখনও গণতন্ত্রের সামান্য অবশেষ থেকে গিয়েছে সেখানে 'আল্লাহর আইন' বা শরিয়তি আইন কায়েম করতে চায় তারা। জেহাদের স্পষ্ট প্রতিফলন পাওয়া যায় আমেরিকার বিরুদ্ধে ওসামা বিন লাদেনের হুমকিতে। আমেরিকার প্রতি লাদেনের ঘোষণা ছিল: 'হয় ইসলাম গ্রহণ করো, নয় ধ্বংসের জন্য প্রস্তুত হও'।

কিন্তু ইসলামি ধর্মতত্ত্ব মানলে দেখা যাবে, জেহাদ সেই রাষ্ট্রের জন্য বাস্তব যে রাষ্ট্র গোটা ইসলামি উম্মাকে শাসন করে। সেই উম্মার দায়িত্ব জেহাদের মাধ্যমে যত বেশি সংখ্যক ভিন্নধর্মীকে ইসলাম ধর্ম ও শাসনের মধ্যে এনে রাষ্ট্রের পরিধি বাড়িয়ে চলা। অন্তত রসুল সেই রকম একটা জেহাদই জীবনভর অনুশীলন করেছেন। অন্যান্য সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে জেহাদিদের পার্থক্য একটা বিশেষ ক্ষেত্রে। অন্যান্য সন্ত্রাসবাদীরা নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য সরকারকে চাপ দেয়। কিন্তু জেহাদিরা যখন জেহাদ করে, তখন শুধুমাত্র সরকারই তাদের লক্ষ্য নয়। জেহাদ সম্পর্কে এই মতের প্রবক্তারা বলেন, এই কাজ তারা করে গোটা মুসলিম জাতিকে উন্নত, জটিল, বহুমাত্রিক এই সমাজ থেকে আলাদা করে দিতে, যাতে গোটা সমাজ তাদের দিকে সন্দেহ ও ঘৃণার নজরে দেখে। যাতে তারা আরো গুটিয়ে নেয় নিজেদের, আরো সংহত করে নেয়, আরো সচেতন হয়ে পড়ে নিজেদের ধর্মীয় আইডেন্টিটি সম্পর্কে, যেটা তাদের মিথ্যা বিশ্বাসেরই অঙ্গ। ধর্মীয় আইডেন্টিটি সম্পর্কে নিজেদের মিথ্যা বোঝানো ওই অতি-সচেতন সংহত একটি মানবগোষ্ঠীকে খুব সহজেই ধর্ম বিষয়ে বিভ্রান্ত করা যায়। জেহাদিরা সেটা করে খুব দক্ষতার সঙ্গে। তারা 'প্যান ইসলাম' (গোটা বিশ্বের ইসলামীকরণের তত্ত্ব)-এর দিবাস্বপ্ন দেখিয়ে তাদের ব্যবহার করে যন্ত্র হিসেবে। আর এই মানুষগুলো অন্যদের ঘৃণা ও সন্দেহ থেকে বাঁচার জন্য এই পথটাকেই সঙ্গত মনে করে। তারা যান্ত্রিকভাবেই প্যান ইসলামের সমর্থক হয়ে পড়ে। সমর্থক হয়ে পড়ে জেহাদের, নিজের অজান্তেই। অন্যদিকে গোঁড়া মুসলমানেরা ইসলামি বিশ্বভাতৃত্বের স্বপ্নে এতটাই ডুবে থাকে যে, যে দেশের নাগরিক হিসেবে তারা যাবতীয় সুযোগসুবিধা ভোগ করে, সেই দেশের জাতীয় জীবন থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রাখে। এই বিচ্ছিন্নতাই তথাকথিত বিশুদ্ধ ইসলাম এবং মৌলবাদচর্চাকে প্রাসঙ্গিক করে তোলে। জাতীয় পরিচয়কে ছাপিয়ে উম্মার বিশ্বজনীনতা তাদের কাছে

বড়ো হয়ে ওঠে। ফলে সিরিয়া, ইরান বা ইরাকের মুসলমানের শত্রু ব্রিটিশ, আমেরিকা, বা রাশিয়া ভারতীয়, বাংলাদেশি বা পাকিস্তানের মুসলমানের শত্রু হয়ে ওঠে। সম্ভবত একই কারণে এখন স্বৈরাচারী হয়ে ওঠা তুরস্কের মৌলবাদী প্রেসিডেন্ট রিসেপ তায়িপ এরদোয়ান ভারতের মুসলমানের 'প্রাণপ্রিয় নেতা'। কেবল ভারত নয় এই উপমহাদেশে মুসলমানের সামনে তিনি নতুন ভরসার মুখ। কারণ ৫৭টি মুসলিম দেশের সেনাবাহিনী 'আর্মি অব ইসলাম' গঠন করতে চেয়েছেন তিনি। এই প্যান ইসলামি সেনা তৈরি হবে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য। কারণ এরদোগান বলেছেন, 'ধর্ম একটাই, ইসলাম'। কারণ তিনি বলেছেন, 'জন্মনিয়ন্ত্রণ বা পরিবার পরিকল্পনা কোনো মুসলিম পরিবারের জন্য উচিত নয়।' দেশের সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পরে ওই 'বিশ্ব নায়ক' ইসলামকে সাফসুতরো করতে নেমেছেন। এটাও এক ধরনের জেহাদ বই-কী!

আরো আছে, বিশ্বজুড়ে মুসলমানের বিপন্নতার একটা ছবি এঁকে তার জন্য আমেরিকা এবং পশ্চিমি দুনিয়াকে দায়ী করার প্রবণতা। মুসলমানকে কারা বিপন্ন করছে? সাধারণভাবে দেখতে পাই ইসলামি জঙ্গি গোষ্ঠীগুলো প্রায় প্রতিদিন কোনো-না-কোনো দেশে হামলা চালিয়ে শয়ে শয়ে নিরীহ মানুষ হত্যা করছে। তাদের মধ্যে মুসলমানই বেশি। এ সবই তারা করছে ইসলামে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে। ইসলামি রাষ্ট্রগুলোর ওপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য এই তাদের জেহাদ। উদার এবং শিক্ষিত মুসলিমদের কাছে ওই জিহাদ একইসঙ্গে আতঙ্ক, লজ্জা ও আশার নাম। তারা বোঝে যে, এই জগতে নিজেকে টিকিয়ে রাখাটাই সবচেয়ে বড়ো সংগ্রাম; তারা বোঝে, বর্তমানে আরবি ভাষা শিখে কোরান মুখস্থ করার চেয়ে কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন পড়া কাজের। কোরান হাদিসকে ধর্মগ্রন্থের বেশি কিছু মনে করার সময় নেই তাদের। ইসলাম বা জিহাদের সূক্ষ্ম তত্ত্ব তারা বোঝে না। এইসব নামেমাত্র মুসলিমরা প্রতিদিন দেখছে, জেহাদ কীভাবে বর্তমান বিশ্বকে সন্ত্রস্ত করে রেখেছে। এমনকী মুসলিম দেশগুলিও সন্ত্রাসের বাইরে থাকছে না। বিভিন্ন ইসলামি গোষ্ঠীর প্রত্যেকটিই মনে করছে, অন্য গোষ্ঠী হল তাদের ইসলামের বিরোধী। ফলে তারা একে অন্যের ওপর সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ চালাচ্ছে, পরিণতিতে প্রাণহানি। বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র ধ্বংসের পর থেকে আজ পর্যন্ত কুড়ি হাজারের ওপর সন্ত্রাসী আক্রমণ হয়েছে। হতাহতের সংখ্যা বেশ কয়েক লক্ষ। অমুসলিমরা তো এর শিকার হচ্ছেই, মুসলিমরা শিকার হচ্ছে আরো বেশি।

আর এক পক্ষ নিয়ম করে সাধারণ মুসলমানকে বুঝিয়ে চলেছে, ইসলামি সন্ত্রাসবাদী বলে যে প্রচার চলছে তা সর্বৈব মিথ্যা। এ সবই আমেরিকা এবং পশ্চিমি দুনিয়ার বানানো জেহাদিদের কাজ। এর সঙ্গে ইসলাম বা মুসলমানদের কোনো সম্পর্ক নেই। এই প্রচার চলছে। ইসলামি নানা সংগঠন ব্যক্তিগতভাবে বা সংগঠিত প্রচারে সাধারণ মানুষকে এই সবই বোঝাচ্ছে। কলকাতা থেকে প্রকাশিত একটি দৈনিক সংবাদপত্রে প্রায়শই এই ধরনের লেখা বেরোয়। ২৯ আগস্ট প্রকাশিত একটি লেখা থেকে কিছু কিছু অংশ পাঠ করলে বুঝতে সুবিধা হবে জেহাদের কোন ব্যাখ্যা বাংলার সাধারণ মুসলমানের কাছে পৌঁছচ্ছে। উবায়দুর রহমান খান নদভি লিখেছেন, 'আল-কায়দা, বিন লাদেন, আল আওলাকি, আইমান আল জাওয়াহেরি এসব নাম পশ্চিমিদের বহু অপকর্মে ব্যবহৃত হয়েছে। তারা প্রকৃতই যে আদর্শ নিয়ে যে সংগ্রাম চালিয়ে গেছে, সে বিষয়ে আলোচনা থাকতেই পারে। পশ্চিমিদের দ্বিমত ও বিদ্বেষ থাকাও স্বাভাবিক। কিন্তু তাদের জড়িত না থাকা বহু ঘটনা পশ্চিমিরা নিজেরা ঘটিয়ে তাদের নামে চালিয়ে দিয়েছে, এমন ঘটনাও কম নয়। মজার ব্যাপার হল, আইএস যত মানুষ মেরেছে তার ৯৯ ভাগ মুসলমান। অমুসলিম হত্যা বা ইসরায়েলে আক্রমণ আইএস-এর কার্যতালিকায় নেই।... কুরান সুন্নাহর অনুসারী প্রকৃত মুজাহিদদের স্বদেশ স্বজাতির স্বাধীনতা ও সম্মান পুনরুদ্ধারে বিশ্বব্যাপী ন্যায়ের যোদ্ধাদের ধ্বংস করতে দুশমনরাই ডামি মুজাহিদ তৈরি করে। এদের বিপক্ষে কেউ কথা বললে বলে এ লোক জিহাদকে অস্বীকার করছে। দুনিয়ার কোনো নীতিনিষ্ঠ মানুষই জিহাদকে অস্বীকার করতে পারে না। তাহলে যুগে যুগে ন্যায়ের সংগ্রাম ও মুক্তির লড়াই চলত না। পশ্চিমিরা জিহাদকে অস্বীকার করতে পারে না। তাহলে যুগে যুগে ন্যায়ের সংগ্রাম ও মুক্তির লড়াই চলত না। পশ্চিমিরা জিহাদকে ভয় পায়। তাই জিহাদি পরিবেশে তারা দালাল ঢুকিয়ে এর যৌক্তিকতা ও পবিত্রতা নষ্ট করে। নাসারাদের দীর্ঘ পরিকল্পনা থাকে, তারা মুসলমান সন্তানদের বাবা-মা থেকে আলাদা করে শরণার্থী বানায় এবং পরে ছেলে ধরার মতো নিয়ে যায়। অজ্ঞাতস্থানে তাদের লালনপালন করে হিংস্র বানায়। ধর্ম ও মনুষ্যত্বের দুটোই কেড়ে নেয়। এরপর যেখানে প্রয়োজন মনে করে লেবাস পাগড়ি লাগিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কাউকে মুজাহিদ বানায়, কাউকে আত্মঘাতী, কাউকে বিশাল ইসলামিক লিডার। আসলে এরা ভাগ্যহত রোবট মাত্র। ...' অদ্ভুত এই প্রচার কেবল খবরের কাগজে সীমাবদ্ধ নেই, ইসলামি জলসায় চিৎকৃত বক্তৃতার মাধ্যমে গ্রাম-গঞ্জ পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে। সাধারণ মুসলমান জেহাদের এই ব্যাখ্যাই শুনছে। বড়ো জেহাদের তত্ত্ব তাদের কাছে অবান্তর অপ্রাসঙ্গিক। সহজিয়াদের আত্মার শুদ্ধির তত্ত্ব এদের কাছে শরিয়তবিরোধী।

আধুনিক রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে সর্বপ্রথম জেহাদ ঘটিয়েছিল ভারতীয় মুসলমানেরাই। ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের পরে। এক রাজদ্রোহী সিপাই উত্তর-ভারতের জৌনপুর শহরে দিল্লির নবাবের শাসন ঘোষণা করে স্থানীয় এক দরবেশের কাছে

ইংরেজের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার ফতোয়া প্রার্থনা করেন। কারণ মুসলমানদের একটা অংশ মনে করেছিলেন, মুসলমান শাসকদের পরাজিত করে ইংরেজ ভারত দখল করার পরে এই দেশ আর দারুল ইসলাম নেই। দারুল হরব মুসলমানের বসবাসের যোগ্য নয়। প্রকৃত মুসলমানকে হয় জেহাদ করে ভারতকে ফের দারুল ইসলামে পরিণত করতে হবে, নয়তো এ দেশ থেকে হিজরত করে কোনো মুসলিম দেশে চলে যেতে হবে। প্রথমে সাহ আবদুল আজিজ নামে এক আলেম, পরে বৃহত্তর আলেম সমাজ ফতোয়া দেয়, ভারত দারুল হরব। কারণ কলকাতা থেকে দিল্লি সর্বত্রই পৌত্তলিকতা (কুফর ও শিরক) বলবৎ হয়ে গেছে এবং আমাদের শরিয়তি আইন আর প্রতিপালিত হয় না। তাঁদের সিদ্ধান্ত ছিল, কলকাতা ও তার অধীন অঞ্চল সমূহ শত্রুর দেশ (দারুল হরব)। তাতে ওয়াহাবিরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, ভারতের শাসকের বিরুদ্ধে জেহাদ করা কর্তব্য।

তাই নিয়ে গোটা দেশে মুসলমানদের মধ্যে তুমুল বিরোধ ও বিতর্ক শুরু হয়। শিয়া ও সুন্নি দুই সম্প্রদায়েরই আলেমরা ফতোয়া আর পালটা ফতোয়া দিতে থাকেন। শেষপর্যন্ত নানা যুক্তি দেখিয়ে ভারত দারুল ইসলাম না হলেও এই দেশ দারুল হরব হয়ে যায়নি বলে সিদ্ধান্ত নেন আলেমরা। জেহাদের পথে গিয়ে ভারতের লাখো মুসলমানকে অনিবার্য দুর্গতির হাত থেকে বাঁচাতে এমনকী এই মতের পক্ষে মক্কার মুফতিদের কাছ থেকেও ফতোয়া আনানো হয়। তাঁদের ফতোয়া ছিল, 'যতদিন ভারতে ইসলামের কোনো বিশিষ্ট আচার-অনুষ্ঠান পালিত হবে, ততদিন সেটা দারুল ইসলাম। এবং দারুল ইসলাম কাফেরদের হাতে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দারুল হরব হয়ে যায় না। তা হয় যখন সব কিংবা অধিকাংশ ইসলামের বিধিবিধান সেখানে রদ হয়ে যায়। উত্তর-ভারতের আলেম সমাজ ফতোয়া দেয়, যে দেশে মুসলমানের আমান (ধর্মীয় নিরাপত্তা) থাকে সে দেশে জেহাদ থাকে না। কারণ জেহাদের সবচেয়ে দরকারি শর্ত হল, দেশে মুসলমানের আমান এবং আজাদি থাকবে না। এই অবস্থা এখানে নেই। কলকাতা মোহামেডান সোসাইটির ফতোয়া ছিল আরো স্পষ্ট এবং কড়া। তাঁরা বলেন, 'যদি কোনো বিপথগামী দুর্বৃত্ত দেশের শাসকদের বিরুদ্ধে জেহাদ করে, তাহলে সেই জেহাদকে বিদ্রোহ বলে ঘোষণা করা আইনসংগত হবে। আর বিদ্রোহ শরিয়তে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।' বিদ্রোহ হলে মুসলমান প্রজাদের কর্তব্য হবে তাদের দমন করতে শাসককে সাহায্য করা। সেই নির্দেশ দেওয়া হয় ওই ফতোয়ায়।

সব ধর্মে যেমন হয়, ইসলামেও প্রয়োজনমতো ধর্মীয় নিদান নিজেদের সুবিধামতো বদলে নেওয়া যায়। আল-কায়দা বা আইএসের মতো জঙ্গি সংগঠনগুলোও প্রতিটি কাজ শরিয়ত মোতাবেক করছে বলে কেবল দাবিই করে না, তারা তার পক্ষে কোরান হাদিস এবং ইসলামি অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে তার ন্যায্যতারও প্রমাণ দেয়। ধর্ম সবই সয়, ধর্মে সবই হয়— তবেই সে ধর্ম লক্ষ কোটি মানুষের মধ্যে টিকে থাকতে পারে এবং বিকশিত হয়।

আরো একটা জেহাদের কথা শোনা যাচ্ছে ইদানীং— যৌন জেহাদ। তিউনিসিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লতিফ বেন জেদদৌ বলেছেন, তাঁর দেশ থেকে বহু নারী সিরিয়ায় পাড়ি জমিয়ে সেখানকার সরকারবিরোধী ইসলামপন্থীদের 'জিহাদে' যোগ দিয়েছেন। তবে ওই নারীরা অস্ত্র নিয়ে লড়াই চালাচ্ছেন না। 'জিহাদ-আল-নিকাহ' হিসেবে পরিচিত যুদ্ধকালীন সাময়িকভাবে বিয়ে করে তাঁরা মুজাহিদদের 'উদ্দীপ্ত' করে পরোক্ষভাবে 'জিহাদ' করছেন। 'হাফিংটন পোস্ট'-এর এক প্রতিবেদনে এ খবর জানা গেছে। সুন্নি সালাফিপন্থী কিছু আলেমের মতে, যুদ্ধকালীন সাময়িক বিবাহ বা 'জিহাদ-আল-নিকাহ' বৈধ। এই ধরনের 'জিহাদি বিবাহ'-তে কোনো মুসলিম নারী কোনো মুজাহিদকে বিয়ে করে তাঁর যৌনসঙ্গী হতে পারেন। আবার দ্রুতই তাঁরা বিবাহবিচ্ছেদ ঘটাতে পারেন। এই ধরনের সাময়িক বিয়ের মাধ্যমে একজন নারী এক দিনে একাধিক পুরুষের শয্যাসঙ্গী হতে পারেন।

ইদানীং সংবাদমাধ্যম এবং সংঘ পরিবারের প্রচারের কল্যাণে 'লাভ জেহাদ' নামে একটি জেহাদের কথাও প্রায়শ শোনা যাচ্ছে। ২০০৮ সালের আগে 'লাভ জেহাদ' (শুরুতে ছিল 'রোমিয়ো জেহাদ') শব্দবন্ধটির এত পরিচিতি ছিল না। ২০০৯ সালে প্রথম কেরল ক্যাথলিক বিশপ কাউন্সিল দাবি করে, লাভ জেহাদের লক্ষ্য সাড়ে চার হাজার মেয়ে। ওই অভিযোগ উঠতেই হিন্দু জনজাগৃতি সমিতি দাবি করে, কর্ণাটকের ৩০ হাজার মেয়েকে ইতিমধ্যেই ধর্মান্তরিত করা হয়েছে। কেরল হাই কোর্টের এক বিচারপতি পুলিশকে গোটা বিষয়টি তদন্ত করার নির্দেশ দিলে নতুন এই শব্দবন্ধ এক ধরনের বিচারবিভাগীয় মান্যতা পেয়ে যায়। অথচ দুই রাজ্যেরই তদন্তকারী সংস্থা তদন্তের শেষে অভিযোগের সারবত্তা খুঁজে পায়নি। প্রতি ক্ষেত্রেই মুসলিম ছেলের প্রেমে পড়ায় পরিবারের চাপে মেয়েটিকে বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। অভিযোগ ভুল প্রমাণিত হলেও গোটা বিতর্কটা হিন্দু মৌলবাদীদের হাতে রসদ তুলে দেয়। এই 'লাভ জেহাদ' বিতর্কে সবথেকে বড়ো ক্ষতি হচ্ছে মেয়েদেরই। সম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে মেয়েদের স্বাধীন মতামতের গুরুত্বই সেখানে অর্থহীন। প্রথাবিরুদ্ধ পাত্র নির্বাচনের মাশুল হিসেবে, হয় সে সমাজ থেকে বহিষ্কৃত হয়, নয়তো কখনো ধর্ষিতার তকমা দিয়ে কখনো-বা জোর করে ধর্মান্তরকরণের তত্ত্ব খাড়া করে, তার স্বাধীন-সত্তার অস্তিত্বটাকেই অস্বীকার করা হয়। লাভ জেহাদ নিয়ে মূলত ক্যাথলিক এবং হিন্দুত্ববাদীদের প্রচার প্রতিবেশী মুসলমানের ওপর চাপ সৃষ্টি করে ভয়ের পরিবেশ তৈরির জন্য। সে কাজে তারা অনেকটাই সফল।

গল্প পড়ার গণতন্ত্র

মিহির ভট্টাচার্য

নাসেরুদ্দিন আফান্দি বা মোল্লা নাসিরুদ্দিন-এর অজস্র কীর্তিকলাপ নিয়ে যেসব গল্প প্রচলিত তার মধ্যে একটি আমার বিশেষ প্রিয়। একটি চিনা সংকলন থেকে সেটি উদ্ধৃত করছি।

> একদিন, আফান্দী একটি চোরকে পাঁচিল টপকে তার বাড়িতে ঢুকতে দেখে, এমনি তার ঘরের একটি সিন্দুকের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল। চোর আফান্দীর ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোন মূল্যবান জিনিষ পেল না। শেষে সে ঐ ভাঙ্গা সিন্দুকের ডালা খুলে ভিতরে তাকিয়েই দেখল যে আফান্দী তার মধ্যে গুটিসুটি হয়ে বসে আছে। তা দেখে চোর বলে উঠল: "আরে, সিন্দুকের ভেতরে বসে তুমি কি করছ? " "আমার বাড়ীতে তোমার নেবার যোগ্য কোন জিনিষ নেই। তোমাকে আর কি করে মুখ দেখাই। তাই আমি লজ্জায় এখানে বসে রয়েছি"। আফান্দী উত্তর দিল।
>
> (*আফান্দীর গল্প*, অনুবাদ: ইউ তিয়ানচৌ, পরিমার্জন: সেন নালান, বিদেশি ভাষা প্রকাশনালয়, পেইচিং, ১৯৮৩, পৃ. ৮৮। বানান ও যতিচিহ্ন অপরিবর্তিত।)

অন্যান্য তর্জমায় কিছু তফাত দেখা যায়, যেমন কোথাও নাসিরুদ্দিন ভয় পেয়ে লুকোচ্ছে, আবার কোথাও-বা চোর ভয় পেয়েছে, কোথাও কিছু অতিরিক্ত সংলাপ আছে, কিন্তু মূল গল্পের ধাঁচাটা বদলায় না। লোককথার চোর সাধারণত স্বাভাবিক জীবনের মধ্যেকার চরিত্র, তার ধর্মকে, অর্থাৎ পেশা বা বৃত্তিকে, দেখা হচ্ছে আখ্যানের স্বীকৃত অঙ্গ হিসাবে, এবং তার কর্ম বা ক্রিয়াকে সামাজিক জীবনের উপাদান হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে, ঠিক যেমন কথা-কওয়া পিঠে-খাওয়া বিয়ে-পাগলা বাঘ নিজের বন্য চরিত্র অক্ষুণ্ণ রেখেই গল্পের মধ্যে স্বাভাবিক পদচারণা করে। লোককথার শৈলীতে বাস্তবিক আর কাল্পনিক তুল্যমূল্য প্রতিষ্ঠায় অবস্থান করে, যে-কারণে সহজেই রাজরানি রাতের বেলায় হয়ে যায় হাতি-ঘোড়া-খাওয়া রাক্ষুসি আর টুনটুনি পাখি শুদ্ধ বাংলায় বিড়ালনিকে গালাগালি করে। জীবজন্তুকে মানুষের ধর্ম আর ভাষা দিয়ে কাল্পনিক এক অদ্বৈত জগৎ বানানোর সঙ্গে তুলনা করা যায় সামাজিক বর্গ-বিভাজনকে লঙ্ঘন করে সর্বজনীন এক বিশ্বের নির্মাণ, যেখানে অপরাধজীবী এবং গুপ্ত-পরিচয় সিঁধেলকে তার অদৃশ্য অবস্থান থেকে জনজীবনের স্বাভাবিক বৃত্তে নিয়ে আসা যায়। রাতে বাড়িতে চোর ঢুকবে সেটা এই কল্পিত জগতে অতিশয় সাধারণ ও স্বাভাবিক ব্যাপার, দৃষ্ট সমাজের হুলস্থুল সেখানে অনুপস্থিত, আর গৃহস্বামীর সঙ্গে চোরের কথোপকথন এই আখ্যানের অবধারিত অঙ্গ, সেটি না থাকলে নাসেরুদ্দিনের শেষ চুটকিটি গল্পে ঢোকার সুযোগ পেত না। এক ধরনের লোককথা এরকম আঙ্গিকে রচিত; আকারে ছোটো সেসব গল্পের গতি অন্তিম সমাপ্তির দিকে ধাবিত, যাতে শেষতম মন্তব্যটি একটি মোচড় দিয়ে চেনা পৃথিবীর রূপরেখা পালটে দিতে পারে। বীরবল বা তেনালি রমন বা গোপাল ভাঁড়ের গল্প এই জাতের, যেখানে কৌতূকের সৃজন জনগণমন-এর সঞ্চিত প্রজ্ঞা থেকে আহৃত, আধিপত্য-সঞ্জাত মতাদর্শ থেকে মৌলিকভাবে পৃথক, শাসক-রচিত নিয়মাবলির সম্পূর্ণ বিরোধী। এই গল্পটির মধ্যে আফান্দি আর চোর একই বর্গের লোক, দুজনেই নিঃসম্পদ, তাদের মধ্যে শত্রুতার কোনো মৌলিক কারণ নেই, অতএব আফান্দি চোরকে আপ্যায়ন করছে প্রথাগত ভদ্রতার সঙ্গে, নিজেকে নীচে রেখে আগন্তুক অতিথিকে উঁচু জায়গায় বসিয়ে। সেখানেও একটি সূক্ষ্ম ব্যঙ্গ রয়েছে; সম্ভ্রান্ত সমাজের খানদানি প্রথা নকল করে চোরের অভ্যর্থনা হয়ে দাঁড়িয়েছে পরাবর্গ সমাজের প্রতি প্রতিবর্গের কটাক্ষ। ('উচ্চ' ও 'নীচ' বর্জন করে এই লেখায় 'পরাবর্গ' ও 'প্রতিবর্গ' ব্যবহৃত হয়েছে)।

মোল্লা নাসিরুদ্দিনের গল্প সাধারণত শাসক ও শাসিতের দ্বন্দ্বের উপরে, শক্তিমান আর অশক্তের মুখোমুখি সাক্ষাতের প্রকল্পে, বিন্যস্ত হয়ে আছে। গল্পগুলোর ভিত্তি হল একদিকে ক্ষমতার আস্ফালন, আর অন্যদিকে গরিবের বিদ্রোহী উচ্চারণ। এই উচ্চারণ বিপ্লব বা সন্ত্রাস বা হিংস্রতার ডাক দেয় না, স্থিতাবস্থার মধ্যেই ফাঁকফোকর খুঁজে সমাজের অসম বিন্যাস চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, ক্ষমতার তাত্ত্বিক ভিত্তি ধরে

নাড়া দেয়। অসাম্যের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক বিন্যাসে এই গল্পগুলির মধ্যে একদিকে আছে বাদশা-উজির-সেনাপতি-ইমাম-কাজি-জমিদার-মহাজন-সওদাগর-উকিল-পালোয়ান ইত্যাদি ক্ষমতাশালী লোক আর অন্যদিকে রয়েছে নাসিরুদ্দিন, সে কখনো গরিব চাষা, কখনো চাকর, কখনো-বা মুটে-মুচি-কর্মচারী-প্রজা-শিকারি-মোসাহেব-খদ্দের-সভাসদ-বুজুর্গ-সাক্ষী-আসামি। নিজের বুদ্ধিমত্তায় সে ক্ষমতাশীলের কাছাকাছি উঠে আসে। কিন্তু তার ধর্ম হল সবাইকে চারটি হক কথা শুনিয়ে দেওয়া; সে বাদশা-উজির, কাজি-ইমাম মানে না, সমীহ করে না জমিদার বা মহাজনকে, যেকোনো ঘটনার সার সত্য সে বুঝে যায় মুহূর্তের মধ্যে, এবং তার সিদ্ধান্ত সবসময় যায় গরিবের পক্ষে। কিন্তু সে কোনো মসিহ বা মহাপুরুষ নয়, ধর্মের সঙ্গে পারতপক্ষে তার সম্পর্ক নেই, নমাজ পড়ায় তার বিলক্ষণ অনিচ্ছা দেখা যায়, খোদার উপরে খোদকারি তার অভ্যস্ত ব্যবহার; তার বিশ্বাস ও কর্ম ঘোর ইহবাদী, সে খেতে ভালোবাসে, অর্থে তার আকর্ষণ আছে, কিন্তু বড়োলোক ছাড়া কাউকে সে ঠকাবে না, তার আত্মসুখে আসক্তি অনেকসময় পরচিকীর্ষার তাগিদে বিলীন হয়ে যায় বা নাটকীয় সমাপ্তির স্বার্থে উহ্য থাকে। নাসিরুদ্দিনের প্রজ্ঞা কোনো ব্যক্তিবিশেষের মেধাবী ব্যতিক্রম নয়, সমাজের সব নিপীড়িতের অভিজ্ঞতার নির্যাস, কাজেই তার রসবোধ আর ভাষিক ঔজ্জ্বল্য হয়ে ওঠে সর্বজনীন প্রতিনিধিত্বের দাবিদার, প্রতিবর্গের সম্মিলিত জ্ঞান থেকে আহৃত দর্শনের অভিব্যক্তি।

মোল্লা নাসিরুদ্দিন সেই বর্গের বাসিন্দা যার মধ্যে আমরা চার্লস চ্যাপলিন-সৃষ্ট ভবঘুরের বিচরণ দেখি। সারা বিশ্বের সংস্কৃতিতে বহু যুগ ধরে এদের নিয়ে গল্প তৈরি হয়েছে, মুখে মুখে তা ছড়িয়ে গেছে দূর থেকে দূরে, শিষ্ট সাহিত্যকে দূরে ঠেলে রেখে লৌকিক মানসেই তাদের অবস্থান। নাসিরুদ্দিন বা বীরবল বা গোপাল ভাঁড় ইত্যাদি ব্যক্তিত্বকে নিয়ে যে গল্পগুলি তৈরি হয়েছে সেগুলির কোনো লেখক নেই, গোষ্ঠীর উদ্যোগেই তাদের সৃজন, এবং তাদের চলন অনেকসময় গোষ্ঠীর সীমানা ছাড়িয়ে যায়, মুখের কথায় দেশ থেকে দেশান্তরে ভেসে চলে গল্পের ছক, গানের কলি, মেয়েদের ছড়া, লোকায়ত দর্শন। এরকম চলিষ্ণু সাংস্কৃতিক ভাণ্ডার বিশেষভাবে জনগণের আয়ত্তে থাকে, শিষ্ট ও শক্তিমানের লিখিত সাহিত্য থেকে পৃথক তার অবস্থান। তবে দুর্বার এই লৌকিক প্রবাহ থেকে অভিজাত সংস্কৃতি সবসময় দূরে সরে থাকতে পারে না, তাকে নিয়ে নিতে হয় মান্য পাঠ্যের মাঝখানে। মহাভারতের পরতে পরতে আছে অনার্য আখ্যানের ভিড় আর প্রাগৈতিহাসিক ক্রিয়াকর্মের রেশ; দান্তে-র মহাকাব্য সরকারি ক্যাথলিক মতাদর্শকে কুর্নিশ করেও জনগণের বিপরীত রীতিকে গুরুত্ব দেয়; মঙ্গলকাব্যের শিব তো গাঁজাখোর ছন্নছাড়া ছোটোলোক, প্রতিবর্গের প্রতিনিধি; শেক্সপিয়রের সমাজচেতনা বার বার সরকারি রাজনীতির দর্পচূর্ণ করে। এই বিবেচনার মধ্যে চ্যাপলিনের ভবঘুরেকে আনা বিশেষ দরকার কারণ তার আধুনিক অবস্থান যুগপৎ লৌকিক এবং মান্য সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করে। সিনেমার মতো নতুন আর সর্বজনীন ও শক্তিশালী মাধ্যমের সুযোগ নিয়ে চ্যাপলিনের প্রতিভা তৈরি করে নেয় এক অবিস্মরণীয় চরিত্র, যার সরল অসংসারী বিনয়ী দরদি উপস্থিতি সামাজিক অর্থনীতির গোপন কথাগুলো প্রকাশ্যে নিয়ে আসে, অভ্যস্ত জীবনকে তাড়িত করে মানবিক নৈতিকতায়, নিয়ম আর উদ্ভাবনের সংঘর্ষে নির্মাণ করে কৌতুকহাস্য, যেটা জনগণের নিজস্ব সমালোচনার ভাষা। ভবঘুরে যেমন ছোটো মানুষ হিসাবে জনপ্রতিভূ, তেমনি এই প্রতিনিধিত্বের অন্য প্রান্তে আছে প্রকাণ্ড আর প্রচণ্ড সব লৌকিক বীর, ঘটোৎকচ যেমন, রাক্ষস হয়েও ন্যায়যুদ্ধে সে আর্যজগতের পরিত্রাতা, আর মহাভারতের বাইরেও অনেক লোক-আখ্যানের নায়ক। গারগাঁতুয়া (Gargantua) একজন জনপ্রিয় বীর, যার বিপুল উপস্থিতি পরিচিত জগতের চেহারাটাই পালটে দেয়। তার অপ্রতিরোধ্য শারীরিক প্রক্রিয়াগুলি দেহের নিম্নতর অংশকে তুমুল প্রাধান্য দেয়। তার জগতে খাদন পাচন রেচন মৈথুন স্পর্শ স্বাদ ইত্যাদির গুরুত্ব অনেক বেশি; চিন্তা অনুভূতি ভাব উপলব্ধি এষণা ভক্তি ইত্যাদি 'উচ্চতর' প্রক্রিয়া তুলনায় গৌণ, মানবিক জগৎ থেকে প্রায় বহিষ্কৃত, বস্তুবাদী ইতিহাসের প্রেক্ষিতে বিবর্জিত। এই ইতিহাস জনগণের অন্তরঙ্গ জীবনের বিবরণ, শিষ্ট-সমাজের প্রকাশ্য কাহিনি থেকে আলাদা, সরকারি মতাদর্শের বিপরীতে তার অবস্থান। রাবলে-র (Gargantua and Pantagruel, Francois Rabelais, 1994-1553) কাহিনির এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন মহামহোপাধ্যায় মিখাইল বাখতিন (Mikhail Bakhtin, *Rabelais and His World,* Eng. Tr. 1965), যাঁর অন্তর্দৃষ্টি ইওরোপীয় সংস্কৃতির ইতিহাসটাকেই পালটে দিয়েছে।

গল্প গড়া নিয়ে যে দুটো ঐতিহ্যের কথা হল— শিষ্ট আর মান্য পাঠ্যগুচ্ছ এবং লৌকিক দৃশ্য ও শ্রাব্য সংস্কৃতি— তার মধ্যে দ্বিতীয়টির নির্মাণে প্রণেতার কোনো উপস্থিতি নেই, গোষ্ঠীতেই তার সৃজন, সমষ্টির প্রয়াসেই তার সঞ্চলন, পঠন-পাঠনে সামাজিক উপস্থিতি তার কুললক্ষণ। ছড়া বা লোককথার রচয়িতা কে সেটা কেউ জানে না, জানার দরকারও নেই, সমগ্রের ব্যবহারেই তার সার্থকতা। স্রষ্টা যেহেতু নেই, সেহেতু সৃজনের নেই কোনো কর্তৃত্ব, যে কেউ সেই পাঠ্য নিয়ে নাড়াচাড়া করতে পারে, ঘটিয়ে দিতে পারে তার রূপান্তর, বদলে দিতে পারে তার অর্থ। প্রণেতার কর্তৃত্ব না থাকায় পাঠ্যের অনন্য প্রভুত্ব আর খাটে না, ব্যক্তিপূজা রদ হয়, লেখক আর পাঠকের

ঠাঁটবাট সমপর্যায়ে চলে আসে, পরস্পরের ভূমিকা অনেকসময় বদলে যায়। গণতন্ত্রের সাংস্কৃতিক গুরুত্ব বোধহয় এইখানে। আর লেখক ও গ্রন্থস্বত্ব যেহেতু নেই, সেহেতু বাজারের নেই কোনো দখলদারি, মুক্ত চলাচলে মুনাফার গুরুত্ব কার্যত শূন্য। মনে রাখা উচিত যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের এবং পঠন-পাঠনের দীর্ঘ ইতিহাসে বাজারের দালালি মোটে দু-তিন শতাব্দীর ব্যাপার; তার আগে পর্যন্ত স্রষ্টা ও গ্রাহকের মধ্যেকার সম্পর্ক ছিল প্রত্যক্ষ ও মধ্যস্থতাহীন। এখন আবার অনেকে অন্তর্জাল-এর (Internet) কৃষ্ণগহ্বরে অনুরূপ গণতন্ত্রের খোয়াব দেখছেন।

সমালোচনা বা টীকার সামাজিক ভূমিকা এখানে, লেখক আর পাঠকের মধ্যেকার ব্যবধান ঘুচিয়ে একরকম আদান-প্রদানের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। ভারতীয় সাহিত্যপাঠ ও দর্শনপাঠের ঐতিহ্যে টীকার সৃজনশীল ভূমিকা অনেকেই লক্ষ করেছেন। পঠনও একরকম সৃজন, সমালোচক একজন জনপ্রতিনিধি। বস্তুত, গল্পের মধ্যেকার জঙ্গম ও জটিল গঠন নিয়ে পাঠক-শ্রোতার কৌতূহলের অন্ত নেই। এবং কাহিনির গূহ্য অভ্যন্তরে যা লুকিয়ে থাকে, হয়তো রচয়িতার চৈতন্যেরও গভীরে, তার আবিষ্কার বরাবরই সমালোচকদের প্রিয় বিনোদন।

সাহিত্যপাঠের অছিলায় যেসব রম্যরচনা আমাদের পরিচিত তার মধ্যে কাব্যে উপেক্ষিতাদের কাহিনি সামনে নিয়ে আসা একসময় আদৃত ছিল। জনপ্রিয় কাহিনিতে নারীর উপস্থিতি কখনো কখনো অপরিহার্য, যেমন দ্রৌপদী হেলেন কুন্তী মেদেয়া সীতা শেহরজাদ পদ্মিনী জুলেখা ফুল্লরা মলুয়া, কিন্তু লোককথা বা মহাকাব্যের প্রকাশ্য জগতে— অর্থাৎ ক্ষমতা-সংস্থানের আখ্যানে— নারীর ভূমিকা অপ্রধান, এমনটাই বিধিবদ্ধ হয়ে আছে। উর্মিলার কথা বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, নিরীহ এক বিপরীত প্রতিবেদনে জানিয়েছিলেন যে সাংস্কৃতিক প্রতিস্থাপনে অবরোধের অন্তরালবর্তিনীরা রচনার ফাঁকে-ফোকরেই থেকে যায়, যদিও তাদের দাবি আছে পুনর্বিবেচনার; কিন্তু শিষ্টসমাজে এটাই দস্তুর ছিল, হয়তো এখনও আছে। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের পর আরো কেউ কেউ এইরকম আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তাঁদের অবশ্য যুক্তি ছিল আখ্যানের মধ্যবর্তী উপস্থিতি বিষয়ে, সীতার পাশে যেমন উর্মিলা, কাজেই লিঙ্গ-বিষয়ক কোনো বৈপ্লবিক চিন্তা এইসব মন্তব্যের ভিত্তি নয়; ভরত নামক পুরুষের সম্বন্ধেও একই রকমের হিসেব কষা হয়েছে। এইসব শৌখিন চিন্তা অবশ্য এখনকার নিরিখে প্রাগৈতিহাসিক, কারণ বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে যেসব বৌদ্ধিক উপপ্লব জনাবর্তে জায়গা করে নিয়েছিল তার মধ্যে নারীমুক্তির প্রসঙ্গটি ছিল একেবারে মোক্ষম। অগ্রবর্তী মহিলা বুদ্ধিজীবী ও সংগ্রামীদের কল্যাণে এত রকম কাজ হয়েছে যে এখন মনে মনে না চাইলেও মুখে মুখে লিঙ্গবৈষম্যের কথা এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব। কাজেই সংস্কৃতি-পাঠ বা সামাজিক পরিস্থিতির বিচারে আজকাল সমালোচনার পদ্ধতিই বদলে গেছে। রাজনীতিতে হামেশাই নিপীড়িত বা অবহেলিতদের কথা শোনা যায়; সাহিত্যপাঠেও খোঁজা হয় লেখকের গুপ্ত প্রকল্পের দাপট। আর একটু বড়ো করে দেখলে বলা যায় যে কোনো আখ্যানের ফাঁকফোকরগুলোকে নীরবতার বা অনুপস্থিতির উদ্দেশ্যমূলক দ্যোতনা হিসাবে ধরে নেওয়াটা এখন আধুনিক সমালোচনার একটা স্তম্ভ হয়ে আছে। নারীবাদীরা অনেক সময় শার্লট ব্রন্টি-র (Charlotte Bronte, 1816-1855) উপন্যাস (Jane Eyre) থেকে 'চিলেকোঠার নারী' (the woman in the attic) প্রতিমাটি এই কাজে ব্যবহার করেছেন। এই অনুপস্থিতি আসলে প্রতিস্থাপনের ঐতিহাসিক নিয়মাবলির বিবর্তনের সঙ্গে জড়িত। সব যুগেই নির্দিষ্ট কিছু সাংস্কৃতিক প্রথা ও প্রকরণ আছে যার দ্বারা বাস্তবকে উপস্থাপিত করা অনুমোদিত হয়। সেটাকে এক মতে বলা যায় নজরদারি (Surveillance), অন্যমতে মতাদর্শগত শৃঙ্খলা বা আধিপত্য (Ideological Apparatus/ Hegemony)। যেমন বঙ্কিমচন্দ্র কখনো প্রেমের যৌনতা প্রত্যক্ষভাবে ঘটমান আখ্যানের মধ্যে আনেননি; প্রবল ইন্দ্রিয়াসক্তি বা তীব্র কামনা তাঁর রচনার মধ্যে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তিনি অনেক মানবিক মুহূর্ত গল্পের মধ্যে আনতে পারেননি, ইঙ্গিতে সেরে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের গল্প ও উপন্যাস মোটামুটি বঙ্কিমি আদলে তৈরি, বিবরণের স্বচ্ছতা সেখানেও সহজ রূপ পায়নি। বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত ধারণা ছিল যে বাঙালি পাঠক-পাঠিকা প্রেমের গল্পে আকৃষ্ট, কিন্তু যৌনতা বিষয়ে তাদের রুচি ব্রাহ্মসমাজী রক্ষণশীলতায় ভারাক্রান্ত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সারা পৃথিবীতেই শিষ্ট সমাজের রুচি বদলাতে শুরু করে; তারপর থেকে তো রাখঢাক প্রায় উঠে গিয়েছে। কিন্তু প্রেম ছাড়াও তো গুরুত্বপূর্ণ অনেক অধ্যায় মানুষের জীবনে আসে যার প্রতিস্থাপন ছাড়া জনাবর্তের সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক জীবন সম্পূর্ণতা পায় না। কিন্তু সেখানেও কাজ করে আধিপত্য, যেটা শ্রেণিবিভাজনের লক্ষণ।

কাব্য উপন্যাস নাটক সিনেমা ইত্যাদির মধ্যে যা নাটকীয় বা প্রকাশিতব্য তার আড়ালে একটা জগৎ আছে যাকে বলা যায় দৈনন্দিন। সেটি হল মানুষের সাদামাটা 'প্রাত্যহিক জীবন'। (গত কয়েক দশক ধরে পশ্চিমি সমাজতত্ত্বে এই Everyday Life নিয়ে তুমুল আলোচনা হচ্ছে, সেই আলোচনা আবার নারীবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট)। সেই জগতে মানুষ জন্মায় আর মরে, জুটলে পরে ভাত-ডাল-মাছ খায়, বাজার করে, ঘর ঝাঁট দেয়, নোংরা পরিষ্কার করে, ঘুম পেলে ঘুমোতে চায়, খিদে পেলে খেতে চায়, কাজ থাকলে কাজে যায়; সেখানে প্রাকৃতিক নিয়মে নর-নারীর

মধ্যে আকর্ষণ ঘটে, বিয়ে হয়, সন্তান জন্মায়, তাদের মানুষ করতে হয়; সেখানে অসুখ-বিসুখ হয়, পয়সা থাকলে ডাক্তার-বদ্যি আসে, মা-বউদের কাছে কারণে-অকারণে সেবা-যত্ন চাওয়া হয়। এই দৈনন্দিন জীবন কেবল গার্হস্থ্য বা সাংসারিক নয়। এর অনেক রকম মাত্রা আছে— অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক। কিন্তু গার্হস্থ্য জগৎ মূলত মেয়েদের এরকম একটা ধারণা প্রচলিত আছে, উলটো দিকে বাইরের পৃথিবী হল ছেলেদের আওতায়। এই বিভাজন একটা অনুশাসনের মতো নারীর জীবন নিয়ন্ত্রণ করে; তার রোজগার নেই, সে আশ্রিতা। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন আমাদের দেশে বেশিরভাগ প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ রোজগারের ধান্দায় বাইরে বেরোয়, বেশিরভাগ মেয়ে আবার ঘরকন্নায় বাঁধা থাকে। কিন্তু সেটাও তো শ্রমের জগৎ, গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদনের জায়গা। জল আনার জন্যই গাঁয়ের মেয়ে-বউ নিত্য ঘর-বার করে, খরার দেশে অনেক জায়গায় রান্না-খাওয়ার জল আনতে দূরে দূরে যেতে হয়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে যায়; জ্বালানির পাতা-কাঠ-কুটো কুড়িয়ে আনতে হয়, ঘরের পাশে ফল বা সবজি ফলাতে হয়, ধান-রোয়ার আর কাটার সময় মাঠে যেতে হয়, গরু-ছাগল-হাঁস-মুরগি থাকলে দেখাশোনা করতে হয়; কাপড়-কাচা, বাসন-মাজা, ঘর-ঝাঁট, ধোয়া-মোছা-নিকানো, ধান-চাল ঝাড়া-বাছা-তুলে রাখা মেয়েদের কাজ। আর আসল কাজ বলতে তো ধরতে হবে রান্নাবান্না, খাদ্যের জোগান, যাতে শ্রমক্ষমতার পুনরুৎপাদন সম্ভব হয়। অন্য একটা মস্ত বড়ো কাজ হচ্ছে সন্তান উৎপাদন এবং লালন-পালন, যাতে শ্রমিকের জোগানে ভাঁটা না পড়ে। তার মূলে আবার আছে বিবাহের মধ্যে যৌন পরিষেবার সংস্থান, যেটা অনেকসময় বিয়ে বা পরিবারের সীমা ছাড়িয়ে বাজারে ছড়িয়ে যায়, একদল হতভাগিনীকে যৌনকর্মী হতে বাধ্য করা হয়। নারী-পাচার এখন সংগঠিত বাণিজ্যের আকার নিয়েছে। তদুপরি এখন মেয়েরা পেশাদার কাজের জগতেও সক্ষম এবং সক্রিয়। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাড়ির মেয়ে-বউরা কাজ করতে বেরোচ্ছে সেটা শহরে পরিচিত দৃশ্য তো বটেই, গ্রামের দিকেও বিবিধ কর্ম-সংস্থানের প্রকল্পে বা বেসরকারি শিল্প বাণিজ্যে মেয়েদের জন্য একটা অসংগঠিত ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে; সামান্য আয়ে হাড়ভাঙা খাটুনি বলতে কী বোঝায় সেটা মুর্শিদাবাদের বিড়ি-বাঁধা মেয়েদের বা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার নিত্যযাত্রী কাজের মাসিদের অবস্থা দেখলেই বোঝা যায়। দৈনন্দিন জীবনের ভিতরে হোক বাইরে হোক শ্রমের অর্থনৈতিক নাগপাশ থেকে মেয়েদের মুক্তি নেই।

এই বাস্তব কিন্তু বহুকাল পর্যন্ত শিষ্ট সংস্কৃতির সদরে অনুপস্থিত ছিল; দরজায় ঘা পড়লেও আগল খোলেনি। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য, ছড়া, ব্রতকথা, পাঁচালি ইত্যাদিতে যার উপস্থিতি সাদরে গৃহীত, তার ভূমিকা মান্য সংস্কৃতিতে অনুপস্থিত। নারীর উপস্থিতি পুরুষের আকাঙ্ক্ষিত বৃত্তের মধ্যেই আটকে থাকবে, সৌন্দর্য সভ্যতা মমতা সহিষ্ণুতা শিষ্টতা বদান্যতা তার নির্ধারিত সীমানা, হয়তো আমন্ত্রণ বা রহস্য থাকবে তার অনির্দেশ্য মননে, হয়তো পুরুষের কাছে তার আবেদন প্রকট হবে হাস্য-লাস্য ঠসক-ঠমক ছলা-কলায়, কিন্তু পিতৃতন্ত্রের নিয়মের বাইরে তার অস্তিত্ব অনাকাঙ্ক্ষিত এবং অনাবশ্যক। গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি, যার কথা দিয়ে এই আলোচনা শুরু হয়েছিল, কাজ করে এইসব নেপথ্যবাসীকে নিয়ে।

ইদানীং অবশ্য অতিকথা-লোককথা-ছড়া-লোকগীতি-মহাকাব্যের স্থান আর আগের মতো নেই, সেই জায়গাটা সশব্দে দখল করে নিয়েছে গণমাধ্যমের হরেক রকম প্রত্যঙ্গ। কিন্তু সেটা আরেক রকম গল্প।

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়

যশোধরা রায়চৌধুরী

সাম্প্রতিক এক ঘটনার বিষাদসর্বস্ব তিক্ত হাস্যরস দিয়ে গল্প শুরু করি। ঘটনাটা কোনো বন্ধুর স্বকর্ণে শোনা, গড়িয়াগামী এক মেট্রোর কামরায়। কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশন আসছে, কামরার ভেতরে এই ঘোষণা শুনে আমার বন্ধুর সামনে বসা মা আর ছেলের মধ্যে সামান্য উশখুশ। ছেলে জিজ্ঞাসা করে, মা, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু কবিতাও লিখতেন? মায়ের অকাতর উত্তর, হ্যাঁ হ্যাঁ লিখতেন নিশ্চয়ই। নাও, এবার উঠতে হবে। বাড়ি গিয়ে হোম ওয়ার্ক নিয়ে বসতে হবে।

কবি সুভাষ। এই কবি কে? কেবলই এক মেট্রো স্টেশনের নাম ছাড়া আর কীই-বা রয়ে গেল তাঁর উত্তরাধিকার, আমাদের বাঙালিদের কাছে? কলকাতাবাসীর কাছে? আপামর ভারতীয়ের কাছে? এই সুভাষ, যে সুভাষ মুখোপাধ্যায়, এবং তিনি আমাদেরই সময়ের, বা বলা ভালো বিংশ শতকের এমন এক বাঙালি কবি যিনি লেখার জন্য জীবনকে, ভালোবাসাকে, শরীরের শেষ রক্তবিন্দুকেও উৎসর্গ করেছিলেন, লেখার এবং মানুষের জন্য, বা বলা ভালো, মানুষের জন্য লেখার কারণেই।

এসব গালভরা কথা। শুনতে বড়ো ভালো। সকলেই জানে যে গাল ভরা কথারা বস্তুত পোশাক পরা মিথ্যে হয়। কিন্তু এই একটি বারের জন্য, বিশ্বাস করুন, মানুষের জন্য তিনি লিখতেন, বা লেখার জন্য তিনি সর্বস্ব দিতেন, লিখতে গিয়ে মনে হচ্ছে এসব শব্দও আসলে বার বার হেরে যাচ্ছে, সেই সত্যের কাছাকাছি পৌঁছোতেই পারছে না যার নাম সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

মিথের মতো, গল্পকাহিনির মতো, আশ্চর্যের মতো এই কবি। যাঁর ঝাঁকড়া এক মাথা সাদা চুল যেন রুপো দিয়ে মোড়া কোনো রূপকথার ব্যক্তির আদলে। যিনি পরিষ্কার ফতুয়া বা পাঞ্জাবির সঙ্গে ময়লা পাজামা পরে কবিসম্মেলনে গেছিলেন, যিনি ভদকার সঙ্গে আলুর দম খেতেন। এসব গল্পগাথায় আমার আপত্তি নেই। তবে আপত্তি এখানেই, যে, শেষপর্যন্ত আমাদের অনেক বড়ো বড়ো উত্তরাধিকার শুধুই এই ধরনের খুচরো গল্পগাথার অন্তর্গত হয়ে যান। হাসিঠাট্টা, বিনোদন ও চটুলতার বিষয় হয়ে যান। অথবা ব্যক্তিপূজনের আড়াল থেকে চলে যায় আসল সেই মূর্তি। তাঁর কাজের, তাঁর প্যাশনের, তাঁর অনন্ত পরিশ্রমের আদল।

এমন কোনো সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে কি আমরা মনে রাখি, যিনি বজবজে গিয়ে বাসা ভাড়া করে থেকে গিয়েছিলেন স্ত্রী গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে, কেননা, তাঁর মনে হয়েছিল সেভাবেই একমাত্র খেটে খাওয়া মানুষের কথা লেখা যায়, তাদের জন্য কাজ করা যায়? চটকল শ্রমিকদের গেট মিটিং-এ গিয়ে, সারাদিন তাদের সঙ্গে কাটিয়ে, তারপর কলকাতার নানা কাজ করে ফিরে এলে দিনান্তে, উঠোনে বসে শ্রমিকদের সঙ্গে ভাগ করে খাবার খেলে তবেই লেখা যায় সালেমানের মা-এর মতো কবিতা। সালেমানের বাবা বাবর আলির ঘোলাটে চোখ না দেখলে লেখাই যায় না, পাগল বাবরালির চোখের মতো আকাশের কথা।

আমাদের সমস্যা, আমরা সুভাষের জীবনে এটা ওটা সেটাকে কিংবদন্তি করে রাখতে যেমন শিখে গিয়েছি, এয়ার কন্ডিশনড ঘরে বসে এইসব মণিমুক্তোখচিত, জীবন থেকে আঁশগন্ধ সমেত উঠে আসা কবিতা থেকে টুকে টুকে, নকল কবিতাও লিখতে শিখে গিয়েছি।

আমরা আরো ভুলে গেছি, তাঁর দু-হাতে বাংলা ভাষার জন্য কাজ করার কথা। তাঁর শিশু-কিশোরদের জন্য অগণ্য লেখার কথা। সন্দেশ পত্রিকা সত্যজিৎ রায়ের পাশাপাশি হাল ধরে সম্পাদনার কথা। আরো কত যে কথা। যা বহুবর্ণ বহুমুখী এক ভাষাশ্রমিক ভাষাপ্রেমিক ভাষাকর্মীর কথাই শেষ অব্দি।

তাঁর আত্মার ভেতরের কথাটি, যে ভাষা আসলে কথা বলার জন্য, সংযোগের জন্য। মানুষের কাছে বোধগম্যতা ভাষার অন্যতম মাপকাঠি। তাই দুর্বোধ্য, আত্মকেন্দ্রিক ভাষাচর্চার উলটো দিকে গিয়ে, এক দেশজ শব্দে আকীর্ণ, অন্যরকম সাবলীল বাংলা ভাষাকে তিনি আত্মস্থ করলেন শুধু নয়, ছড়িয়ে দিতে লাগলেন সেই দর্শনকেও। মানুষের সঙ্গে মিশে যেতে পারার জন্য ভাষাকে অস্ত্র বা আবহ হিসেবে ব্যবহার করার অভ্যাস করলেন বলেই, ছত্রে ছত্রে ত্যাড়াব্যাঁকা, ঠাঁইনাড়া,

ঠেকো, আজগুবি, আঁটঘাটের মতো আটপৌরে শব্দকে তিনি অনায়াসে স্থান দিলেন নিজের গদ্যে, সমাজমান্য, তৎকালিক পণ্ডিতের তদ্ভব ও তৎসম শব্দের পাশাপাশি। তিনিই লিখতে পারেন, "শুধু রূপ নয়, স্বাদ গন্ধ স্পর্শকেও শব্দের মধ্যে ধরে দিই। আকার বুঝিয়ে দিই "প্র-কা-ণ্ড" আর 'ছোট্ট' বলে। 'টক-টক', 'ভ্যাপসা-ভ্যাপসা', 'খশখশে' বলে স্বাদ গন্ধ স্পর্শের আদল দিই। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কলমে তাঁর নিজের কথা নিজের কবিতা থেকে শুরু করে তাঁর অনুবাদগুলি যে এত সরল এত সাবলীল এত প্রাণসার.... তার কারণই তাঁর ভাষা। এমনকী তাঁর বিজ্ঞাপন লেখার গল্পও আজ প্রবচনের মতো। এসব প্রবচন রয়ে যাবে শুধু, ব্যক্তিগত থেকে ব্যক্তিগততর, দুর্বোধ্য থেকে দুর্বোধ্যতর হয়ে ওঠা বাংলা কবিতা বাংলা লেখালেখির দুনিয়ায়, তাঁর কাছ থেকে নেবার মানুষ এত অল্প কেন হয়ে উঠবে?

এছাড়া আরো যা বেদনার তাও এক নিশ্বাসে বলে ফেলে অন্য প্রসঙ্গে যাওয়াই ভালো। সেই যিশুর বিষয়ে ঠাকুরের বলা কথাগুলোই সুভাষ মুখোপাধ্যয়ের ক্ষেত্রেও সত্য। একদিন যারা মেরেছিল তাঁরে গিয়ে, রাজার দোহাই দিয়ে/এযুগে তারাই জন্ম নিয়েছে আজি/মন্দিরে তাঁর এসেছে ভক্ত সাজি... ইত্যাদি ইত্যাদি। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কমিউনিস্ট দশা যেরকম আত্যন্তিক নিষ্ঠার ও বিশ্বাসের, ততখানিই আত্যন্তিক বেদনার ও ক্ষোভের তাঁর পার্টিবদলের ইতিহাস, অবশ্যই সে কারণ আমাদের মতো তুচ্ছ মানুষের বোধগম্যতার বাইরে। কিন্তু আশেপাশে তাঁকে নিয়ে যে নিন্দা অপমান ও অবহেলার নমুনা দেখেছেন সে সময়ের আপামর মানুষ, তাঁকে উপেক্ষার যে ঝড় বয়েছে, সেইসব আজ স্তিমিত। শতবর্ষে তাঁকে উদারভাবে আবার প্রশংসা করার মানুষের অভাব হচ্ছে না। এইসব মানুষরা নিজেরাই একই জন্মে দু-রকম মুখ বা মুখোশ পরিধান করেছেন বলেই, এঁদের ভালো বা মন্দ বলায় কিস্‌সু এসে যায় না সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের। এ বিষয়ে দেবেশ রায়ের বলা কথাটিই আবার বলতে হয়, 'শোনা যায়— সুভাষ মুখোপাধ্যায় নাকি শেষজীবনে কমিউনিস্ট পার্টি ছেড়ে দিয়েছিলেন।'

এই গুজব এখনও চালু। শুনলে একটা সত্যিকারের ঘটনা মনে পড়ে। অক্টোবর-নভেম্বর বিপ্লবের পর দেশের হাল দেখে মাক্সিম গোর্কি এক কাগজ বের করে বিপ্লব ও কমিউনিস্টদের মুণ্ডুপাত করছেন। পার্টির মাতব্বররা লেনিনের কাছে গিয়ে বললেন— গোর্কিকে পার্টি থেকে তাড়াতে হবে। একেবারে সেন্ট্রাল কমিটির সভা ডাকা হল। সবার বক্তৃতার শেষে লেনিন বলতে উঠলেন। অসামান্য সংক্ষিপ্ততম ভাষণ, একটু চাপা গলায়, একটু হাসি মিলিয়ে, 'রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণি কি গোর্কিকে হারাবার দায় নিতে পারে? গোর্কির কাছে যান, পার্টিকে তার লেখককে খুঁজে বের করতে হয়।'

ইংরেজিতে কথাটা আরো সুন্দর ছিল, 'ক্যান দি রাশিয়ান প্রলেটারিয়েট অ্যাফর্ড দু লুজ ম্যাক্সিম গোর্কি? গো টু হিম। পার্টি মাস্ট গো টু ইটস পোয়েট। ইন মাস্ট নট বি আদারওয়াইজ।'

....মার্ক্স তো কথায় কথায় দান্তে আওড়াতেন। ফ্রান্সের কমিউন নিয়ে একটি লেখায় লিখছেন, দান্তেকে উদ্ধৃত করে, 'আমাদের যদি পার্টির অভাব হয়, বরং আমরাই কবির কাছে যাব।'

(শতবর্ষে সুভাষ মুখোপাধ্যায় দ্বি: সংখ্যা। এই সময়। রবিবারোয়ারি। ৪ মার্চ ২০১৮।)

আমাদের বিপর্যয়, আমাদের ট্র্যাজেডি, আমাদের ভাগ্যহীনতা এতটাই। আমাদের ফিরে যাওয়ার দায় আর ভুলে যাবার পাপবোধ অপরিসীম থেকে যায়।

দুই

ভাগ্যক্রমে এই অধমের ইস্কুল জীবনে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার আলাপ ব্রাউন পেপারের মলাট দেওয়া বই, ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত "সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা" দিয়ে। এ বই আমার পিতৃদেবের কেনা। বইটির প্রকাশক ছিলেন নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। বইয়ে সব কবিতা তাঁর প্রথম বই পদাতিক (১৯৪০) থেকে সার দিয়ে সাজানো। প্রথম দুটি কবিতা, সকলের গান আর মে-দিনের কবিতা। প্রথম লাইনদুটি যথাক্রমে 'কমরেড, আজ নবযুগ আনবে না' আর 'প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য'।

হার্ডকোর পার্টিলাইনার সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার আলাপ কিন্তু এতটুকু কঠিন হয়নি, বয়স যখন এগারো বা বারো, তখনই তিনি সেঁধিয়ে গেছেন আমার মননে.... কত না সহজে। এই সংযোগের অসামান্য ক্ষমতা ছিল বলেই আজও বই না দেখে গড়গড় করে বলে যাওয়া যায় তাঁর কত না লাইন।

তাঁর প্রথম দিকের কবিতা থেকে যত যাত্রা হয় পরবর্তী কবিতার দিকে, তত যেন বেশি করে চেনা লাগে তাঁকে। কেননা চল্লিশের দশকের কমরেড যিনি নবযুগ আনবেন, ভাঙবেন পুরোনো ভাবনাকে তীক্ষ্ম শ্লেষের শলাকায়, পরের দিকে যেন প্রেমিক বেশি করেই, আর আরো আত্তীকরণ করেছেন মিছিল আর মানুষ আর আন্দোলনকে জীবনের ভালোবাসার ভূমির সঙ্গে। যেন নমনীয় যত তত জীবন্ত তখন, যখন লেখেন 'মিছিলের মুখ', লেখেন 'আমি আসছি' (আকাশে তাকালাম/তোমার মুখ/চোখ বন্ধ করলাম/তোমার মুখ/বজ্রকে বধির করে তুমি আমায় ডাকছ) আমাদের রক্তে যেন দোলা দেয় সেই প্রেম। প্রেমের অন্যরকম মানে বুঝতে পারি সে বয়সে। যখন আমরা বেড়ে উঠছি।

আর পুরোনো এই বইয়ের প্রায় মাঝামাঝি নাজিম

হিকমতের কবিতা থেকেই আমাদের ডায়েরি ভরে উঠেছে কোটেশনে। ইস্কুলে নিয়ে প্রিয় বান্ধবীকে পড়িয়েছি, এমন এক কৈশোরে যখন প্রেম আর বীরগাথা একইসঙ্গে গেঁথে বসছে মনে। আদর্শ আর রোমান্টিকতার একটা অদ্ভুত মাখো মাখো বোধ এই অত্যাশ্চর্য অনুবাদ এনে দিচ্ছে।

জেলখানার চিঠির সেইসব অমোঘ লাইন: প্রিয়তমা আমার, /তোমার শেষ চিঠিতে/তুমি লিখেছো:/মাথা আমার ব্যথায় টনটন করছে/দিশেহারা আমার হৃদয়।/তুমি লিখেছো:/যদি ওরা তোমাকে ফাঁসি দেয়/ তোমাকে যদি হারাই,/আমি বাঁচবো না। /তুমি বেঁচে থাকবে প্রিয়তমা বধূ আমার/আমার স্মৃতি কালো ধোঁয়ার মতো হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে/তুমি বেঁচে থাকবে, আমার হৃদয়ের রক্তকেশী ভগিনী,/বিংশ শতাব্দীতে,/মানুষের শোকের আয়ু/বড়জোর এক বছর।/মৃত্যু..../দড়ির একপ্রান্তে দোদুল্যমান শবদেহ/আমার কাম্য নয়, সেই মৃত্যু।/কিন্তু প্রিয়তমা আমার, তুমি জেনো/জল্লাদের লোমশ হাত/যদি আমার গলায়/ফাঁসির দড়ি পরায়/নাজিমের নীল চোখে ওরা বৃথাই খুঁজে ফিরবে ভয়। /অন্তিম ঊষার অস্ফুট আলোয়/আমি দেখব, আমার বন্ধুদের, তোমাকে দেখব।/আমার সঙ্গে কবরে যাবে/শুধু আমার/এক অসমাপ্ত গানের বেদনা।

অথবা, 'বিচার সবেমাত্র শুরু হয়েছে/আর মানুষের মুণ্ডুটা তো বোঁটার ফুল নয়/যে ইচ্ছে করলেই ছিঁড়ে নেবে।/ও নিয়ে ভেব না/ওসব বহু দূরের ভাবনা/হাতে যদি টাকা থাকে/আমার জন্যে কিনে পাঠিও গরম একটা পাজামা/পায়ে আমার বাত ধরেছে।/ভুলে যেও না/ স্বামী যার জেলখানায়/তার মনে যেন সব সময় স্ফূর্তি থাকে/বাতাস আসে, বাতাস যায়/ চেরীর একই ডাল একই ঝড়ে/দু'বার দোলে না।'....

'আমাদের ছেলেটা বিছানায় শয্যাগত/বাপ তার জেলখানায়/তোমায় ভারাক্রান্ত মাথাটা ক্লান্ত হাতের উপর এলানো/আমি আর আমাদের এই পৃথিবী একই সুচাগ্রে দাঁড়িয়ে। /দুঃসময় থেকে সুসময়ে/মানুষ পৌঁছে দেবে মানুষকে/আমাদের ছেলেটা নিরাময় হয়ে উঠবে/তার বাপ খালাস পাবে জেল থেকে/তোমার সোনালী চোখে উপচে পড়বে হাসি.....'

'যে সমুদ্র সব থেকে সুন্দর/তা আজও আমরা দেখি নি। /সবথেকে সুন্দর শিশু/আজও বেড়ে ওঠেনি।/মধুরতম যে কথা আমি বলতে চাই/সে কথা আজও আমি বলিনি।'

অবলীলাক্রমে যেন বলে যাওয়া, লিখে যাওয়া এইসব লাইন। তাই কি, মাথায় গাঁথা আজও। আজও স্পষ্ট টের পাই বুকের মধ্যে বেজে ওঠা দ্রিমি দ্রিমি, এইসব বাক্যবন্ধে।

তো, সেই কৈশোর ছাপিয়ে যখন আমরা চলেছি তারুণ্যের দিকে, রাজনীতিও বুঝছি আধো আধো, কলেজে যাচ্ছি, ক্রমশ অন্য আরো কবিতা পড়ছি, তারপর ধীরে ধীরে 'কমিউনিস্ট' কবিদের আলাদা তাকে রাখছি, মণিভূষণ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পাশাপাশি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও আমাদের কাছে আলাদা এক মনোভূমি, মনের তলার মাটি, শক্ত হয়ে এঁটে বসা। এই মাটিতে শুধু সার জল পড়বে এর পর থেকে। আমরা শুধু আমাদের প্রিয় কবির একের পর এক কবিতাকে কাছে থেকে দেখব।

ইতিমধ্যে পোস্টারের মতো সর্বজন গ্রাহ্য, উল্লেখ্য, সহজ স্মৃতিধার্য হবে 'লোকটা জানলই না' বা 'ফুল ফুটুক না ফুটুক'।

'বাঁ-দিকের বুকপকেটটা সামলাতে সামলাতে হায় হায় লোকটার ইহকাল পরকাল গেল। অথচ আর একটু নীচে হাত দিলেই সে পেত আলাদিনের আশ্চর্য-প্রদীপ তার হৃদয় লোকটা জানল-ই না। তার কড়িগাছে কড়ি হল লক্ষ্মী এলেন রণপায়ে। দেয়াল দিল পাহারা ছোটলোক হাওয়া যেন ঢুকতে না পারে। তারপর একদিন গোগ্রাসে গিলতে গিলতে দু-আঙুলের ফাঁক দিয়ে কখন খসে পড়ল তার জীবন লোকটা জানল-ই না।' বসন্তকাল এলেই আমরা বলব, ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত। ভুলতে পারব না সেই বিয়ে না হওয়া মেয়েটাকে যে বারান্দায় দাঁড়ায় (গোটা পঞ্চাশ ষাট সত্তর দশকজুড়ে এই মেয়েরা বারান্দায় দাঁড়িয়েছে) আর সেই অসহ্য কোকিলকে। ফুটপাতে পা ডোবানো কাঠি কাঠি গাছটাকেও চোখের সামনে দেখতে পাব। ফুল ফুটুক না ফুটুক যখন গান হয়ে উঠল রেডিয়োতে সেই গান শোনার সৌভাগ্যও হয়েছে এই অধমের। ক্লাস সেভেন বা এইটে পড়ি হয়তো তখন।

পারুল বোন কবিতাটিও গান হয়েছিল, সে গানেও 'সোনার ধানের সিংহাসনে কবে বসবে রাখাল' এমন বাক্যে শিহরন আসবে। আশৈশবের পড়া সাত ভাই চম্পা আর পারুল বোনের গল্প চিরকাল শুনে থাকলেও নতুন করে সে গল্পে আমাদের মনে সাড়া পড়বে, জীবনে নাড়া পড়বে। তারপরই পাব দিয়েন বিয়েন ফুঃ-এর মতো লেখা। ছন্দের সঙ্গে বিষয়ের আশ্চর্য সম্পর্ক এ লেখায়। চমকে দেবে আমাদের। 'সুন্দর' কবিতাটায়, 'ভোঁ বাজতেই/মাথায় চটের ফেঁসো জড়ানো এক সমুদ্র/একটি করে ইস্তাহারের জন্যে/ উত্তোলিত বাহুর তরঙ্গে তোমাকে ঢেকে দিল/যখন তোমাকে আর দেখা গেল না.../তখনই/আশ্চর্য সুন্দর দেখাল তোমাকে।' এই লাইন থেকে প্রেমের অন্য অর্থ অন্য ব্যঞ্জনা খুঁজে পেয়ে যাবে।

তিন

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় কী কী পেতাম? অবশ্যই নাটক পেতাম। একটার পিঠে একটা ঘটনা আসত এক রকমের সাসপেন্সের পিঠে ভর করে। এই সাসপেন্সের বোধটা হয়তো তিনি পথেঘাটের জীবনযাপন থেকেই কুড়িয়ে নিয়েছিলেন। কেননা সাধারণ, খেটে খাওয়া মানুষের কথায় ভাবে ভঙ্গিতে

এই নাটুকেপনা আছে, তাদের গল্প বলায়, দৈনন্দিন মুড়ি চায়ের সঙ্গে রসিয়ে বলা ঘটনাক্রমের বিবরণেও আছে এই চাপা নাট্যরস। হাস্যরসের পাশাপাশিই। চূড়ান্ত খেটে খাওয়া দরিদ্র ও দুঃখী মানুষও দিনান্তে হাসে, নিজেদের মধ্যে সুখদুঃখের কথা কয়, তাদের দিন আনি দিন খাই-এর জীবনের সেই জিতে যাওয়াটার রস, এক শহুরে কিন্তু জ্ঞানত নিজেকে ডিক্লাসড করতে চাওয়া কবির আখরে আখরে ফুটত বলেই মনে করি। যেমন এই কবিতাটি:

থলির ভেতর হাত ঢেকে
শাশুড়ি বিড়বিড় ক'রে মালা জপছেন;
বউ
গটগট ক'রে হেঁটে গেল।
আওয়াজটা বেয়াড়া; রোজকার আটপৌরে নয়।
যেন বাড়িতে ফেরিঅলা ডেকে
শখ ক'রে নতুন কেনা হয়েছে।
সুতরাং
মালাটা থেমে গেল; এবং
চোখ দুটো বিষ হয়ে
ঘাড়টাকে হেলিয়ে দিয়ে যেদিকে বউ যাচ্ছিলো
সেইদিকে ঢ'লে পড়লো।

নিচের চোয়ালটা সামনে ঠেলে
দাঁতে দাঁতে লাগলো।
বিলক্ষণ রাগ দেখিয়ে
পরমুহূর্তেই শাশুড়ির দাঁত চোখ ঘাড় চোয়াল
যে যার জায়গায় ফিরে এল।
তারপর সারা বাড়িটাকে আঁচড়ে আঁচড়ে
কলতলায়
ঝমর ঝম খনর খন ক্যাঁচ ঘ্যাঁষঘিঁষ ক্যাঁচর ক্যাঁচর
শব্দ উঠলো।
বাসনগুলো কোনোদিন তো এত ঝাঁঝ দেখায় না—
বড় তেল হয়েছে।
ঘুরতে ঘুরতে মালাটা দাঁড়িয়ে পড়ল।
নোড়া দিয়ে মুখ ভেঙে দিতে হয়—
মালাটা একবার ঝাঁকুনি খেয়ে
আবার চলতে লাগল।

নাকে অস্ফুট শব্দ ক'রে
থলির ভেতর পাঁচটা আঙুল হঠাৎ
মালাটার গলা টিপে ধরল।
মিন্সের আক্কেলও বলিহারি!
কোত্থেকে এক কালো অলক্ষুণে
পায়ে খুরঅলা ধিঙ্গি মেয়ে ধ'রে এনে
ছেলেটার গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে চলে গেলো।

কেন? বাংলাদেশে ফরসা মেয়ে ছিল না?
বাপ অবশ্য দিয়েছিল থুয়েছিল—
হ্যাঁ, দিয়েছিল!
গলায় রসুড়ি দিয়ে আদায় করা হয়েছিল না?

এবার মালাটাকে দয়া ক'রে ছেড়ে দেওয়া হল।
শাশুড়ির মুখ দেখে মনে হচ্ছিলো
থলির ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে এই সময়ে
কী যেন তিনি লুকোচ্ছিলেন।
একটা জিনিস—
ক'মাস আগে বউমা—
মরবার জন্য বিষ খেয়েছিলো।
ভাসুরপো ডাক্তার না হলে
ও-বউ এ-বংশের গালে ঠিক চুনকালি মাখাতো।
কেন? অসুখ ক'রে মরলে কী হয়?
ঢণ্ডী আর বলেছে কাকে!

হাতে একরাশ ময়লা কাপড় নিয়ে
কালো বউ
গটগট গটগট ক'রে সামনে দিয়ে চলে গেল।
নাঃ, আর বাড়তে দেয়া ঠিক নয়।
'বউমা—'
'বলুন'
উঁহু, গলার স্বরটা ঠিক কাছা-গলায় দেওয়ার মত নয়
বড্ড ন্যাড়া।
হঠাৎ এই দেমাক এলো কোত্থেকে?
বাপের বাড়ির কেউ তো
ভাইফোঁটার পর আর এদিক মাড়ায় নি?

বাড়িটা যেন ঝড়ের অপেক্ষায়
থমথম করছে।
ছোট ছেলে কলেজে;
মেজোটি সামনের বাড়ির রোয়াকে ব'সে
রাস্তায় মেয়ে দেখছে;
ফরসা ফরসা মেয়ে—
বউদির মতো ভুশুণ্ডি কালো নয়।
বালতি ঠনঠনিয়ে
বউ যেন মা-কালীর মত রণরঙ্গিণী বেশে
কোমরে আঁচল জড়িয়ে
চোখে চোখ রেখে শাশুড়ির সামনে দাঁড়ালো।

শাশুড়ির কেমন যেন
হঠাৎ গা ছমছম করতে লাগল।
তাড়াতাড়ি থলির মধ্যে হাতটা লুকিয়ে ফেলে
চোখ নামিয়ে বললেন: আচ্ছা থাক্, এখন যাও।
বউ মাথা উঁচু ক'রে

গটগট ক'রে চলে গেল।
তারপর একা একা পা ছড়িয়ে ব'সে
মোটা চশমা কাঁথা সেলাই করতে করতে
শাশুড়ি এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়ে ভাবতে লাগলেন
বউ হঠাৎ কেন বিগড়ে গেল
তার একটা তদন্ত হওয়া দরকার।

তারপর দরজা দেবার পর
রাত্রে
বড় ছেলের ঘরে আড়ি পেতে
এই এই কথা কানে এলো—

বউ বলেছে: 'একটা সুখবর আছে।'
পরের কথাগুলো এতো আস্তে যে শোনা গেল না।
খানিক পরে চকাস চকাস শব্দ,
মা হয়ে আর দাঁড়াতে লজ্জা করছিলো।
কিন্তু তদন্তটা শেষ হওয়া দরকার—
বউয়ের গলা; মা কান খাড়া করলেন।
বলছে: 'দেখো, ঠিক আমার মতো কালো হবে।'
এরপর একটা ঠাস করে শব্দ হওয়া উচিত।
ওমা, বউমা বেশ ডগমগ হয়ে বলছে:
'কী নাম দেব, জানো?
আফ্রিকা
কালো মানুষেরা কী কাণ্ডটাই না করছে সেখানে॥'

এ লেখার শেষে এমন এক বিশাল আকাশ আর উদাত্ত মাঠ পাই, শিক্ষিত, বোধকে শাণিত রাখা সুভাষ মুখোপাধ্যায় আফ্রিকা শব্দটা দিয়ে কবিতাটিকে এক ঘরেলু কাহানি থেকে কতখানি খুলে বাইরের দিকে পাঠান, তা দেখে হতভম্ব হয়ে পাঠককে কেয়াবাত বলতে বাধ্য হতে হয়। এখানেই তিনি, তিনি।

পাবলো নেরুদার সঙ্গে তাঁকে তুলনা করা হয়তো যায়। কেননা সাম্যবাদের সঙ্গে প্রেমকে মেলাতে একমাত্র তিনিই পেরেছেন। আমার আরো মনে হয় ফরাসি কবি জাক প্রেভেরের সঙ্গেও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গভীর মিল। কবিতাকে ইন্টেলেকচুয়ালের স্যালঁ থেকে নামিয়ে পথে এনেছিলেন প্রেভের। একটি কঠিন শব্দ ব্যবহার না করার, গানের মতো সহজ সাবলীল পৌনঃপুনিক অথচ অমোঘ জীবনসম্পৃক্ত লেখা লেখার ক্ষমতায় সুভাষও তাই। অনিবার্য ও অমোঘ এক জগৎ তৈরি করেছিলেন সুভাষ তাঁর লেখায়। যা ছবিতে ততটাই ভারতীয় যতটা আন্তর্জাতিক। তাই কমিউনিজমের ধারণা কখনো তাঁর ওপর চাপানো কোনো ধারণাই নয়, যেমন রাশিয়া বা সিরিয়ায় ভ্রমণ করা কবিকেও কখনো বিদেশ ভ্রমণকারীর মতো রংচঙে দেখায়নি। বরং আমাদের দেশজ শব্দের ভেতর থেকে প্রতীক তুলে নিয়ে তিনি বিদেশি সাম্যবাদ/কমিউনিজম ইত্যাদি ধারণার সরল ভাবানুবাদ করে দিয়েছেন.... সাত ভাই চম্পা অথবা রাজা, রাখাল, বজ্র, আগুন আকাশের প্রতীক সহজে তাঁর বাহন হয়েছে। তিনি আদতে এক আন্তর্জাতিক মানুষ, এবং আপাদমস্তক ভারতীয়। গ্রহিষ্ণু, ইনক্লুসিভ।

চার

আত্মগরিমাহীন, নিজের প্রতি মায়া অথবা করুণা কোনোটাই না রেখে সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলতে পারতেন, 'আমি এ পর্যন্ত ভাষার ভেতর দিয়ে যা দিয়েছি, তার কিছুই আমার ভেতর থেকে আসেনি। সমস্তটাই আমার বাইরে থেকে পাওয়া। যা চোখে দেখেছি, কানে শুনেছি— তাই ফুটিয়েছি মুখের ভাষায়। এককথায়, পরের কাছ থেকে পাওয়া জিনিসটাই হাত বাড়িয়ে পরকে দিয়েছি। .... আমার এই দেওয়ানেওয়ার বাহন হল ভাষা। একেবারে ছোট থেকে নানান সূত্রে পাওয়া কথাগুলোতেই আমি আমার মনের রং লাগিয়ে পরে বাইরে ধরে দিই।.... কবিতায় কথাই সব। কথার নড়চড় হলে কবিতা হয় একেবারেই দাঁড়ায় না, নয় তার ভোল বদলে যায়।.... শব্দকে বলা হয় ব্রহ্ম।.... অণোরণীয়ান থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড— কথার খোলে সব কিছুরই ঠাঁই হয়। কথায় কী না হয়! ' (কী করে কী করে, টানাপোড়েনের মাঝখানে)

এখানে তিনি নিজেকে যথাসম্ভব ক্ষুদ্র তুচ্ছ করে দেখাতে চেয়েছেন তবু লেখক বা কবির যে শেষপর্যন্ত চয়েস বা বেছে নেবার স্বাধীনতাটি আছে, আর সেটাই শিল্পীর পরিচয়, সে কথা অস্বীকার করতে পারেননি। 'মনের রং' শব্দটা তাই এখানে জরুরি। এক কবি থেকে আর এক কবিতে এত ফারাক মনের রংগুলো আলাদা আলাদা বলেই। তাই সুভাষ তো সুভাষই!

তিনি লিখেছেন আত্মজৈবনিক লেখায় শৈশব কখন শুরু হয় কখন শেষ হয় জানা যায় না। তিনি লিখেছেন রাস্তা তাকে টানে। এ সবই রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রাণের ঠাকুর অন্যভাবে অন্য ভাষায় বলেছেন, অনেক বেশি দার্শনিকভাবে। কিন্তু সুভাষ মুখোপাধ্যায় যেন কবি হিসেবে সেই চিরশিশু, নিজের বেঁচে থাকার কথাই বলেছেন, যেমন তাঁর রাস্তা হাঁটার কথাতেও আমরা দেখতে পেয়েছি তাঁর হাঁটু অব্দি লালচে ধুলোকে, তাঁর উড়ন্ত চুলকে। পথ আর ঘরের সংঘাত রবীন্দ্রনাথের লেখায় এক আদর্শ, এক বিমূর্ত জিনিস। আর সুভাষ মুখোপাধ্যায় আমাদের কাছে ধরে দেন গোটা কলকাতা থেকে বজবজ, শহর থেকে শহরতলি, তার ধুলো ধোঁয়া মানুষ সবকিছুর প্রতি আসক্তিময় ভালবাসা-সহ।

পাঁচ

শেষের দিকে কেন তাঁকে লিখতে হয়, 'হয় না, মশাই, হয় না'-র মতো বিষণ্ণ লেখা? এ তো আমাদেরই বেদনা, বিফলতা, অন্ধকারের গল্প। 'আপনি কবি? কভি নেহি।/কী আপনি?

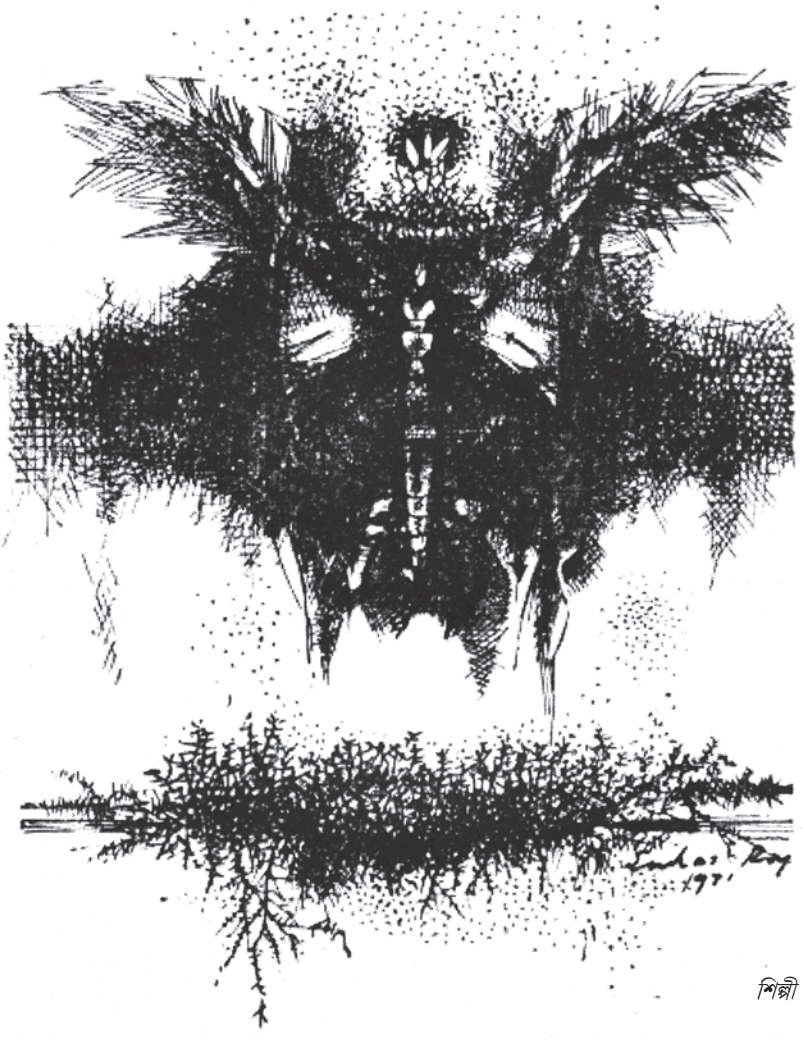

শিল্পী : সুহাস রায়

পদকার?/পেশা? পদসেবা। জাতে চামার।' এভাবে তাঁকে বলতে হয়েছে কেন। 'উঠতে বসতে ধরছে হাঁপ— /মনের কথা যদি বা আনি মুখে/শুনবে কেউ?/কী করে বলি খারাপ?'

সত্য বলতে না পারার বেদনা মৃত্যু পরান্ত ২০০৯-এ প্রকাশিত 'নতুন কবিতার বই' নামে চিহ্নিত খামে পাওয়া অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপির পাতায় পাতায় ধরে দিয়ে গেছেন তিনি। 'সাত চড়েও কোনদিন/কাড়েনিকো রা সে/মিছিলে মেলায়নি পা/গলা তার/মেলেনিকো কোরাসে/ দেওয়ালের এক কোণে/সে নিজের মনে/কেবল গুনেছে দিন/বেঁধে রেখে/ নিজেকে পেরেকে / একবারও / তার দিকে না তাকিয়ে/যাতে তোমরা মন দিতে পারো/শূন্যে সৌধ নির্মাণের কাজে। জানালা রেখো খুলে/ যেদিন সে খুলবে মুখ/দেখতে পাবে গলন্ত লাভার ঢেউ তুলে / দোর্দণ্ড প্রতাপে/গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে/ধাপে ধাপে/সব দুঃখ চাপা দিয়ে সুখ।'

এক কবি তাঁর সুবিশাল লেখার ভাঁড়ার রেখে যান শুধু। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে আমরা তা থেকে গণ্ডূষ তুলে নেব বলে। পাশাপাশি রয়ে যাবে তাঁকে নিয়ে গল্পকাহিনি। তাঁর বিশাল দরাজ বুকে এঁটে যাবে সব। তারপরেও থেকে যাবে অনেকটাই। আমাদের দেখা না দেখা সেই সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে দেখতে পাবে অন্য কেউ, অনেক পরে হয়তো-বা।

যে বিপ্লব সুরে আছে কিন্তু কথায় নেই

অরুণ সোম

১৯৯১ সালের ২৫ ডিসেম্বর মধ্যরাতে সোভিয়েত ইউনিয়নের লাল পতাকা নামিয়ে দেওয়া হল ক্রেমলিনের চূড়া থেকে, তার স্থান নিল রুশ ফেডারেশনের তেরঙা পতাকা। ভেঙে গেল সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র-সমূহের ইউনিয়ন। কিন্তু নতুন দেশের জাতীয় সংগীত নির্বাচনের কাজটি সহজসাধ্য হল না। দীর্ঘ নয় বছর বহু তর্কবিতর্কের অবসান ঘটিয়ে শেষপর্যন্ত ২০০০ সালের ১৯ ডিসেম্বর অনুমোদিত হল সে দেশের নতুন জাতীয় সংগীত। ফিরিয়ে আনা হল কথা পালটে এবং নতুন কথার খাতিরে দু-এক জায়গায় সুরের সামান্য পরিবর্তন ঘটিয়ে পুরোনো সোভিয়েত জাতীয় সংগীত, যা অর্ধ শতাব্দীরও বেশি আগে— ১৯৪৪ সালের ১ জানুয়ারি সে দেশের বেতারে প্রথম সম্প্রচারিত হয়েছিল। সেটা ছিল নববর্ষে দেশবাসীকে তৎকালীন সোভিয়েত রাষ্ট্রপ্রধান স্তালিনের উপহার। সুরকার আলেক্সান্দ্র আলেক্সান্দ্রভের রচিত এই সুরটি স্তালিন ব্যক্তিগতভাবে নির্বাচন করেছিলেন।

জাতীয় সংগীতের সুরটি যেহেতু একসময় স্তালিনের নির্বাচিত ছিল সেইজন্য বর্তমান রাশিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান এবং সে দেশের 'দুমা' বা সংসদের উচ্চকক্ষে তা পুনর্জন্মের সিদ্ধান্ত দেশের কোনো কোনো সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক মহলের বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিল, কিন্তু দেশের অধিকাংশ জনসাধারণেরই তাতে সমর্থন ছিল।

সংগীতের ক্ষেত্রে এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সংগীতের ব্যবহার সম্পর্কে স্তালিন একেবারে অজ্ঞ ছিলেন না। বস্তুত তাঁর অবসর বিনোদনের একটা প্রিয় উপায় ছিল গ্লিন্‌কা অথচ রিমস্কি কর্সাকভের অপেরা অথবা চাইকোভ্‌স্কির ব্যালে অনুষ্ঠান দেখা। ক্ল্যাসিকাল সংগীত সম্পর্কে তাঁর ভালো জ্ঞান ছিল। রাজকীয় বিদ্যালয়ে পড়ার সময় তিনি গির্জার বৃন্দগায়ক দলের অন্তর্ভুক্তও ছিলেন।

জাতীয় সংগীতের সুর নির্বাচনে স্তালিনের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল কতকটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। সুর নির্বাচন উপলক্ষে যে প্রতিযোগিতার আহ্বান জানানো হয়েছিল সেখানে দ্‌মিত্রি শস্তাকভিচ্‌ ও আরাম খাচাতুরিয়ানের মতো বিশ্ববিখ্যাত সোভিয়েত সুরকারের রচনাও ছিল। তাঁদের রচনার মৌলিকতার সর্বোচ্চ মূল্য ও মর্যাদা দেওয়া সত্ত্বেও স্তালিন শেষকালে একটি সহজ সুর বেছে নিয়েছিলেন। স্তালিন জানতেন মৌলিকতা ও উৎকর্ষ নয়, জাতীয় সংগীতের প্রধান গুণ হওয়া উচিত তার চমৎকারিত্ব ও মনোগ্রাহিতা। তাঁর কথায়, 'সুর এমন হওয়া উচিত যাতে একজন পাইওনিয়ার থেকে পেনশনার পর্যন্ত সকলে সঙ্গে সঙ্গে তা মনে রাখতে পারে।'

ঠিক এই গুণগুলিই সুরকার আলেক্সান্দ্রভের সুরে ছিল, তাই তা ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত রুশ ফেডারেশনেরও জাতীয় সংগীত হিসেবে চলে আসছিল।

পুরোনো জাতীয় সংগীত অনুমোদনের পক্ষে দুমার সামনে আরেকটি বড়ো সমস্যা ছিল জাতীয় সংগীতের অস্বস্তিকর কথাগুলি। মূল যে লিরিক তার যুগ্ম রচয়িতাদের মধ্যে একজন ছিলেন তখনকার দিনের উদীয়মান তরুণ কবি ও শিশুসাহিত্যিক সের্গেই মিখাল্‌কোভ্‌ (১৯১৩-২০০৯), অন্যজন এল্‌ রেগিস্তান নামে একজন অখ্যাতনামা কবি যাঁর লেখা দু-একটি কথা সেখানে ব্যবহৃত। স্তালিন নিজের হাতে এর পাঠ সম্পাদনা করেছিলেন।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ইতিপূর্বে ১৯১৮ থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত সোভিয়েত রাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত হিসেবে 'ইন্টারন্যাশনাল' প্রচলিত ছিল।

স্তালিন অনুমোদিত জাতীয় সংগীতের কথা সম্পর্কে বিখ্যাত সামরিক ঐতিহাসিক দ্‌মিত্রি ভল্‌কগোনভের মন্তব্য: স্তালিন ব্যক্তিগতভাবে জাতীয় সংগীতের পাঠ সম্পাদনা করেছিলেন। পিতৃভূমির ভাগ্য নির্ধারণে তাঁর যে ভূমিকা এই পাঠে তার প্রতিফলন ঘটেছে। রচয়িতারা নেতার আজ্ঞাক্রমে জাতীয় সংগীতের পাঠ প্রস্তুত করে তাঁর কাছে নিয়ে যান। স্তালিন সেই পাঠের কিছু কিছু জায়গা সংশোধন করে দেন। মূল পাঠের ওপর পেনসিল চালিয়ে স্তালিনের সংশোধিত এই পাঠ সে দেশের অভিলেখাগারে সংরক্ষিত আছে।

জাতীয় সংগীতে পার্টি সম্পর্কে একটি কথাও ছিল না— না থাকাটিই স্বাভাবিক; কিন্তু সরাসরি স্তালিনের নাম করে তার ওপর 'অধিনায়ক' কথাটির আরোপ বড়োই 'প্রয়োজনীয়' হয়ে পড়েছিল। ধীরে ধীরে সোভিয়েত মানুষদের মনের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেঁথে গেল যে স্তালিন শুধু পার্টিরই অধিনায়ক নন, তিনি 'জনগণমন অধিনায়ক'। বলাই বাহুল্য, আমাদের দেশের জাতীয় সংগীতের অন্তরিক্ষচারী অধিনায়ক তো আর সোভিয়েত দেশের 'জনগণমন অধিনায়ক' হতে পারেন না!

জাতীয় সংগীতের স্তালিন অনুমোদিত পাঠটি পরবর্তীকালে, নিঃস্তালিনীকরণের পর তুলে নেওয়া হয়। স্তালিনের মৃত্যুর পর থেকে ১৯৭৭ সালে যতদিন পর্যন্ত না স্তালিন প্রশস্তির অংশ বাদ দিয়ে তার ঈষৎ সংশোধিত পাঠ প্রকাশিত হয় ততদিন সোভিয়েত জাতীয় সংগীত 'বাক্যহারা' হয়ে ছিল। শুধু সংগীতই বাজানো হত। এই নতুন সংশোধিত পাঠেরও রচয়িতা ছিলেন সের্গেই মিখাল্‌কোভ্‌।

এই পাঠের অভিনবত্ব এখানেই যে পূর্ববর্তী পাঠে দুই ছত্রে যে স্তালিন প্রশস্তি ছিল এতে তা নেই। পরিবর্তে সেখানে যে গুণ স্তালিনের ওপর আরোপিত হয়েছিল অনেকটা তা-ই আরোপিত হয়েছে লেনিনের ওপর। দ্বিতীয়ত, পূর্ববর্তী পাঠে 'পার্টি' ও কমিউনিজমের কোনো উল্লেখ ছিল না, এখানে তা আছে।

কিছু কথা জুগিয়ে দেওয়ার পরও সোভিয়েত জাতীয় সংগীত প্রায় 'বাক্যহারা'ই রয়ে গিয়েছিল। বিশেষ গাওয়া হত না, সুরটাই বরাবর ধ্বনিত হত। তবে সে তো ওই একই সুর— স্তালিনের অনুমোদিত সুর।

পেরেস্ত্রৈকার আমলে এ সংগীত একেবারেই নির্বাক হয়ে গেল, যদিও সোভিয়েত ইউনিয়ন তখনও ছিল। কিন্তু ১৯৯০ সালে রুশ সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের (বলাই বাহুল্য, তখনও সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত একটি অঙ্গরাজ্য) প্রেসিডেন্ট তাঁর হুকুমনামাটিতে রুশ ফেডারেশনের স্বতন্ত্র জাতীয় সংগীতের অন্য একটি সুর অনুমোদন করেন— সেটা ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর খ্যাতনামা সুরকার গ্লিন্‌কার একটি অসমাপ্ত রচনার ভিত্তিতে ১৯৪৪ সালে সুরকার পরিচালক মিখাইল বাগ্রিনভ্‌স্কির একটি দেশাত্মবোধক গীতির সুর। অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন তখনও টিকে থাকায় সমান্তরালভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় সংগীতের সুর অপরিবর্তিতই রয়ে গেল। অবশ্য রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ্‌ প্রজাতন্ত্রের সেই নতুন সুরেও কোনো কথা ছিল না।

১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের ফলে আবারও জাতীয় সংগীতকে কেন্দ্র করে অনিশ্চিত অবস্থার সৃষ্টি হল। প্রায় বছর দুয়েক এই অবস্থায় চলার পর ১৯৯৩ সালের শেষে নতুন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ইয়েল্‌ৎসিন তাঁর নিজের নির্বাচিত সাবেক রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ প্রজাতন্ত্রের জাতীয় সংগীতটিকেই পুনর্বার হুকুমনামাবলে নতুন দেশের জাতীয় সংগীত রূপে ঘোষণা করলেন, যদিও পার্লামেন্টে তখনও তা অনুমোদিত হয়নি। রেডিয়ো, টেলিভিশনে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এবং স্টেডিয়ামে এই সুরই জাতীয় সংগীত হিসেবে বাজতে শুরু করল। কিন্তু এই সুরের মুখে ভাষা তো জোগানো গেলই না এমনকী অনেকে এমন অভিযোগও করল যে এ সুরও বহু জটিল এবং মনে রাখা দুঃসাধ্য।

১৯৯৩ সালের ১৪ জানুয়ারি জাতীয় সংগীতের কথা রচনার জন্য একটি কমিশন গঠিত হয়। সেই কমিশনের সভাপতি পদে নির্বাচিত হলেন সেই সের্গেই মিখাল্‌কোভ্‌, যিনি ১৯৪৪ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় সংগীতের কথা রচনা করেছিলেন, আবার ১৯৭৭ সালে তার সংশোধিত পাঠও রচনা করেছিলেন। ততদিনে তিনি আর তরুণ নন, এমনকী মাঝবয়সিও নন— বয়স তাঁর আশি। প্রথমবার তিনি তাঁর রচনার জন্য 'সমাজতান্ত্রিক শ্রমবীর অর্ডারে' ভূষিত হয়েছিলেন, সুরকার আলেক্সান্দ্র আলেক্সান্দ্রভ্‌ 'লেনিন অর্ডার' পেয়েছিলেন। এবারে ওরকম কোনো পুরস্কারপ্রাপ্তির সম্ভাবনা কারও নেই: পাঠ মনোনীত হলে তার রচয়িতার নগদ অর্থপ্রাপ্তি ঘটবে।

১৯৯৩ সাল থেকে শুরু করে প্রায় ৭ বছর ধরে জাতীয় সংগীতের কথা ও সুর নিয়ে ওপরের মহলে যখন তর্কবিতর্ক চলছে সেই সময়ের মধ্যে জনসমীক্ষায় দেখা গেছে দেশের অধিকাংশ মানুষেরই পুরোনো সুর সম্পর্কে আপত্তি তো নেই-ই, বরং তাঁরা মনে করেন ওই সুর গুরুগম্ভীর অনুষ্ঠানে বাজানোর খুবই উপযোগী। এখানে আরও উল্লেখযোগ্য এই যে, পুরোনো সুর পুনঃপ্রতিষ্ঠার পক্ষে ছিলেন যুব সম্প্রদায়ভুক্ত সেই সমস্ত ক্রীড়াকুশলী, যাঁরা ২০০০ সালের গ্রীষ্মকালে সিডনি ওলিম্পিক্‌সে যোগ দিয়েছিলেন, সেখানে প্রেসিডেন্টের অনুমোদিত সুরে তাঁরা উৎসাহ পাননি।

অবশেষে ঘুরে-ফিরে সেই পুরোনো সুর। ফিরে এল পুরোনো সুর। কিন্তু কথা? হ্যাঁ, কথা অন্য বটে, কিন্তু সেই কথা ঘুরে-ফিরে বলছেন সেই একই ব্যক্তি যিনি ইতিমধ্যে ৮৭ বছর বয়সে পদার্পণ করেছেন। সেই সের্গেই মিখাল্‌কোভ্‌— 'অবিনশ্বর সোভিয়েত ইউনিয়ন'-এর রচয়িতা।

এটাও দেশবাসীর কাছে নববর্ষের একটি উপহার। তবে প্রেসিডেন্ট পুতিনের উপহার— ২০০১ সালের নববর্ষের প্রাক্কালে— এর ঠিক এক বছর আগে প্রেসিডেন্ট ইয়েল্‌ৎসিন তাঁর হাতে ক্ষমতা প্রদান করে অবসর গ্রহণ করেছেন। তিনিও কিন্তু সেদিনকার সোভিয়েত রাষ্ট্রের কর্ণধারের মতোই জনগণের মনোনীত রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন না।

২০০০ সালের ২৯ ডিসেম্বর রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে

সম্প্রচারিত হল এই সংবাদ। নতুন পাঠের প্রথম স্তবকটি পড়ে শোনালেন স্বয়ং তার রচয়িতা সের্গেই মিখাল্‌কোভ্‌।

মিখাল্‌কোভ্‌ এই প্রসঙ্গে বললেন যে এই নতুন কথা লেখার জন্য তিনি গর্বিত। 'আজ অবশ্যই বিগত দিনগুলির কথা আমার মনে পড়ছে। সেগুলি আমার কাছে পরম আদরের, বড়োই আপনার। কিন্তু আমি বুঝি যে সে দেশ বদলে গেছে। রাশিয়া তার পক্ষ বেছে নিয়েছে। এখন আমি যা লিখেছি তা আমার হৃদয়ের খুবই কাছাকাছি, কারণ আমি অন্তর থেকেই লিখেছি এবং যা লিখেছি তা আমি বিশ্বাস করি।'

এই নতুন পাঠে অবশ্য জনগণমন অধিনায়কের কোনো ভূমিকা নেই— আছে শুধুই মহান পিতৃভূমির স্তুতি, তার শক্তিতে বিশ্বাস, যা অবশ্য আগের পাঠেও ছিল। আর রুশদেশে তো এমন একটি কথাও প্রচলিত আছে যে 'গান থেকে কথা বাদ দেওয়া যায় না।'

শিল্পী : শান্তনু মিত্র

EASTERN DIAGNOSTICS INDIA LTD.

ESTD 1996

(ISO 9001 : 2015 Certified & NABL Accredited)

13C, MIRZA GHALIB STREET. KOLKATA -16, Ph: 2217-8080/81

5B, ALIPORE PARK ROAD, KOLKATA - 27

Ph. : 2449-8080 / 81

E-mail: edrc@cal.vsnl.net.in Website: www.easterndiagnostics.com

1st In Eastern India

PET CT- SCAN

NABL ACCREDITED LABORATORY

(POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY)

because health deserve care

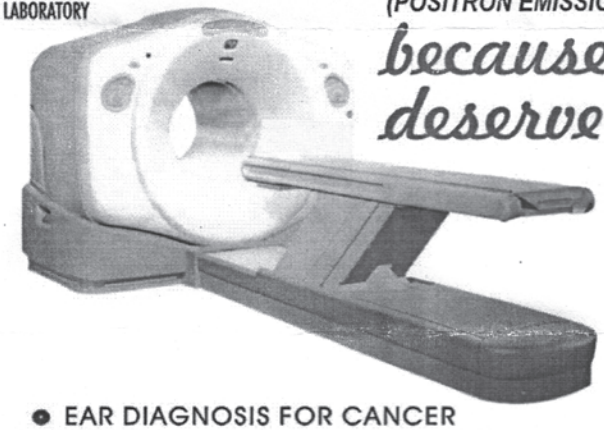

With First Full Silent MRI Machine In East at 5B, Alipore Park Rd., Kol. - 27

- EAR DIAGNOSIS FOR CANCER
- FOLLOW - UP OF TREATED CANCERS • INDICATES INFECTION OF UNKNOWN ORIGIN

Our areas of excellence

IMAGING
- Pet-CT Scan • MRI
- CT Scan • CT guided FNAC
- Digital X-Ray • Mammography
- Bone Densitometry
- 4D Ultrasonography
- US Guided FNAC

NEUROLOGY
- E.M.G / N.C.V
- E.E.G

PATHOLOGY
- Biochemistry
- Histopahology
- Cytopathology • Serology
- Haematology • Microbiology
- Clinical Pathology
- Drug Level Assay
- Hormone Assay

RESPIRATORY CARE
- Pulmonary Function Test (PFT)

CARDIOLOGY
- Echocardiography • Color Doppler
- Stress Test • Computerised ECG

DENTAL
- Conservative Dentistry
- Surgical Dentistry
- Endodentic Rx • Prosthodentics
- Periodentics • Paediatric Dentistry

Executive Health Check Up • Doctors Consulting Chambers

Timings : Monday to Saturday : 7.30am-8.30pm I Sunday : 7.30am-3.30pm

Home Collection Facility Available

অন্নদাশঙ্করের দ্বান্দ্বিক আদর্শবাদ

অভ্র ঘোষ

গান্ধীজির জন্মশতবর্ষে অন্নদাশঙ্করের লেখা একটি নিবন্ধের নাম 'দ্বান্দ্বিক আদর্শবাদ'। প্রবন্ধটি শুরু হয়েছে এইভাবে:

> গান্ধীবাদ যাকে বলা হয় তার প্রকৃত নাম দ্বান্দ্বিক আদর্শবাদ। যেমন মার্কসবাদ হচ্ছে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ। এই দুই মতবাদের মধ্যে একটি জায়গায় মিল আছে। সেটি হল এদের বিশেষণ পদ। উভয়েই দ্বান্দ্বিক।[১]

তবে এই দুই মতাদর্শে দ্বন্দ্বের পদ্ধতি একরকম নয়। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে মার্কসবাদীরা প্রয়োজন হলে হিংসার পথ গ্রহণ করেন। প্রয়োজনে অসত্যের পথেরও সুযোগ নিতে পারেন। কারণ চূড়ান্ত লক্ষ্যে বা end-এ পৌঁছোবার জন্য পথ বা means-কে সাধু হতেই হবে— এমন কোনো আবশ্যকতা নেই। কৌশলগত অসত্যের আশ্রয় নিতে হতেই পারে। তবে তা সবসময়ে নয়। যখন যতটুকু প্রয়োজন তখন এবং ততটুকু। কিন্তু দ্বান্দ্বিক আদর্শবাদ অসত্যকে সর্বদা পরিহার করে। হিংসাকে সর্বতোভাবে অধর্ম বলে মনে করে। দ্বান্দ্বিক আদর্শবাদ সম্পূর্ণ অহিংস। তাঁদের কাছে মীন্‌স জাস্টিফাই এন্ড।

এই দুই মতবাদে দ্বান্দ্বিক বিশেষণটি ছাড়াও আরও কিছু মিল আছে। মার্কসবাদ ও গান্ধীবাদ দুয়েরই প্রধান অন্বিষ্ট মানবহিত অর্থাৎ সামাজিক ন্যায় ও মানবিকতা। মানবসমাজকে শোষণের হাত থেকে উদ্ধারকল্পেই এই দুই মতবাদ স্পষ্ট হয়েছে। তবে গান্ধী জড়-বস্তুবাদকে স্বীকার করেননি। তাঁর চেতনায় ধর্ম ছিল, আধ্যাত্মিকতা ছিল। কিন্তু সে ধর্ম প্রাতিষ্ঠানিক তেত্রিশ কোটি হিন্দু দেব-দেবীর ধর্ম নয়। ঈশ্বরপ্রেমে মাখামাখি মানবিকতার ধর্ম। মঙ্গলবোধের ধর্ম। অন্নদাশঙ্কর লিখেছেন যে, একজন গান্ধীবাদী বা দ্বান্দ্বিক আদর্শবাদী আস্তিকও হতে পারেন, নাস্তিকও হতে পারেন বা অজ্ঞেয়বাদীও হতে পারেন। এসবে কিছু যায় আসে না। তবে তাঁকে হতে হবে মানবতাবাদী।

মানবসমাজের মুক্তির জন্য, মঙ্গল বা কল্যাণের জন্য মানুষকে বার বার দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতে হবে, ত্যাগের ব্রত গ্রহণ করতে হবে। সত্যাগ্রহী হতে হবে। আর উচ্চাশা ও কঠিন ব্রত হলেও তাকে অহিংস হতে হবে। সত্যাগ্রহকে হত্যাগ্রহের দিকে ঠেলে দিলে চলবে না। কাজটা কঠিন— সতত পরীক্ষানিরীক্ষা-নির্ভর। কিন্তু গান্ধী সত্যের সঙ্গে পরীক্ষানিরীক্ষা করে প্রমাণ করেছেন— সেটা বাস্তব, বিজ্ঞাননির্ভর। সত্যাগ্রহ ব্যক্তি-সত্যাগ্রহ হতে পারে, গণসত্যাগ্রহ হতে পারে। তবে সত্যাগ্রহীকে হতে হবে ত্যাগধর্মী, পরিশ্রমী ও সততানির্ভর কর্মী।

গান্ধীর মৃত্যু ঘটেছে ১৯৪৮ সালে। তিনি শহিদ হয়েছেন। কিন্তু গান্ধীর অহিংস দ্বান্দ্বিক আদর্শবাদের মৃত্যু যে পুরোপুরি ঘটেনি, তার প্রমাণ ভারতের বাইরে ইতালি, ফ্রান্স, আমেরিকাতে। সিসিলিতে সংঘবদ্ধ সত্যাগ্রহের চেষ্টা করেছিলেন দলচি, আমেরিকায় মার্টিন লুথার কিং। মার্কিন মুলুকে 'ক্যাথলিক ওয়ার্কার' নামে পত্রিকাও প্রকাশিত হত। যাঁদের প্রেরণা খ্রিস্টধর্মের আদি ঐতিহ্য। ভারতীয় অহিংস ঐতিহ্য নয়। কিন্তু তাঁরাও গান্ধীকে আপন করে নিয়েছেন। খ্রিস্টশিষ্য না মেলায় গান্ধীই তাঁদের আধুনিক পথপ্রদর্শক। আফ্রিকার নেলসন ম্যান্ডেলাকেও তো গান্ধীবাদী বলে অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে। অতএব দ্বান্দ্বিক আদর্শবাদ একেবারে অবাস্তব কিছু বস্তু নয়। পরিণামে কতটুকু সাফল্য মিলবে কি মিলবে না সে হিসেব করার বিশেষ তাৎপর্য নেই। পৃথিবীতে যুগ যুগ ধরে যে আদর্শবাদগুলি নিয়ত তৈরি হয়েছে, তার কোনটিই-বা সম্পূর্ণ সাফল্যের মুখ দেখেছে। রুশ বিপ্লবের পরিণাম তো জানি, ফরাসি বিপ্লবও কি সম্পূর্ণ সফল? গান্ধীবাদের ভবিষ্যৎ নিয়েও তাই চুলচেরা হিসেবের মানে নেই কিছু। আসল কথা হল, মানুষ যতদিন সুন্দর পৃথিবীর স্বপ্ন দেখবে ততদিনই আদর্শবাদ থাকবে— অন্যান্য দর্শনের মতো দ্বান্দ্বিক আদর্শেরও ভবিতব্য তাই।

একজন রোমান ক্যাথলিক আইরিশ পুলিশ অফিসার যিনি গোয়েন্দা বিভাগে উচ্চপদে ছিলেন, তিনি ১৯৪২ সালে অন্নদাশঙ্করকে বলেছিলেন,

> All his ideas are right. But he is two hundred years in advance of his time.[২]

গান্ধীজির নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক ধ্যানধারণাগুলি মনে রেখেই কথাগুলি বলেছিলেন। অন্নদাশঙ্কর খুব যে দ্বিমত ছিলেন এই বক্তব্যের সঙ্গে তা নয়। কিন্তু তিনি ভাবছিলেন মিরাক্‌ল তো হতে পারে। অর্থাৎ স্বাধীনতা আন্দোলনেও সেটা চাক্ষুষ করা যেতে পারে। মিরাক্‌ল অবশ্য হয়নি। এক অর্থে গান্ধী হেরে গেছেন। কিন্তু ওই হারেও সবটুকু শেষ হয়ে যায়নি। এখনও গান্ধীবাদের তাৎপর্য বা তার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা অব্যাহত। রূপায়ণ কতটুকু করতে পারলাম জানি না, কিন্তু রূপায়ণের সম্ভাবনা নিয়ে সংশয় বোধহয় লুপ্ত হয়নি। আসলে গান্ধী প্রাসঙ্গিক কি না সেটা প্রশ্ন নয়। আমরা গান্ধীকে প্রাসঙ্গিক করে তুলতে চাই কি না— প্রশ্ন সেটাই।

অন্নদাশঙ্কর গান্ধীজির মতবাদে সত্যাগ্রহের জোর দেখেছিলেন। বিশ্বাস করতেন যে ইংরেজ শাসকের 'মাইট ইজ রাইট' শেষপর্যন্ত টেঁকে না। টিঁকতে পারেওনি। বিশ্বসংসারে টিঁকে থাকে 'রাইট ইজ মাইট'। গান্ধী এই দ্বিতীয়টিতে আস্থা স্থাপন করেছিলেন। ন্যায় যার জোর তার— এই এপিক সংগ্রাম শুরু করেছিলেন গান্ধী, কিন্তু তিনি তাঁর সংগ্রামে শেষরক্ষা করতে পারেননি। গ্লোরিয়াস এন্ডিং হয়নি। গান্ধী নিজেই বলেছিলেন, গ্লোরিয়াস স্ট্রাগলের ইনগ্লোরিয়াস এন্ডিং। অন্নদাশঙ্কর লিখেছেন, গান্ধীজি স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে হতাশা ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি যাকে অহিংসা বলে ভ্রম করেছিলেন সেটা আসলে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ দুর্বলের অস্ত্র। দুর্বল যখন শক্তিমান হয়ে ওঠে, অন্য অস্ত্র হাতে পায় তখন সে হিংসায় ফেটে পড়ে। গান্ধীর মহতী আন্দোলন বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লেখক অবশ্য এই খেদোক্তিতে সম্পূর্ণ সায় দেন না, কিন্তু স্বীকার করেছেন যে, 'গান্ধীজি অতি সাধারণ মানুষের কাছে অতি অসাধারণ তপোবল প্রত্যাশা করেছিলেন।'[৩] একটা সময় পর্যন্ত ভারতীয়রা সমবেতভাবে অসাধারণ কাজ শুরু করতে পেরেছিল। কিন্তু তারপর তারা দু-ভাগে ভাগ হয়ে গেল। গান্ধীর জীবনেও ট্র্যাজেডি ঘটল। কিন্তু তাই বলে গান্ধীর সত্যাগ্রহ ভুল প্রমাণিত হয় না। ভারতের গণশক্তির উচ্চতা যে খানিক বেড়েছিল সেটা তাঁর নেতৃত্বের কল্যাণেই।

অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছেন, গান্ধী একবার এক জায়গায় বলেছিলেন, ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা একশো বছরের কাজ। কিন্তু সে কথা উচ্চারণ করার ত্রিশ-বত্রিশ বছরের মধ্যেই ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছে। অন্নদাশঙ্করের মতে, জাগতিক অবস্থা তার সহায়ক শক্তি ছিল। খুব বিস্তারে না গিয়েও লেখক বিজ্ঞানসম্মতভাবে ইতিহাস বিশ্লেষণ করেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ জার-শাসিত রাশিয়াকে বিধ্বস্ত না করলে লেনিনের পক্ষে বিপ্লব সফল করা সম্ভব হত না। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যে প্রথম মহাযুদ্ধ ধনতান্ত্রিক সভ্যতায় ফাটল তৈরি করেছিল। আর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা হয়েছিল তার সুযোগ নিয়েই। ঠিক সেরকমই, ১৯৩০-এর যুগে বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা-মুদ্রাস্ফীতি এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ব্রিটেনে শ্রমিক শক্তির জয় ঘটিয়েছিল। বিশ্বব্যাপী ধনতন্ত্রের সংকটও খানিকটা তৈরি হয়েছিল। পাশাপাশি প্রতিস্পর্ধী সমাজতান্ত্রিক শক্তির উত্থান আন্তর্জাতিক মানচিত্র পালটে দিয়েছিল। এরই ফলে ভারতের স্বাধীনতা কিছুটা ত্বরান্বিত হয়েছিল। অন্নদাশঙ্কর এর পরেই একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ অনুচ্ছেদ লিখেছেন তাঁর গ্রন্থে:

> দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ভারতের স্বাধীনতাকে বেশ কিছুদূর এগিয়ে যেতে সাহায্য করলেও অহিংস মতবাদের মহাক্ষতি করে। অহিংসার চেয়ে হিংসার প্রতিপত্তি বহুগুণ বেড়ে যায়। হওয়া উচিত ছিল এর বিপরীত। হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী শ্রান্ত হয়ে ক্লান্ত হয়ে কোথায় শান্তির ধ্যান করবে, না ধ্যান হলো হিংসা দিয়ে হিংসার সঙ্গে মোকাবিলা। রাশিয়ার সঙ্গে মার্কিনের, ব্রিটেনের সঙ্গে ভারতের, মুসলমানের সঙ্গে হিন্দুর। অহিংসা যেন চারদিক থেকে কোণঠাসা হয়। কোণঠাসা হয়ে সেবাগ্রামে নিবদ্ধ।[৪]

অন্নদাশঙ্কর গান্ধীবাদী চিন্তক। কিন্তু অন্ধ নন। বেশ কিছু ব্যাপারে তাঁর সমালোচনাও ছিল। এমনকী ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের তিনি গভীর সমর্থক। আবার রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে খানিক সমালোচকও বটে। কথাটা খুব স্পষ্ট করে গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি উল্লেখও করেছেন। কিন্তু এই আন্দোলনের অভিনবত্ব যে তাঁর হৃদয়কে ছুঁয়েছিল সে-কথা তিনি কবুল করেছেন এই ভাষায়:

> ওয়ার্ডসওয়ার্থের জীবনে যেমন ফরাসীবিপ্লব আমার জীবনে তেমনি অসহযোগ আন্দোলন। প্রায় অর্ধশতক পরেও তার উন্মাদনা আমি এখনো অনুভব করি। তেমন দিন জাতির জীবনে একবার মাত্র আসে। চিরদিন প্রভাব রেখে যায়। ফরাসী বিপ্লবও তো শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। অথচ তার মতো সার্থক আর কোন্ ঘটনা? এখনো বিশ্বমানবের চিত্তে তার স্বপ্ন জেগে আছে।
>
> তেমনি অসহযোগের দিনগুলির স্বপ্ন।[৫]

অসহযোগ অন্নদাশঙ্করের কাছে স্বপ্ন, কারণ এই আন্দোলন এমন এক আন্দোলন যেখানে হাতিয়ারের কোনো প্রয়োজন নেই। গান্ধীজি ব্রিটিশরাজকে চমকে দিয়েছিলেন এমন এক পরিস্থিতি তৈরি করে যেখানে সব হাতিয়ার বাজেয়াপ্ত করতে পারলেও একটি হাতিয়ার থেকে যায়। সেটির নাম হাতিয়ার না-থাকা। এই নিরস্ত্রতা হয়ে ওঠে জনগণের হাতে প্রবল অস্ত্র। অসহযোগে ওটাই ছিল মূল অস্ত্র। দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধী এই অস্ত্রে শান দিয়ে ভারতে ফিরে এলেন এবং অসহযোগ

আন্দোলনে তা প্রথম প্রয়োগ করলেন। পুরোপুরি সফল হননি। আন্দোলন প্রত্যাহার করতে হয়েছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের মানুষ দেখল এক অভিনব আন্দোলন, এক মহান নেতা।

এমন নয় যে, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে অন্য কোনো ধারা ছিল না। বিপ্লবী গুপ্ত আন্দোলন ছিল। বিংশ শতাব্দীর সূচনায় তা তৈরি হয়েছিল বাংলায়, মহারাষ্ট্রে, পাঞ্জাবে। পরে অন্যান্য কিছু জায়গাতেও ছড়িয়েছিল। কিন্তু এই আন্দোলন ছিল মুষ্টিমেয় কিছু আত্মত্যাগী সাহসী মানুষের আন্দোলন। বেশিরভাগ মানুষ হাতে রিভলবার বা রাইফেল ধরতে ভয় পায়। যাঁদের বা যে ক-জন অল্প সংখ্যক মানুষের সে ভয় ছিল না, সেইসব ভদ্রঘরের শিক্ষিত তরুণেরা ছিলেন জন্মরোমান্টিক। ওই রোমান্টিকতা সাধারণ মানুষকে স্পর্শ করত। কিন্তু দলে টানতে পারত না। ফলে বিপ্লবী আন্দোলনের পিছনে কোনো জনচেতনা ছিল না।

ভারতবর্ষে গান্ধী-নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার আগে আমাদের এই বঙ্গদেশে স্বদেশি আন্দোলন ঘটেছিল। ১৯০৩-০৮ এর বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন যার নাম। সেখানে বিদেশি দ্রব্য বয়কট ছিল এক অন্যতম স্লোগান। সূচনাপর্বে রবীন্দ্রনাথও ছিলেন এই আন্দোলনের এক কাণ্ডারি। আবেদন-নিবেদনের রাজনীতিকে ত্যাগ করে অরবিন্দ-বিপিনচন্দ্র-ব্রহ্মবান্ধবরা ছিলেন চরমপন্থী দলের নেতৃত্বে। সঙ্গে মডারেট কংগ্রেসি সুরেন্দ্রনাথরাও ছিলেন। কিন্তু গোড়া থেকেই রবীন্দ্রনাথ বর্জনের সঙ্গে গঠনমূলক কার্যসূচির ওপর জোর দিয়েছিলেন। আত্মশক্তিচর্চার কথা বলেছিলেন। অরবিন্দ-বিপিনচন্দ্ররাও এসব কথা বলেননি, তা নয়। কিন্তু গঠনের থেকে বর্জনের ওপর জোরটা ছিল বেশি। সাধারণ মানুষের ওপর বর্জনের হুকুম জুলুমও হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ একমত হতে পারেননি, তিনি নিজের মতো করে গঠনাত্মক আন্দোলন করেছিলেন তাঁর একান্ত সীমিত পরিসরে। ইতিহাস বলছে স্বদেশি আন্দোলনেও তেমন জোরদার গণভিত্তি ছিল না। আর বর্জন যে সফল হল না, তার কারণ গঠনের আয়োজন ছিল খুবই কম। দক্ষিণ আফ্রিকায় বসে গান্ধীজি সেটা লক্ষ করেছিলেন।

দেশে ফিরে এসে তাই তিনি গঠনের ওপর বেশি নজর দিলেন। দেশ যাতে স্বাবলম্বী হতে পারে ধাপে ধাপে, সে চেষ্টা করলেন। চরকা-খাদি-গ্রামীণ শিল্পের ওপর জোর দিলেন। দেশের কোটি কোটি মানুষ যাতে খেয়ে-পরে বাঁচতে পারে— তার ওপর তীক্ষ্ণ নজর ছিল গান্ধীর। অসহযোগ আন্দোলনে তাই বর্জনের সঙ্গে গঠনমূলক কর্মসূচিও ছিল। রবীন্দ্রনাথ গান্ধীর নেতৃত্বে যথেষ্ট আস্থাবান ছিলেন। কিন্তু ১৯২১-এর আন্দোলনে তিনি গান্ধীজির বর্জনের আহ্বানে বিচলিত হলেন। স্বদেশি-পর্বে বর্জনের রাজনীতি তাঁর স্মৃতিতে ছিল। গান্ধীকে তিনি সমর্থন দিতে পারলেন না। অন্নদাশঙ্কর অবশ্য লিখেছেন, গঠন বিষয়ে কবির সঙ্গে মহাত্মার মতের যে প্রবল ভিন্নতা ছিল— এমন নয়, দুজনে প্রায় একই দর্শনের শরিক। 'কিন্তু বর্জন কথাটি আদৌ উচ্চারণ না করলে বিদেশী প্রভুশক্তির সঙ্গে সংগ্রাম হয় না'।[৬] গান্ধীকে সেই রাজনৈতিক কর্তব্য করতে হয়েছে।

কিন্তু অসহযোগ শব্দটি রবীন্দ্রনাথের কাছে ছিল অসহ্য। কেবল শাসক বা শোষকের সঙ্গে অসহযোগ হলে কবির খুব বেশি আপত্তি হত বলে মনে হয় না। কিন্তু আন্দোলনের মেজাজে ছিল ভিন্ন সুর। পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য যদি অসহযোগের কারণে দূরে সরে যায়— তাহলে তো জাতি বিকলাঙ্গ হয়ে পড়বে। অমাবস্যার অন্ধকার নেমে আসবে। শিক্ষাদীক্ষায় পাশ্চাত্য সংস্পর্শ না থাকলে সাংস্কৃতিক দিক থেকে অঙ্গহানি ঘটবে অবশ্যই। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের এই ভীতির অংশীদার অন্নদাশঙ্করও। তিনি লিখেছেন:

> আমাদের সংস্কৃতি তিনটি স্রোতের ত্রিবেণীসঙ্গম। প্রাচীন হিন্দু, মধ্যযুগীয় মুসলিম ও আধুনিক পাশ্চাত্য। এর থেকে কোনো একটিকে বাদ দেওয়া যায় না। সরকারি বিদ্যালয়ের থেকে বিদ্যার্থীদের সরিয়ে নিয়ে যেতে চাও, বেশ। কিন্তু যেখানে নিয়ে যাচ্ছ সেখানেও তাদের ত্রিবেণীসঙ্গমে অবগাহন করাও।[৭]

চরকা-খাদিকে অবলম্বন করে গ্রামমুখীন শিক্ষা নিশ্চয়ই আদর্শ হতে পারে না। গান্ধীজি অসহযোগ আন্দোলনে বিদেশি জুডিশিয়ারি-লেজিসলেচার বর্জন করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। গাঁয়ে গাঁয়ে পঞ্চায়েত গঠনের ডাক দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ইংরেজদের আদালতে দুর্নীতির বেসাতি। সেখানে সত্যিকারের ন্যায়বিচার পাওয়া যায় না। কিন্তু অন্নদাশঙ্কর জানাচ্ছেন যে, পঞ্চায়েত গঠনের ডাক সঠিক হলেও সে-সময়ে বাস্তব ছিল না। ইংরেজদের আদালত-বর্জন শেষপর্যন্ত পুরোনো কাজির বিচার বা মারাঠা-মুঘল বিচারের পদ্ধতি ফিরিয়ে আনত। শিক্ষিত-অশিক্ষিত ভারতবাসী সেটি চায় না, তারা চায় সূক্ষ্ম বিচার। আইনসভা ও পার্লামেন্টারি প্রথা এদেশে এসেছে বিলেত থেকেই, গান্ধীপূর্ব ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কাছে ওই প্রথাই কাম্য ছিল। কংগ্রেসি নেতারা মনে করতেন পার্লামেন্টারি প্রথার মাধ্যমেই দেশে আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা তৈরি হবে। বস্তুত ওই জিনিসটি দাবি করেই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সূচনা। গান্ধী বিকল্পের কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু পারেননি গড়ে তুলতে। তাঁকেও পার্লামেন্টারি রাজনীতির আবর্তেই ঢুকতে হয়েছে।

এইসব বিফলতা সত্ত্বেও গান্ধী যে কাজটি করতে পেরেছিলেন, তা ভারতের আর কোনো নেতার পক্ষে করা সম্ভব হয়নি। ভারতবর্ষে শূদ্রকে ক্ষুদ্র বলেই বরাবর অনুকম্পা দেখানো হত। গান্ধী তাঁদের রাজনীতির মূলস্রোতে শামিল

করেছিলেন। ১৯১৯ সালে তুরস্কের খলিফার ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার সুবাদে বিক্ষুব্ধ মুসলমানদের নেতৃত্ব দিয়ে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের পথ সুগম করার চেষ্টা করেছিলেন। কামাল পাশার প্রগতিবাদী আন্দোলন খিলাফত আন্দোলনের সমীপবর্তী ছিল না, রবীন্দ্রনাথ খিলাফতকে সমর্থন করেননি, করেননি আরও অনেক প্রগতিপন্থী গণতন্ত্রবাদীরা। গান্ধী অন্য কথা ভেবেছিলেন। ভারতের জাতীয়তাবাদী সংগ্রামকে যদি জোরদার গতিতে গঠন করতে হয়, তাহলে খিলাফত এমন এক ইস্যু যাতে মুসলমানদের মন পাওয়া যাবে। রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে গান্ধীর কাছে সেটি মান্যতা পেয়েছিল। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের বিষয়ে গান্ধী সফল হননি। জিন্না ও মুসলিম লিগকে গান্ধী তাঁদের প্রাপ্য সম্মান ও অধিকার দেওয়া সত্ত্বেও তিনি শেষপর্যন্ত তাঁদের মন পাননি। গান্ধীজির জীবনে রাজনৈতিক অসাফল্যের সর্ববৃহৎ দৃষ্টান্ত দেশের পার্টিশনকে রোধ করতে না পারা। এই বেদনা গান্ধীজি সহ্য করতে পারেননি। এই ব্যর্থতা সত্ত্বেও ভারতের আধুনিক ইতিহাসে এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই যে, মহাত্মা গান্ধীই ভারতবর্ষে প্রথম বিপুল গণআন্দোলনের সৃষ্টিকারী। তিনি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্তের সঙ্গে সাধারণ নিরক্ষর তথাকথিত আমজনতার সঙ্গে সেতুবন্ধন করেছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের পর্বে তিনিই জনগণতন্ত্রের স্রষ্টা।

অন্নদাশঙ্কর গান্ধীবাদের মধ্যে যে গোঁড়ামি ছিল তা সমর্থন করেননি। তিনি স্পষ্টত লিখেছেন,

> মানবের ইতিহাসে গান্ধীই আদি বা অন্ত নন। গান্ধীবাদীদের গোঁড়ামি দেখলে আমিও সমালোচনা করি। কিন্তু আমার সমালোচনা বাইরের লোকের নয়। ঘরের লোকের।[৮]

অন্নদাশঙ্কর জানিয়েছেন, তিনি নিজে পাশচাত্য রেনেসাঁসের দ্বারা প্রভাবিত ভারতীয় রেনেসাঁসের সন্তান। ১৯৭৪ সালে অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছিলেন 'বাংলার রেনেসাঁস' নামে এক গ্রন্থ। সেই বইয়ে লিখেছিলেন:

> আমাদের রেনেসাঁস ভারতবর্ষের ইতিহাসে ঘটেছে, কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকে ধারাবাহিকতার সূত্রে আসেনি। ইউরোপের ইতিহাস থেকে আবির্ভূত হয়েছে।
>
> * * *
>
> সংস্কৃতচর্চা থেকে ভারতে নবজাগরণ আসে নি, পারসিকচর্চা থেকেও না, বাংলা পদাবলী কীর্তন থেকেও না। এসেছে ইংরেজীচর্চা থেকে, ইংরেজীসূত্রে দর্শন-বিজ্ঞান ইতিহাস-ভূগোল ও নীতিচর্চা থেকে। অচলায়তনের নিষিদ্ধ দুয়ার খুলে গেছে। সেই দুয়ার দিয়ে এসেছে চার শতাব্দীর ইউরোপীয় বিবর্তন।[৯]

অন্নদাশঙ্করের কাছে গান্ধী, অহিংসা, জনগণ একসূত্রে বাঁধা। হিন্দুদের ত্রিমূর্তির মতো। তাঁর 'Means justify end'-এর বিশ্বাসও অতি মহার্ঘ। কিন্তু গান্ধীজির ওপর ভারতবর্ষীয় রেনেসাঁসের তেমন কোনো প্রভাব পড়েনি। অষ্টাদশ শতকের ইউরোপীয় এনলাইটেনমেন্ট তাঁকে স্পর্শ করলেও, সামান্যই করেছে। আধুনিক যুগ বলতে গান্ধী বুঝতেন যন্ত্রবাহিত শিল্পায়ন এবং সামরিকবাদ। অন্নদাশঙ্করের প্রশ্ন:

> তাঁর নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হতে পারবে, সাম্প্রদায়িক মৈত্রীও সম্ভবপর, কিন্তু আরেকটা ফরাসীবিপ্লব কেমন করে সম্ভব? তার প্রস্তুতি কোথায়? কোথায় ভলতেয়ার? কোথায় রুশো? দিদেরো ও তাঁর বিশ্বকোষরচয়িতা বন্ধুগণই বা কোথায়?[১০]

খুব স্পষ্ট ভাষাতে অন্নদাশঙ্কর ব্যক্ত করেছেন— কোথায় এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে তিনি গান্ধীবাদকে মানতে পারেন না। গান্ধী গ্রামীণ অর্থনীতিকে কাম্য বলে মনে করতেন, শিল্প হলেও ভারী শিল্প যথাসম্ভব কম। অ্যাগ্রো-ইন্ডাস্ট্রির দিকেই তাঁর ঝোঁক। অন্নদাশঙ্কর বিশ্বাস করতেন না হাজার হাজার বছর ধরে গ্রাম-সভ্যতা টিঁকিয়ে রাখলে নতুন সভ্যতার উদয় হবে। বিশ্বাস করতেন না গান্ধীর বর্ণভেদ প্রথার প্রতি সমর্থনও। উঁচু-নিচু ভেদপ্রথা না থাকলে আরও পাঁচ হাজার বছর তা স্পৃহনীয় হবে বলেও তাঁর মনে হয় না। বরং আপত্তিকরই ঠেকে। অবশ্য এ-বিষয়ে শেষজীবনে গান্ধীর মত খানিকটা পরিবর্তিত হয়েছিল। আম্বেদকরের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে তিনি হিন্দু বর্ণপ্রথা বিষয়ে মত পালটে ছিলেন। অন্নদাশঙ্কর অবশ্য সে ইতিহাস উল্লেখ করেননি। অন্নদাশঙ্করের মতে, গান্ধীর ব্রহ্মচর্যের আদর্শের মাধ্যমে নর-নারীর সম্পর্ক মধুময় হবে বা তাদের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠা পাবে— এটাও যুক্তিশীল বলে মনে হয় না। ধনিক-শ্রমিক, খাতক-মহাজন, জমিদার-রায়ত— সকলেই স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রেখে শ্রেণিসাম্য সম্ভব বলেও তিনি মনে করেন না। বিংশ শতাব্দীর গতিশীল মন গান্ধীজির এই সনাতন বিশ্বাসগুলি মানতে পারবে না— এমনই অন্নদাশঙ্করের মত। কিন্তু জননেতা রূপে গান্ধীজির ঐতিহাসিক আবির্ভাব, তাঁর অনির্বচনীয় জনমোহিনী ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্ব এবং তাঁর অহিংসা তত্ত্ব ভারতবর্ষের ইতিহাসে বৈপ্লবিক। এসবের প্রতি তাঁর কুর্নিশ ও নির্ভরতা প্রশ্নাতীত।

১৯০৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিল গান্ধীর 'হিন্দ স্বরাজ'। এই 'হিন্দ স্বরাজ'-এই গান্ধীজি আধুনিক সভ্যতার প্রতিটি বিষয়ে কামান দেগেছিলেন। লিখেছিলেন, ভারতবর্ষের পরাধীনতার কারণ ইংরেজ-শাসন নয়, ইংরেজদের দ্বারা আনীত আধুনিক সভ্যতা। সম্পাদক ও পাঠকের প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে অর্থাৎ এক ডায়ালজিক পদ্ধতিতে গান্ধী লিখেছিলেন এই পুস্তিকা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিনাশ ঘটিয়ে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন

করা এবং স্বরাজ লাভ করা ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের সাধারণ জ্ঞান। 'হিন্দ স্বরাজে'র পাঠক এরকম সাধারণ জ্ঞানওয়ালা একজন। 'সম্পাদক' তাঁকে প্রশ্ন করেন, 'আচ্ছা ধারয়া নিন, ইংরেজ রাজকার্য ছাড়িয়া দিল তাহা হইলে আপনারা কী করিবেন?' 'পাঠক' জবাব দেন, '...ইংরেজ চলিয়া গেলে কী অবস্থা দাঁড়াইবে তাহা প্রধানত: প্রস্থানের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। আপনি যে-রকম ধরিয়া লইতেছেন, সেইমত তাঁহারা যদি প্রস্থানই করেন, আমার মনে হয় সেক্ষেত্রে আমরা তখনও তাঁহাদের সংবিধানই বজায় রাখিব ও সরকার পরিচালনা করিতে থাকিব। আর যদি বলার ফলে তাহারা কেবলই চলিয়াই যায়, আমাদের হাতের কাছে ত সেনাবাহিনী প্রভৃতি থাকিয়াই যাইবে; সরকার চালাইতে আমাদের কোন অসুবিধা হইবে না।' এই জবাব পেয়ে 'সম্পাদক' সিদ্ধান্ত করেন, 'কার্যত: ইহার মানে ত এই যে, আপনার ইংরেজ শাসন চাই, ইংরেজ চাই না। বাঘের স্বভাব চান, বাঘটি চান না। অর্থাৎ আপনি হিন্দুস্থানকে ইংরেজি তৈরি করতে চান।... আমি যে স্বরাজ চাহি, এটি তাহা নয়।'[১১]

গান্ধী আধুনিক সভ্যতাকে 'শয়তানের সভ্যতা' বলেছিলেন। এই সভ্যতার প্রধান উপকরণগুলি যেমন— রেলগাড়ি, ডাক্তার, উকিল কিংবা আধুনিক রাষ্ট্রযন্ত্রের পার্লামেন্টারি ব্যবস্থা মানবসমাজের অধঃপতনের কারণ। পার্লামেন্টকে তিনি তুলনা করেছিলেন বন্ধ্যা রমণীর সঙ্গে, দেহপাসারিনীর সঙ্গে।[১২]

কারণ পার্লামেন্টের নিজস্ব এমন কোনো ক্ষমতা নেই যে সে মানুষের কল্যাণ করতে পারবে, সে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদের দলীয় সিদ্ধান্তগুলি অনুমোদনের যন্ত্রমাত্র। পার্লামেন্ট নানা দলের হাতে ব্যবহৃত এক যন্ত্রমাত্র। 'হিন্দ স্বরাজ' গ্রন্থে গান্ধী লিখেছেন:

> আধুনিক সভ্যতার সবচেয়ে খাঁটি পরিচয় এই যে, যাঁহারা নিজেদের সভ্য বলেন, তাঁহারা নিজেদের শরীরের সুখ, আরাম সাধনাকেই সর্বাপেক্ষা বড় পুরুষার্থ বলিয়া মনে করেন। একশো বছর আগে ইউরোপের মানুষেরা যেরূপ বাড়ি ঘরে থাকিত এখন তাহা অপেক্ষা ভাল বাড়ি ঘরে থাকে।... আগে লোকে গরুর গাড়িতে যাতায়াত করিত, আজ সেখানে ট্রেনে দিনে চারশত বা তাহারও বেশি মাইল পাড়ি দিতেছে। ইহাই সভ্যতার চরম উৎকর্ষ বলিয়া বিবেচনা করা হয়। এমন কথাও বলা হয় যে, ক্রমে ক্রমে এরূপ দিনও আসিবে যখন আকাশ পথে সওয়ার হইয়া স্বল্প কয়েক ঘণ্টায় যে কোনও দেশে পৌঁছান যাইবে। লোকের হাত পা চালাইবার দরকার হইবে না। একটা বোতাম টিপিলেই কাপড় কাছে আসিয়া উপস্থিত হইবে, আর একটা ঘণ্টা টিপিলেই নতুন খবরের কাগজ সামনে আসিয়া হাজির হইবে, আর একটা বোতাম টিপিলেই মোটর গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইবে— সুস্বাদু নানা ধরনের খাদ্য পরিবেশন করা হইবে। এ সবই যন্ত্রে হইবে।[১৩]

গান্ধীজি এই আধুনিকতাকে 'অধর্ম' বলেছেন। হিন্দুধর্মে যাকে 'কলিকাল' বলে। গান্ধী একথাও লিখেছেন যে এই ব্যাধি দুরারোগ্য নয়। যদিও বর্তমানে ইংরেজ জাতি এই ব্যাধিতে যারপরনাই ক্লিষ্ট। ভারতীয়দের এর বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করতে হবে, স্বরাজসাধনা এই আধুনিকতা-রূপী পরাধীনতার বিরুদ্ধে।

অন্নদাশঙ্কর এই চিন্তাধারাকে ভারতীয় বলে মনে করেন না। রামমোহন-বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে গোখলে-তিলক কেউই সভ্যতার সামনে 'আধুনিক' নামে বিশেষণটি বসিয়ে তা এককথায় খারিজ করে দেননি। এঁরা প্রাচ্য-প্রতীচ্যের পার্থক্যের কথা বলেছেন, কেউ কেউ সমন্বয়ের কথা বলেছেন, কেউ আত্মরক্ষার তাগিদে নিজেদের ঐতিহ্যকে ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আধুনিকতাকে সম্পূর্ণ ব্যাধি বলে শনাক্ত করেননি। অন্নদাশঙ্কর মনে করেন গান্ধীর এই প্রতীতি ইউরোপেরই ভিন্নমুখী চিন্তা। শিল্পবিপ্লবোত্তর পাশ্চাত্যে যন্ত্রসভ্যতার বিরুদ্ধে ভাবগতভাবে এক প্রবল বিদ্রোহ তৈরি হয়েছিল। রাশিয়ায় টলস্টয়ও শিল্পায়নের বিরুদ্ধতা করেছিলেন, ক্যাপিটালিজম বিজ্ঞানকে নিজের স্বার্থের কাজে লাগিয়েছে, সমাজের মঙ্গলে ব্যবহার করেনি। টলস্টয় গান্ধীর 'হিন্দ স্বরাজ'কে আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষে গান্ধীর গুরু গোখলে 'হিন্দ স্বরাজ' বাজার থেকে তুলে নেওয়ার কথা বলেছিলেন। এ বই যুগোপযোগী বলে তাঁর আদৌ মনে হয়নি।

অন্নদাশঙ্কর ঠিকই লিখেছেন যে, গান্ধী যদি আধুনিক সভ্যতার বদলে ক্যাপিটালিজম শব্দটি ব্যবহার করতেন, তাহলে হয়তো এতটা বিরূপতা তৈরি হত না। কিন্তু এর পরেও অন্নদাশঙ্কর লিখেছেন:

> গান্ধীজীর জিজ্ঞাসাকে মৈত্রেয়ীর বা যীশুর জিজ্ঞাসার মতো একটি বাক্যে সংহত করলে এইরকম দাঁড়ায়— বিজ্ঞানের বরে এত সম্পদ এত বিক্রম নিয়ে তুমি করবে কী, যদি তোমার হৃদয় অসাড় হয়, বিবেক নিষ্ক্রিয় হয়, আত্মা বিকিয়ে যায় ও জীবনযাত্রা হয়ে ওঠে যন্ত্রের মতো যান্ত্রিক?[১৪]

অন্নদাশঙ্কর তাঁর গ্রন্থে একজায়গায় মন্তব্য করেছেন, 'গান্ধীজীর সঙ্গে আমার মনের মিল অহিংসার জন্যে ততটা নয়, নৈরাজ্যের জন্যে যতটা'।[১৫] বস্তুত আদর্শবাদের দিক থেকে, তাঁর দার্শনিক বিশ্বাস থেকে গান্ধী ক্রুপটকিন-টলস্টয়-থোরোর মতো নৈরাজ্যবাদী ছিলেন। রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যক্তিস্বাধীনতার পক্ষে বিপর্যয়কারী এবং রাষ্ট্রশক্তিকে 'অর্গানাইজড ভায়োলেন্স' বলে মনে করতেন। সর্বতোভাবে বাইরে থেকে আরোপিত এই সার্বভৌম শক্তিকে গান্ধী বিরোধিতা করেছিলেন তাঁর আদর্শবাদী নীতিচিন্তায়। কিন্তু বাস্তবে কি তিনি রাষ্ট্রকে, পার্লামেন্টকে, সরকারকে অস্বীকার করতে পেরেছেন? ১৯২১ সালে গান্ধী তাঁর 'হিন্দ স্বরাজ'-এর বক্তব্য প্রত্যাহার না করেও স্পষ্টত

স্বীকার করেছেন যে, ব্যক্তিগত বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর বাহ্যিক ব্যাবহারিক রাজনীতির সাযুজ্য নেই। 'ইয়ং ইন্ডিয়া'-তে স্পষ্টভাবেই সেকথা জানিয়েছেন। ভারতবর্ষে পার্লামেন্টারি স্বরাজ-এর লক্ষ্যেই তাঁর যাবতীয় সংগ্রাম। আইসিএস পাশ করা ব্রিটিশ ভারতের একজন উচ্চপদস্থ অফিসার অন্নদাশঙ্করও লিখেছেন:

> নিয়তি বোধহয় আমাকে হাতেকলমে শেখাতে চেয়েছিল যে স্বরাজ্য আর নৈরাজ্য একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ নয়, স্বরাজ্য হচ্ছে স্বরাষ্ট্র আর স্বরাষ্ট্র যদিও সর্বোদয়ের অভিমুখী তবু তা রাষ্ট্রশূন্যতা নয়।[১৬]

দার্শনিক নৈরাজ্যবাদ বা ক্ষমতাহীনতার আদর্শ মানসিক স্তরে সবসময়েই তারিফযোগ্য হলেও, বাস্তবে তার রূপায়ণ সম্ভব বোধহয় নয়। তবে ক্ষমতা জাহির করা, অপরের বাক্‌রোধ করা আর কম ক্ষমতার ব্যবহার ঘটিয়ে মানবকল্যাণে বা জনকল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করা এক কথা নয়। গান্ধী এই দ্বিতীয় ক্ষমতা বাস্তবায়িত করার কথা ভেবেছিলেন বিকেন্দ্রীকরণের মধ্য দিয়ে, জয়প্রকাশ নারায়ণ যাকে 'কমিউনিটারিয়ান স্টেট' বলেছেন। অন্নদাশঙ্কর এই প্রসঙ্গে লিখেছেন নৈরাজ্য মানে হল অথরিটি না মানা। সরকারের অথরিটি মানব না, লোকনায়কের অথরিটিও মানব না— এই যদি মনোভাব হয় তাহলে স্বরাজের বদলে তৈরি হবে অরাজকতা। অরাজকতা তো অন্বিষ্ট হতে পারে না। চৌরিচৌরা গান্ধীকে নিদারুণ পীড়া দিয়েছিল, তিনি তাঁর আন্দোলনে চাল ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। গান্ধী বারংবার বিপ্লবী গুপ্তদলগুলিকে তাঁদের কার্যকলাপ স্থগিত রাখার কথা বলতেন। চৌরিচৌরার চাইতে শতগুণ সহিংস ছিল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন। এই ঘটনা যখন ঘটে তখন সারা দেশময় গান্ধীর লবণ সত্যাগ্রহ শুরু হয়ে গেছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদেশি কাপড় বয়কট আর মদের দোকানে পিকেটিং ব্যাপ্ত হয়েছে। দোকানদাররা ও খরিদ্দাররা তখন কংগ্রেসের অথরিটি মানছে, সরকারের অথরিটির বিরুদ্ধে। ওই অথরিটির মাধ্যমে গান্ধী স্বরাজ গড়ে তুলতে চাইছেন। এখানে নৈরাজ্যবাদের দর্শনের প্রয়োগ অবশ্যই ছিল না, এমন মনে হতে পারে। কিন্তু সত্যিই কি ছিল না?

এই বিশ্লেষণে একটা বিষয় খুবই প্রণিধানযোগ্য। অন্নদাশঙ্কর ক্ষমতা বা পাওয়ার শব্দটি ব্যবহার না করে অথরিটি শব্দটি বার বার ব্যবহার করেছেন। সমাজতত্ত্বের ছাত্ররা জানেন, পাওয়ারের সঙ্গে লেজিটিম্যাসি যুক্ত না হলে তা অথরিটি হয়ে ওঠে না। গান্ধীজির পাওয়ার লেজিটিমেট হয়ে উঠেছিল তাঁর নৈতিকতার জোরে, ভারতবর্ষের লোকসমাজের স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্যের জোরে। পলিটিক্সকে স্পিরিচুয়ালাইজ করে। আত্মশুদ্ধি ও আত্মশক্তির দারা শোধন না করলে পাওয়ার কোয়ার্সন হয়ে উঠবে, অথরিটি হয়ে উঠবে না। ১৯২৪ সালে ১২ জুন 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকায় গান্ধী লিখেছিলেন,

> I am not interested in freeing India merely from the English yoke. I am bent upon freeing India from any yoke whatsoever. I have no desire to exchange "King for the King stork". Hence for me the movement of swaraj is a movement of self purification.[১৭]

এই আত্মশুদ্ধির জোরেই বা সত্যাগ্রহের দর্শন থেকেই মানুষের মধ্য থেকে পাশবিক বলপ্রয়োগের ইচ্ছা অন্তর্হিত হবে বলে গান্ধী বিশ্বাস করতেন। তবে গান্ধীর নিজেরই সংশয় ছিল, মনুষ্যচরিত্রের এই মৌলিক পরিবর্তন কি সম্ভব হবে! নৈরাজ্যবাদী গান্ধী তাই বলেছিলেন রাষ্ট্র ও ক্ষমতা যদি একান্তভাবে লোপ করা না যায়, তবে তাকে যতদূর সম্ভব হ্রাস করা আমাদের কর্তব্য। স্বেচ্ছাকৃত সংগঠন সর্বাধিক কাম্য। ১৯৩৫ সালে 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় আবার মনে করিয়ে দিলেন ব্রুট ফোর্স নয়, সোশ্যাল ফোর্স ব্যবহার করতে হবে নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে। তখন ক্ষমতা আর অসামাজিক থাকে না, সামাজিক ক্ষমতা হয়ে অথরিটিতে পরিণত হয়।

২৩৯ পৃষ্ঠা সম্বলিত অন্নদাশঙ্করের 'গান্ধী' গ্রন্থে বহু প্রসঙ্গের অবতারণা আছে। সব ক-টি যে ছুঁয়ে যেতে পারলাম, এমনটা নয়। নির্বাচন করতেই হয়েছে।

মহম্মদ আলি জিন্না গান্ধীজিকে কখনও মহাত্মাজি বা বাপুজি নামে সম্বোধন করেননি, তিনি ইংরেজি কেতায় বলতেন, 'মি: গান্ধী'। অন্নদাশঙ্কর তাঁর বইয়ে লিখেছেন:

> ইংরেজী কেতায় জিন্না যাঁকে বলা হয়, গুজরাতী ভাষায় তাঁকেই বলা হয় ঝীণা। ঝীণা শব্দের অর্থ 'ছোট'। জীবনে তিনি কারো কাছে ছোট হতে চাননি। ছোট হবেন গান্ধীর কাছে! আরেক গুজরাতীর কাছে! না, তিনিও আরেক আগস্ট আন্দোলন করবেন। যার নাম ডাইরেক্ট অ্যাকশন। একজনের হাঁক ছিল "ভারত ছাড়ো"। আরেকজনের ডাক হল "লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান"।[১৮]

দ্বিজাতি তত্ত্বের চিন্তা হঠাৎ আসেনি, ধাপে ধাপে পুষ্ট হয়েছে। ১৯০৫-এর স্বদেশি আন্দোলনে বাঙালির এক জাতি হয়ে ওঠার প্রবল আকুতি ছিল। ওই আকুতি থেকে রাখি আন্দোলন, অরন্ধন ব্রত, ফেডারেশন হল যেমন নির্মিত হয়, তেমনি বোমা ফাটে, রিভলভার ছোটে ও সাহেব-মেম মারাও যায়। ১৯১১ সালে ব্রিটিশ কর্তারা মত পালটালেন। সাম্প্রদায়িক কারণে প্রদেশ ভাগ আর নয়, ওটা তুলে নেওয়া হল।

সাম্প্রদায়িক কারণে নির্বাচকমণ্ডলী ভাগ করাই বেশি সুবুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হবে। হলও তাই। স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলীর দাবি এসেছিল মুসলিম লিগের তরফ থেকে। মহামান্য আগা খান লর্ড মিন্টোর কাছে সুপারিশ জানিয়েছিলেন। ধাপে ধাপে সেটা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অন্নদাশঙ্কর তাঁর অনবদ্য শৈলীতে এই ইতিহাস বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লিখেছেন:

> পার্লামেন্টারি ডেমোক্রাসীর পত্তন হল গোড়ায় গলদ নিয়ে। এ যেন জরাসন্ধের জন্ম। দুই আধখানা শিশু। একে পূর্ণাঙ্গ করার সাধনার নাম ভারতীয় জাতীয়তার সাধনা, ভারতীয় গণতন্ত্রের সাধনা। কর্তারা যেন বিধান দেন কংগ্রেস হবে হিন্দুদের, লীগ হবে মুসলিমদের, আর উপর থেকে যখনি যা পাওয়া যাবে তার একভাগ পাবে হিন্দু, একভাগ পাবে মুসলমান। তারপর তাকে জুড়ে একাকার করলেই হবে জরাসন্ধের একতা।[১৯]

১৯৪৭ সালে অবশ্য জরাসন্ধকে জোড়া লাগানো যায়নি। এর জন্য যে কেবল জিন্না দায়ী, তা বলা উচিত হবে না। ক্ষমতার রাজনীতিতে লাভালাভের প্রশ্নে কংগ্রেসের দায়ও ছিল প্রবল। গান্ধী অবশ্য তখন নীলকণ্ঠ। সাম্প্রদায়িকতা ও ক্ষমতার মন্থনে অমৃতের স্বাদ নিচ্ছেন কংগ্রেসি ও লিগের নেতারা। গরল গলায় ধারণ করছেন মহাত্মা। গান্ধীর সত্যাগ্রহ, অসহযোগ ইত্যাদিতে আস্থা ছিল না জিন্নার। এমনকী অ্যানি বেসান্ত বা মদনমোহন মালব্যও এসবে বিশ্বাস করতেন না। সেটা অবশ্য অনেক আগের ঘটনা। কিন্তু হিন্দুত্ববাদী সাভারকাররাও তো করতেন না। ১৯২১ সালে চৌরিচৌরাতে হিংস্রতার ভয়াবহতা দেখে গান্ধী আন্দোলন তুলে নিয়েছিলেন। তাতে গান্ধী-অনুগামী কংগ্রেসিরাও চটেছিলেন। কিন্তু ১৯৪২-এর আন্দোলন যখন হিংসার রূপ নেয়, গান্ধী ঠেকাতে পারেননি। অহিংসার ওপর বেশিরভাগ আন্দোলনকারীর বিশ্বাসে তখন ফাটল ধরেছিল। বিশেষ করে কংগ্রেস সোশ্যালিস্টদের। গান্ধীর জয়ধ্বনি করেই হিংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয়েছিলেন। বিদেশ থেকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুও আজাদ হিন্দ বাহিনী নিয়ে যুদ্ধ শুরু করার আগে জাতির পিতা গান্ধীকে প্রণাম জানিয়েছিলেন। বাঙালির ঘরে ঘরে মেয়ে-বউরাও গাওয়া শুরু করেছিলেন 'কদম কদম বড়ায়ে যা'। অর্থাৎ অহিংসাতে তখন কারোরই আস্থা দেখা যায়নি।

অন্যদিকে সাম্প্রদায়িকতার ঝড় তখন তুঙ্গে। সাম্প্রদায়িক শক্তিকে সাম্প্রদায়িক শক্তি দিয়ে রোখার ভয়াবহ লড়াই। লিগের 'আল্লা হো আকবর'কে রুখবার জন্য হিন্দু মহাসভা ও আরএসএস বাহিনীর 'বন্দে মাতরম্' তখন ওয়ার ক্রাই। হিন্দু-মুসলমানের এই সংঘাতে সারা দেশময় ছুটে বেড়াচ্ছেন একা গান্ধী তাঁর অমোঘ অস্ত্র 'অনশন'কে হাতিয়ার করে। কলকাতায় সংঘর্ষ থামাতে যান তো দিল্লিতে অস্থিরতা শুরু হয়, অথবা পাঞ্জাবে। নোয়াখালির দাঙ্গার প্রতিক্রিয়ায় বিহারে দাঙ্গা শুরু হয়। আর নীলকণ্ঠ গান্ধী ছুটে বেড়ান সমগ্র দেশময়। তবে তখন তিনি একা, ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে পারবেন কেন এসব কাণ্ড সামাল দিতে। চরম অস্থিরতায় তখন তাঁর দিন কাটছে।

এদিকে তখন ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয় নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়ার চূড়ান্ত পর্ব শুরু হয়ে গেছে। সংবিধান প্রণয়নের জন্য গণপরিষদ গঠিত হয়েছে। গান্ধী তখন প্রায় অবান্তর। লড়াই চলছে হিন্দু মেজরিটি বনাম মুসলিম মেজরিটি নিয়ে। মুশকিলটা ছিল গান্ধী স্বাধীনতা বলতে বুঝতেন ইংরেজদের হাত থেকে ভারতবর্ষকে উদ্ধার করা। কিন্তু জিন্নার স্বাধীনতার মানে ছিল হিন্দু মেজরিটির চাপ থেকে মুসলিম স্বার্থকে প্রতিষ্ঠা করা। নেহরু-প্যাটেল-রাজাগোপালাচারিরাও তখন ব্যস্ত ক্ষমতা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে কংগ্রেস কতটুকু সুবিধে ছিনিয়ে নিতে পারবে সেইসব অঙ্ক কষা। ফলত গান্ধীর তখন একটাই কাজ। দেশকে গৃহযুদ্ধ থেকে উদ্ধার করা। কিন্তু একা মানুষ আর কতদিকে ছুটবেন? বিহারের দাঙ্গা স্তিমিত হওয়ার আগেই পাঞ্জাবের পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে উঠল। মাউন্টব্যাটেন মন্তব্য করেছিলেন যে, গান্ধী উপস্থিত থাকলে পাঞ্জাবে ওই ভয়াবহ কাণ্ড ঘটতে পারত না। কথাটা নিশ্চয়ই ঠিক, কিন্তু হিংসা থেকে দেশকে বাঁচানোর দায়িত্ব কি গান্ধীর একার ছিল? সেটা ভাবার তখন কারোর সময় ছিল না, আয়ত্তের মধ্যেও ছিল না।

ওদিকে দেশভাগের পর ভারতবর্ষের স্বাধীন রাজন্যবর্গগুলিকে নিয়েও সমস্যা তৈরি হল। বেশিরভাগ প্রিন্সলি স্টেট অবশ্য হয় হিন্দুস্তান বা পাকিস্তানে স্বেচ্ছায় যোগ দিয়েছিল। কিন্তু হায়দ্রাবাদের নিজাম কিংবা কাশ্মীরের মহারাজাকে নিয়ে ঘোর সমস্যা তৈরি হল। সমস্যা ছিল আরও কয়েকটি দেশীয় রাজ্য নিয়েও। হায়দ্রাবাদে যেরকম রাজাকারদের উপদ্রব শুরু হয়েছিল তাতে সৈন্য পাঠানো হবে কি না এমন জল্পনা চলছিল প্যাটেল ও অন্যান্য কংগ্রেসি নেতাদের মধ্যে। কাশ্মীরেও পাকিস্তানের যোগসাজশে একদল ট্রাইবাল মুসলিম আক্রমণ করে। ভীত হিন্দু মহারাজ ভারতে যোগ দেন, ভারতীয় সৈন্যও সেখানে পাঠানো হয়। এসব হিংসাত্মক ঘটনা কি গান্ধীর অনুমোদন পেয়েছিল? অন্নদাশঙ্কর লিখেছেন, 'সরকারি মহলে ক্রমেই একটা ধারণা দৃঢ় হচ্ছিল যে গান্ধী থাকতে বলপ্রয়োগের স্বাধীনতা নেই, সুতরাং গান্ধীর থাকাটা অনাবশ্যক। তাঁর ও তাঁর অহিংসার ঐতিহাসিক প্রয়োজন ফুরিয়েছে।'[২০] তবে কাশ্মীর রক্ষার জন্য সৈন্য পাঠাবার নেহরুর সিদ্ধান্ত গান্ধীর অনুমোদন পেয়েছিল। যুক্তিটা বোধহয় এরকম ছিল যে, কাশ্মীর আক্রান্ত হয়েছে, বাঁচবার জন্য প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা প্রয়োজন।

কিন্তু মৃত্যুর আগে গান্ধী তাঁর যে শেষ ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন— কংগ্রেসের কাজ শেষ হয়ে গেছে, এবার তাকে ভেঙে দেওয়া হোক। তৈরি হোক স্বাবলম্বী অহিংস ভারতীয় সমাজ গঠনের জন্য লোকসেবক সংঘ। ক্ষমতার মদমত্তে নিমজ্জিত কংগ্রেসি নেতৃবর্গ এই পরামর্শকে তেমন গ্রাহ্য করেননি। জনাকয়েক প্রবীণ গান্ধীবাদী নেতা অবশ্য তৈরি করেছিলেন সেরকম কিছু সেবক সংঘ, কিন্তু গোটা দেশের তুলনায় তা ছিল নিতান্ত নগণ্য দৃষ্টান্ত।

অন্নদাশঙ্কর তাঁর গ্রন্থের উপসংহারে একজন মার্কিন লেখিকা ও ফটোগ্রাফারের (মার্গারেট বুর্ক-হোয়াইট) সঙ্গে গান্ধীর সাক্ষাৎকারের একটি অংশ উদ্ধৃত করেছেন। অহিংসার ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিল সেই কথাবার্তা। জাপানে পরমাণু বোমা ব্যবহারের পর মার্গারেটের প্রশ্ন ছিল— গান্ধী কীভাবে এর সঙ্গে মোকাবিলা করবেন? গান্ধীর উত্তর ছিল:

> "Ah, Ah!" he said, "How shall I answer that !" The Charkha turned busily in his agile hands for a moment, and then he replied "I would meet it by prayerful action." He emphasized the word 'action", and I asked what form it would take.
>
> "I will not go underground. I will not go into shelters. I will come out in the open and let the pilot see I have not the face of evil against him."
>
> He turned back to his spinning for a moment before continuing.
>
> "The pilot will not see our faces from his great height, I know. But that longing in our hearts that he will not come to harm would reach up to him and his eyes would be opened."[২১]

এর দু-দিন পরেই গান্ধীজি গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন।

উৎস ও টীকা

১. অন্নদাশঙ্কর রায়: 'গান্ধী', এমসি সরকার অ্যান্ড সনস প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৬৯। পৃ. ২৩৪
২. তদেব, পৃ. ১
৩. তদেব, পৃ. ৩১
৪. তদেব, পৃ. ৩৩
৫. তদেব, পৃ. ৩৬
৬. তদেব, পৃ. ৩৮
৭. তদেব, পৃ. ৩৯
৮. তদেব, পৃ. ৪৯
৯. অন্নদাশঙ্কর রায়: 'বাংলার রেনেসাঁস', ডিএম লাইব্রেরি, কলকাতা, ১৯৭৪। পৃ. ৫, পৃ. ১২
১০. অন্নদাশঙ্কর রায়: 'গান্ধী', পৃ. ৫২
১১. 'গান্ধী রচনাসম্ভার': গান্ধী শতবার্ষিকী সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ, ১৯৭০। 'হিন্দ স্বরাজ' অনুবাদ করেছেন সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত। আমার বর্তমান নিবন্ধে 'হিন্দ স্বরাজ' থেকে যে অংশগুলি উদ্ধৃত হবে, তা সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তর অনুবাদ থেকেই নেওয়া।
১২. ১৯২১ সালে 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকায় গান্ধী জানিয়েছিলেন যে, জনৈক ইংরেজ মহিলার অনুরোধে তিনি 'দেহপসারিনী' বা 'বেশ্যা'র মতো কঠিন শব্দ পালটে দিয়েছিলেন।
১৩. প্রাগুক্ত 'গান্ধী-রচনাসম্ভার'। 'হিন্দ স্বরাজ', অনুবাদ সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত।
১৪. অন্নদাশঙ্কর রায়ের প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৬৭
১৫. তদেব, পৃ. ৭০
১৬. তদেব, পৃ. ৭১
১৭. রাম বসু : 'গান্ধিজির দৃষ্টিতে আধুনিকতা ও ক্ষমতাতন্ত্র', অন্তর পাঠ ও চর্চা, কলকাতা, ২০১৮ গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত। পৃ. ৬৫
১৮. অন্নদাশঙ্কর রায় : প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৬
১৯. তদেব, পৃ. ১৮৯
২০. তদেব, পৃ. ২১৯
২১. তদেব, পৃ. ২২০-২২১

দেবতার জন্ম ও মৃত্যু

ঋক চট্টোপাধ্যায়

মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল-মাঝে
আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে, ভ্রমি বিস্ময়ে।।
তুমি আছ, বিশ্বনাথ, অসীম রহস্যমাঝে
নীরবে একাকী মহিমানিলয়ে।।

— *গীতবিতান*, ১৮৯৬

বিশ্বজগতের রহস্য মানুষকে বারে বারে অবাক করেছে। নিজের অসীম জিজ্ঞাসাকে পাথেয় করে মানুষ চেয়েছে প্রকৃতির রহস্যকে উন্মোচন করতে। রহস্যের জট যখন সে খুলতে পারেনি তখন কল্পনা করেছে এক বিশ্বনাথের, যে এই রহস্যের নিয়ন্ত্রক। কিন্তু এই প্রশ্ন বারে বারে এসেছে, এই বিশ্বনাথ কি আছেন? নাকি তা কেবল মানুষের কল্পনা, অজ্ঞানতার রূপ?

সভ্যতার আদি লগ্নে মানুষ যখন সদ্য গাছ থেকে মাটিতে নেমে দু-পায়ে হাঁটতে শুরু করেছে তখন গোটা দুনিয়াটাই তার জন্য ছিল প্রায় মৃত্যু উপত্যকা। একদিকে তার চেয়ে আকারে বড়ো এবং শক্তিশালী বন্য জন্তুদের ভয় অন্যদিকে তার চেয়েও ভয়ংকর প্রকৃতির আপন মেজাজ। বাঁচার জন্য মানুষ দলবদ্ধ হল। আগুন জ্বালাতে শিখল। পাথরের, তারপর তামার এবং শেষে লোহার অস্ত্র, যন্ত্র সে বানাল। গুহাবাসী থেকে হল গৃহবাসী। ক্রমে প্রাণীজগতের উপর মানুষ প্রভুত্ব লাভ করল। কিন্তু প্রকৃতি? সে তো কথা শোনে না। ঠান্ডা থেকে বাঁচতে মানুষ আগুন জ্বালাতে পারে বটে, কিন্তু গরমের দিনে বনের শুকনো গাছ ঘষা খেয়ে যখন দাবানল লাগে, তখন সেই আগুন নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা মানুষের নেই। নদী বা বৃষ্টির জল কাজে লাগিয়ে মানুষ ফসল তো ফলাতে শিখল, কিন্তু অতি বর্ষণে সেই নদী যখন দু-কূল ছাপিয়ে মানব বসতি ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তখন মানুষ অসহায়। ভূমিকম্প, খরা, রোগ এসব থেকে উদ্ধার পাওয়ার বিদ্যা তখন মানুষের নাগালে আসেনি। বাকি জীবজগতের সঙ্গে লড়াইতে জেতার মতো ক্ষমতা মানুষ অর্জন করলেও প্রকৃতির উপর তার নিয়ন্ত্রণ কায়েম হয়নি। বরং প্রকৃতির মেজাজ সম্পর্কে সে তখনও অজ্ঞ। অজ্ঞতা আনে ভয়। ভয় আনে ভক্তি। কিন্তু ভক্তি আসবে কীসে? মানুষ প্রকৃতির শক্তিকে ভয়ে ভক্তি করা শুরু করল। ভক্তি থেকে এল ভজনা। মানুষ প্রথমে প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকেই বন্দনা করা শুরু করল। তৈরি হল বন্দনা স্তোত্র। কিন্তু সময়ের সঙ্গে মানুষের বেঁচে থাকার ধরনেও এল পরিবর্তন। যাযাবর মানুষ যখন নিজের খাদ্য প্রকৃতি থেকে সংগ্রহ করার বদলে, নিজের শ্রম দিয়ে তৈরি করতে শিখল তখন যাযাবর জীবন থেকে সরে এসে স্থায়ী বসতি গড়ে তুলল। গোষ্ঠীবদ্ধ হল। তারপর যখন তার প্রযুক্তি উন্নত হল, পাথরের বদলে ধাতুর যন্ত্র হাতে এল, মানুষের উৎপাদন ক্ষমতা গেল বেড়ে। এখন মানুষ যা সম্পদ তৈরি করে, তার চেয়ে গোষ্ঠীর চাহিদা কম। ফলে বাড়তিটা মানুষ সঞ্চয় করে রাখতে পারে। আর এই বাড়তি উৎপাদন ক্ষমতাই জন্ম দিল নতুন এক প্রশ্নের। এই বাড়তি সম্পদের মালিকানা কার? প্রথমে ঠিক হল মালিকানা গোষ্ঠীর। ক্রমে এল গোষ্ঠী-প্রধান। মালিকানা গেল গোষ্ঠীর বদলে গোষ্ঠী-প্রধানের হাতে। যৌথ মালিকানা পালটে গেল ব্যক্তি মালিকানায়। সমাজের গড়ন গেল পালটে। সবাই সমানের বদলে এল ক্ষমতার স্তরভেদ। এতদিন ছিল মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির দ্বন্দ্ব। এখন তার সঙ্গে জুড়ল মানুষের সঙ্গে মানুষের দ্বন্দ্ব। ফলে এখন দরকার পড়ল প্রকৃতির পাশাপাশি গোষ্ঠী-প্রধানের প্রতি বাকিদের ভক্তি। দেবত্ব আরোপিত হল গোষ্ঠী-প্রধানের ওপর। এর সঙ্গে সঙ্গেই আর একটি গুরুতর পরিবর্তন এল। এতদিন মানুষ প্রকৃতির শক্তিকে বন্দনা করত। এখন সেই বিমূর্ত শক্তি পেল মানুষের রূপ। জন্ম হল দেবতার। প্রকৃতির এক এক শক্তিকে মানুষ এক

এক দেবতার রূপ দেওয়া শুরু করল। এল দেবতা বন্দনার নিয়মকানুন। জন্ম হল ধর্মের। সময়ের নিয়মে সেই ধর্ম পেল সংগঠিত রূপ। তৈরি হল ধর্মচর্চার কেন্দ্র। হল মন্দির, মসজিদ, গির্জা ইত্যাদি। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সভ্যতার অগ্রগতি দেবতাদের অস্তিত্ব সংকটে ফেলল। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যে পশ্চাদ্‌পদতা দেবতার জন্ম দিয়েছিল, সেই বিজ্ঞান আস্তে আস্তে মানুষের সামনে প্রকৃতির রহস্য খুলতে থাকল। একসময় মানুষ বিশ্বাস করত পৃথিবী আছে জগতের কেন্দ্রে আর তাকে ঘিরে ঘুরছে আকাশের চাঁদ, তারা, সূর্য। ভাবত এই পৃথিবী বানিয়েছে একজন মহাশক্তিধর দেবতা। তিনিই বানিয়েছেন এই জীব ও জড়জগৎ। প্রথমে কোপারনিকাস, পরে গ্যালেলিও টেলিস্কোপের সাহায্যে দূরদূরান্তের গ্রহ ও নক্ষত্রের চলাচলের তথ্য সংগ্রহ করে দেখালেন যে গোটা বিশ্ব মোটেই পৃথিবীকে কেন্দ্র করে পাক খায় না। বরং পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ঘুরপাক খায়। ধর্ম পড়ল মহা সংকটে। দেবতার গদি বুঝি গেল। ধর্মগুরুরা নিদান দিলেন গ্যালেলিওর জেল হবে। যতদিন না গ্যালেলিও তার নিজের কথাকে ভুল বলে মেনে না নেয় ততদিন তাঁর হাজতবাস। ধর্ম বিজ্ঞানকে কারারুদ্ধ করল। কিন্তু মানুষের জিজ্ঞাসু মন তো থেমে থাকে না। সে জানতে চায় কোথা থেকে এল এই গ্রহ, নক্ষত্র? কেন তারা একে অপরকে ঘিরে অবিরত ঘুরে চলে? উত্তর সে পেল একভাবে। মহাবিজ্ঞানী নিউটন ১৬৮৭ সালে তাঁর বিখ্যাত *প্রিন্সিপিয়া ম্যাথেমেটিকা* বইতে দিলেন সেই রহস্যের কিনারা।

পৃথিবীর পিঠে দাঁড়িয়ে উপরের দিকে কোনো বস্তুকে ছুড়লে তা ফের নীচে ফেরত আসে, বা উপর থেকে সব বস্তুই নীচে এসে পড়ে। যুগ যুগ ধরে মানুষ প্রতিদিন এই অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, প্রাচীন মিশরীয়, সিরিয়রা (আসুর) এই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে অবাক করা প্রযুক্তিও বানিয়ে ফেলেছিল, কিন্তু কেন যে এমন হয় তার ব্যাখ্যা কোনোদিন ভেবেই ওঠেনি। গল্পে আছে, নিউটন সাহেব তাঁর বাড়ির বাগানে বসে কোনো গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, এমন সময় তাঁর সামনে গাছ থেকে একটি আপেল মাটিতে পড়ে। এমন সেটি বাইবেল বর্ণিত জ্ঞানবৃক্ষের আপেল ছিল কিনা তা তর্কসাপেক্ষ, তবে গল্প হল এই দৃশ্য দেখেই নিউটন সাহেব মহাকর্ষের রহস্য আবিষ্কার করেন। গল্পের কৌতুক সরিয়ে নিলে যা পাই তা হল, নিউটন আপেলের নীচে এসে পড়াকে কেবল ঘটনা হিসেবে না দেখে তার পিছনের বৈজ্ঞানিক কারণটি খুঁজতে থাকেন। তিনি গোটা ঘটনার একটি সহজ ব্যাখ্যা হাজির করেন। তিনি বলেন এই বিশ্বে যেকোনো দুটি বস্তু পরস্পরকে আকর্ষণ করে তাদের ভরের কারণে। এই আকর্ষণ বলের নাম তিনি দেন 'মহাকর্ষ'। মহাকর্ষ বল কাজ করার নিয়মগুলি হল— (১) এই বল কাজ করবে দুই বস্তুর কেন্দ্র সংযোগকারী সরলরেখা বরাবর, (২) এই বলের মান বস্তুদুটির ভরের গুণফলের সমানুপাতিক এবং দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক। দেখতে পড়তে সহজ এই সূত্রটি কিন্তু মানুষের কাছে মহাবিশ্বের গতিপ্রকৃতি, গ্রহ-নক্ষত্রের চলাচলের হাল-হদিশের সব খবর উজাড় করে দিল। দুটি বস্তুর ভেতর ক্রিয়াশীল মহাকর্ষ বলের মান নিরূপণের যে সূত্র নিউটন দিলেন, তাই দিয়ে সৌরজগতের সব গ্রহগুলির চলাচলের রাস্তার হিসাব মোটের উপর মিলে গেল। দেখা গেল এই সূত্র মহাশক্তিধর। এই সূত্রে গাছ থেকে আপেল মাটিতে পড়ার হিসাবও মেলে আবার সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর ঘুরে বেড়ানোর পথের হিসাবও মেলে। শুধু তাই নয়, নিউটন তাঁর এই সূত্রকে আরো ব্যাপক করে যেকোনো বস্তুর গতির হিসাব করার সূত্র তৈরি করলেন। কেতাবি ভাষায় যাকে আমরা বলি নিউটনের গতিসূত্র। কোনো বস্তুর প্রাথমিক বেগ এবং তার উপর কার্যকরী বলের মান জানা থাকলে যেকোনো সময় ওই বস্তুর গতি কী হবে, সে কোথায় থাকবে এর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়া সম্ভব। এতদিন সে বিজ্ঞান আসতে আসতে এগুচ্ছিল, তার বৈপ্লবিক উল্লম্ফন হল। এখন মানুষের হাতে এল বস্তুজগতের চলাচলের বিজ্ঞানকে রপ্ত করার কৌশল। আর এই তত্ত্বকে কাজে লাগিয়ে প্রযুক্তিও গেল অনেক এগিয়ে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই অগ্রগতি তো হল, কিন্তু এই তত্ত্ব দর্শনের জগতে হাজির করল এক বিরাট বিতর্ক।

নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র হয়ে উঠল দেবতার ত্রাতা। আসলে নিউটন যখন মহাকর্ষের সূত্রের পর বস্তুর গতীয় অবস্থা নির্ণয়ের আঙ্কিক সূত্র দিলেন তাতে দেখা গেল কোনো বস্তুর প্রাথমিক গতীয় অবস্থা জানা থাকলে ভবিষ্যতে তার গতীয় অবস্থা কী হবে প্রায় নির্ভুল বলা সম্ভব। অর্থাৎ কেউ একজন তাহলে এই জগতকে নিয়মে বেঁধে দিয়েছে। বস্তুজগৎ সেই নিয়ম মেনেই চলছে। সেই তিনিই হলেন ভগবান। ফলে যে চার্চ একদা গ্যালেলিওকে জেলে ভরেছিল তারা নিউটনকে কিছুই বলল না। কারণ এই সূত্র বিজ্ঞানের রূপ নিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্বেই সিলমোহর লাগাল। নিউটন জেনে-বুঝে এমন তত্ত্ব হাজির করেছিলেন কিনা তা তর্কসাপেক্ষ। তবে এর অন্তর্নিহিত দর্শনটি নিউটন বুঝেও চুপ ছিলেন কারণ তিনি নিজেই এক সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন।

নিউটনের সূত্রটি এতই কার্যকর ছিল যে আবিষ্কারের পরবর্তী ২০০ বছর একে কোনো প্রশ্নের মুখেই পড়তে হয়নি। এই সূত্রের মূল ভাবনাটি বিজ্ঞানীদের একটু মানসিক অস্বস্তিতে ফেললেও দিন ভালোই কাটছিল। এই সূত্রের মূল সমস্যাটি হল যে দুটি বস্তুর মধ্যে ক্রিয়াশীল মহাকর্ষ বল তাৎক্ষণিক। অর্থাৎ দুটি বস্তু যত দূরেই থাকুক, এমনকী তারা পরস্পরের থেকে

অসীম দূরত্বে থাকলেও, তাদের মধ্যের দূরত্ব সামান্য পরিবর্তিত হলে সঙ্গে সঙ্গে মহাকর্ষ বলের মান পালটে যাবে। তার মানে দাঁড়ায় যে মহাবিশ্বের দু-প্রান্তে থাকা দুটি বস্তু, একে অপরের অস্তিত্ব না জানলেও, তাদের ভিতর মহাকর্ষ বল কাজ করে চলে। এই ভাবনা খুবই অস্বস্তিকর বিজ্ঞানের চোখে। এছাড়া যখন বুধ গ্রহের কক্ষপথ ভালো করে দেখা হল, জানা গেল যে সে ঠিক নিউটনের বর্ণিত পথ মতো চলে না। আসলে নিউটনের সূত্র ছিল মহাকর্ষ বল নির্ণয়ের আঙ্কিক সূত্র। এই সূত্র মহাকর্ষ বলের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হাজির করে না। এই ব্যাখ্যা পাওয়া গেল ১৯১৫ সাল নাগাদ যখন অ্যালবার্ট আইনস্টাইন প্রথম তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের সূত্র হাজির করলেন। আইনস্টাইন প্রথমে তাঁর বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের সূত্রে দেখালেন যে এই দুনিয়াতে আলোর চেয়ে বেশি গতিতে কোনো বস্তুই চলতে পারে না। তিনি এটাও দেখালেন যে কোনো বস্তু যখন আলোর কাছাকাছি বেগে ছোটে তখন গতির দিক বরাবর তাঁর দৈর্ঘ্য কমে যায় আর কেউ যদি এমন গতিতে যায় তাহলে তার সময় স্থির কোনো ব্যক্তির সময়ের চাইতে লম্বা হবে। অর্থাৎ আলোর কাছাকাছি বেগে গতিশীল কোনো ব্যক্তির হাতঘড়িতে এক সেকেন্ড যতক্ষণে হবে, স্থির কোনো ব্যক্তির হাতঘড়িতে সময় তখন এক সেকেন্ডের বেশি দেখাবে। তার মানে এই সময় সবার জন্য এক নয়।

এখানেই আইনস্টাইনের গতীয় সমীকরণ নিউটনকে পেরিয়ে যায়। নিউটন ধরেছিলেন সময় সবার জন্য এক। নিউটনের এই ধারণার পেছনে ছিল তাঁর মনের বিশ্বাস। যেহেতু তিনি জগতের চালিকাশক্তি হিসাবে এক ঈশ্বরের কথা ভাবতেন, তাই সময় তাঁর কাছে ছিল এক অপরিবর্তনীয় সত্তা। সময়ের কোনো শুরু বা শেষ নেই। তা ছিল ও থাকবে। কারণ সময়ের যদি শুরু বা শেষ থাকে তো খোদ ঈশ্বরও সেই সময়ের বাঁধনে বাঁধা পড়বে। সময়ের শুরু আছে মানে ঈশ্বরেরও শুরু আছে। তাই সময়ের শেষ হলে সেই ঈশ্বরও বিলুপ্ত হবেন। তাই নিউটনের বিজ্ঞানে সময় ছিল সবার জন্য এক যা কেউ আগে ঠিক করে দিয়েছে। আইনস্টাইন এই মূল প্রশ্নটিকেই সামনে আনলেন যে সময় কী? তিনি দেখালেন সময় বলতে আমরা বুঝি আসলে কোনো এক বস্তু বা ঘটনা থেকে আলো কতক্ষণে আমাদের চোখে এসে পৌঁছোয়। তার মানে কোনো বস্তু থেকে আলো আমাদের চোখ অবধি আসতে মাঝে যা ব্যয় হয়ে যায়, সেটাই সময়। ফলে আপনি যত জোরে দৌড়োবেন, ততই আলোর আপনাকে ছুঁতে বেশি পথ যেতে হবে। তত সময় বেশি লাগবে। ফলে দুটি ঘটনার ভেতর সময়ের ব্যবধান আপনার কাছে স্থিরাবস্থার চেয়ে বেশি মনে হবে। একটা সহজ উদাহরণ আমরা নিতে পারি। ধরুন দুজন ব্যক্তি, 'ক' আর 'খ'। 'ক' এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে আর 'খ' খুব জোরে ছুটছে। 'খ' ছুটতে শুরু করার আগে 'ক'-এর সঙ্গে নিজের ঘড়ি মিলিয়ে নিল যাতে দুজনের ঘড়িতেই ধরা যাক '১২'-টা দেখাল। কথা হল, 'ক' তার ঘড়িতে ঠিক এক মিনিট পার হলে একটা আলো জ্বালাবে। তাহলে 'খ' যখন সেই আলো দেখতে পাবে তখন তার ঘড়িতে সে এক মিনিট কাঁটা এগিয়ে দেবে। এবার সহজেই বোঝা যায়, যেহেতু 'খ' ছুটছে তাই 'ক' যখন আলো জ্বালাবে 'খ' তার একটু পর আলোটা দেখতে পাবে। কারণ আলো-কে তাদের মাঝের দূরত্বটা পেরোতে হবে। সাধারণভাবে 'খ'-এর গতি কম হলে আলোর এই বাড়তি দূরত্ব যেতে কোনো সময়ই প্রায় লাগবে না কারণ আলোর বেগ সেকেন্ডে প্রায় ৩ লক্ষ কিলোমিটার। কিন্তু 'খ'-এর বেগ যদি আলোর বেগের ১০ শতাংশ বা তার বেশি হয় তখন দুজনের ঘড়ির সময়ের তফাত চোখে পড়বে। এই ধারণাটাই মহাকর্ষের স্বরূপ উন্মোচিত করল।

নিউটনের তত্ত্বে দুটি বস্তুর ভেতর কেবল স্থানের তফাত থাকত, কিন্তু সময় সবার জন্য এক হত। আইনস্টাইনের তত্ত্বে এখন দুটি বস্তুর কেবল স্থান নয়, তাদের সঙ্গে জুড়ে থাকা 'কাল' বা সময় আলাদা। অর্থাৎ এখন দুই ব্যক্তি 'ক' এবং 'খ' কোথায় দাঁড়িয়ে আছে বললেই হবে না, তাদের দুজনের হাতঘড়িতে কী সময় দেখাচ্ছে তাও বলতে হবে। সুতরাং এখন বিশ্ব কেবল ৩ মাত্রার (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা) নয় বরং ৪ মাত্রার (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা ও সময়)। যেহেতু ৪ মাত্রার ছবি আমরা ধারণা করতে পারি না তাই সুবিধার জন্য আমরা একটা ২ মাত্রার তল ধরব, যেখানে একটা মাত্রা বোঝাবে 'স্থান' (দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও উচ্চতার সমন্বয়) এবং অন্য মাত্রা বোঝাবে 'কাল' (চিত্র ১)। আইনস্টাইন দেখালেন এই স্থান-কালের দ্বিমাত্রিক তলটি বস্তুর ভরের কারণে স্থানীয়ভাবে বেঁকে যেতে পারে। এই বক্রতাই হল মহাকর্ষের উৎস। সমস্ত বস্তু, এমনকী আলো, এই তল বরাবর চলে। কোন ভারী বস্তু (যেমন সূর্য) তলকে অনেক বেশি পরিমাণে বাঁকায়। তখন তুলনায় কোনো হালকা বস্তু (যেমন পৃথিবী) এই বক্রতার পাল্লায় পড়লে, তলের বক্রতাকে অনুসরণ করে ওই ভারী বস্তুর চারপাশে ঘুরতে থাকে। নিউটন একেই মহাকর্ষ বলে ব্যাখ্যা করেছিলেন। আইনস্টাইনের তত্ত্বের গণনা অনুযায়ী বুধ গ্রহের কক্ষপথ, যা আগে ঠিক মিলছিল না, হুবহু মিলে গেল। আরো গুরুত্বপূর্ণ হল, নতুন তত্ত্ব দেখাল কেবল বস্তু নয়, আলো পর্যন্ত বেঁকে যেতে পারে যদি স্থান-কালের বক্রতা পর্যাপ্ত হয়। অর্থাৎ খুব ভারী বস্তু তার পাশ দিয়ে যাওয়া আলোর পথ বাঁকিয়ে দিতে পারে, নিউটনের তত্ত্বে যা সম্ভব ছিল না। ১৯১৯ সালে এডিংটন ও ডাইসন আলাদা আলাদা পরীক্ষার মাধ্যমে এই সম্ভাবনার সত্যতা প্রতিষ্ঠা

করলেন। নিউটনের তত্ত্বের জায়গা নিল আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব।

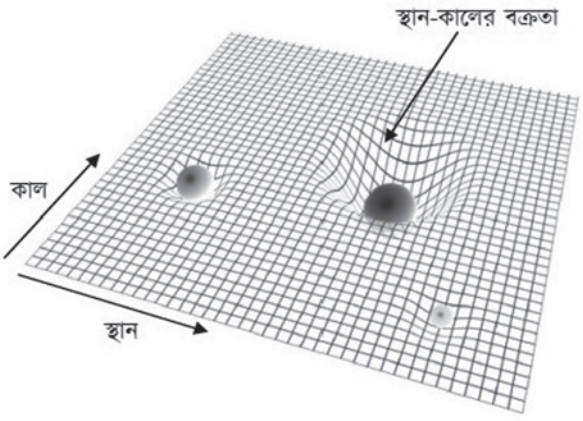

চিত্র ১. বস্তুর ভরের কারণে স্থান-কালের বক্রতা

আইনস্টাইনের নতুন ব্যাখ্যা দেখাল মহাকর্ষ কোনো তাৎক্ষণিক বল নয়, বরং তা স্থান-কালে সীমাবদ্ধ। কোনো বস্তু এই বলের প্রভাব অনুভব করবে কেবল তা অন্য বস্তুর দ্বারা তৈরি স্থান-কালের বক্রতার আওতায় এলে, নাহলে নয়। এই তত্ত্ব মহাকর্ষের উৎপত্তির কারণ ব্যাখ্যা করলেও দুটি মূল প্রশ্নের সমাধান মিলল না— ১. নিউটনের গতিসূত্র অনুযায়ী যদি বস্তুর অবস্থান ও গতির নির্ভুল গণনা করা যায় তবে তা নিয়তিবাদকেই প্রতিষ্ঠা করে ২. মহাবিশ্বের উৎপত্তি কী করে হল?

প্রথম প্রশ্নের সমাধান মিলল প্রায়োগিক বিজ্ঞানের হাত ধরে। ১৮৩৮ সালে মাইকেল ফ্যারাডে ক্যাথোড রশ্মি আবিষ্কার করলেন। তারপর ১৮৫৯ সালে কার্শফ কৃষ্ণ বস্তুর থেকে তাপ বিকিরণের সূত্র দিলেন। ১৮৯৭ সালে বিজ্ঞানী জে জে থমসন পদার্থের পরমাণুকে ভেঙে তার ভেতরে থাকা ইলেকট্রন কণা আবিষ্কার করলেন। ১৯০০ সালে ম্যাক্স প্লাঙ্ক দেখলেন যে বস্তুর ভেতর নিহিত শক্তি খরচ হওয়ার সময় তা যথেচ্ছ পরিমাণে হয় না, বরং এক নির্দিষ্ট এককের পূর্ণ গুণিতকে হয়। জন্ম নিল কণাবাদী বলবিদ্যা বা কোয়ান্টাম বলবিদ্যা। ১৯০৫-এ আইনস্টাইন দেখালেন কোনো বস্তুতে আলো পড়ার ফলে যদি তা থেকে ইলেকট্রন নির্গত হয় তো সেটা প্লাঙ্ক এর তত্ত্ব মেনে শক্তির এককের পূর্ণ গুণিতকে বেরোবে। এরপর ১৯১১ সালে পরমাণুর গঠনের ধারণা পাওয়া গেল। ১৯১৩ সালে নীলস বোর কোয়ান্টাম তত্ত্বের ভিত্তিতে পরমাণুর স্থিতিশীলতাকে ব্যাখ্যা করলেন। এরপর ১৯২৫ সালে হাইজেনবার্গ বললেন যেকোনো বস্তুর বেগ এবং অবস্থান একসাথে একটি নির্দিষ্ট সীমার নীচে মাপা সম্ভব নয়। এর পোশাকি নাম 'অনিশ্চয়তার সূত্র'। এই সূত্র অনুযায়ী, কোনো নির্দিষ্ট গতিসম্পন্ন বস্তুর সম্ভাব্য অবস্থান বলা সম্ভব, চূড়ান্ত করা সম্ভব নয়। ১৯২৬ সালে শ্রয়েডিঙ্গার প্রকাশ করলেন তাঁর বিখ্যাত সমীকরণ যা দেখাল বস্তুকণাকে তরঙ্গ ধরে হিসাব করে তার গতীয় অবস্থার বর্ণনা দেওয়া যায়। শ্রয়েডিঙ্গার আসলে হাইজেনবার্গের তত্ত্বকে আশ্রয় করে বস্তুর কোনো নির্দিষ্ট অবস্থান না ধরে মেনে নিলেন যে বস্তুটি তার সম্ভাব্য অবস্থানের যেকোনো জায়গায় থাকতে পারে। তাহলে তা আসলে দেখতে হবে একটা বিস্তৃত তরঙ্গের মতো। তাই বস্তুর গতীয় অবস্থা আদতে হবে তরঙ্গের গতীয় অবস্থার মতো। পরবর্তী সময়ে যখন পরমাণুকে ভেঙে আরও মৌলিক কণা পাওয়া গেল তখন দেখা গেল যে, এই কণাগুলির গতীয় অবস্থার ব্যাখ্যা নিউটনের সূত্র দিয়ে মিলছে না, বরং তা শ্রয়েডিঙ্গারের সমীকরণ মেনেই চলছে। এই অগ্রগতি প্রতিষ্ঠা করল যে বস্তুর গতি নিয়তিবাদ মেনে চলে না। বরং উলটো, বস্তুর গতি নির্ভুল মাপতে গেলে বস্তু কোথায় আছে আমরা আর বলতেই পারব না, আর বস্তুর অবস্থান নির্ভুল মাপতে গেলে বস্তুকে পুরো থামাতে হবে, ফলে তার কত গতি ছিল তা আমরা আর বলতেই পারব না। ফলে আমরা কেবল বস্তুর সম্ভাব্য গতি ও সম্ভাব্য অবস্থানের একটা ধারণা দিতে পারি, কিন্তু তা ওই মুহূর্তে ঠিক নাও হতে পারে। বস্তুর ভর যত বেশি হবে আমাদের গণনা তত নির্ভুল হবে। কারণ ভারী বস্তুতে অনেক বেশি কণা উপস্থিত। ফলে তাদের পারস্পরিক ঠেলাঠেলিতে কণাদের নিজস্ব গতি প্রায় শূন্য হবে। তাই তাদের সমষ্টির গতি ও অবস্থান সম্পর্কে ভালো ধারণা পাওয়া যাবে। এটা কল্পনা করা যায় একটা বড়ো জটলার মতো। যেখানে জটলার ভেতরে থাকা ব্যক্তিদের নিজস্ব অবস্থান ক্ষণে ক্ষণে পালটে যায়, কিন্তু মোটের ওপর জটলার অবস্থান ও গতি বাস্তবের কাছাকাছি মাপা সম্ভব। বিজ্ঞানের এই আবিষ্কার নিউটনের সূত্রের অন্তর্লীন নিয়তিবাদকে উৎখাত করল।

কিন্তু মূল যে প্রশ্ন বার বার মানুষকে ধাঁধাঁয় ফেলেছে তা হল, বস্তুর গতি-স্থিতির নিয়ম, জন্ম-মৃত্যুর রহস্য, গ্রহ-নক্ষত্রের চলাচলের নিয়ম কিন্তু ব্যাখ্যা করে না যে এই বিশ্ব এল কোথা থেকে? বিজ্ঞান যতদিন এই প্রশ্নের উত্তর দিতে না পেরেছে, বিশ্ব সৃষ্টির কারিগর বিশ্বনাথের আসন অক্ষত থেকেছে কবিমানসে, জনমানসে। কিন্তু বিজ্ঞান এখন এই বিশ্ব সৃষ্টির রহস্য ব্যাখ্যা করতে সক্ষম। আমরা সংক্ষেপে সেই আলোচনা দিয়েই শেষ করব।

রাতের আকাশে তাকালে আমরা অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র দেখতে পাই খালি চোখেই। যদি শক্তিশালী টেলিস্কোপে চোখ রাখি তো এই সংখ্যা আরও বেড়ে যায়। গ্রহগুলি সবই কোনো-না-কোনো নক্ষত্রকে ঘিরে পাক খেয়ে চলেছে এক এক ভাবে, যেমন আমাদের সৌরমণ্ডলের গ্রহগুলি পাক খায় সূর্যকে ঘিরে। এই

নক্ষত্রগুলি কিন্তু আবার একা একা ঘুরে বেড়ায় না। তারা এক একটি ছায়াপথ বা গ্যালাক্সির ভেতর থাকে। আমাদের সৌর-পরিবার যেমন 'আকাশগঙ্গা' বা 'মিল্কিওয়ে' নামক ছায়াপথের বাইরের দিকে বসে। আমাদের ছায়াপথের সবচেয়ে কাছের একটা ছায়াপথ হল 'আন্ড্রোমিডা'। এটি আমাদের থেকে প্রায় ২৫ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে অর্থাৎ এখান থেকে আলো পৃথিবীতে আসতে সময় লাগবে ২৫ লক্ষ বছর। এর মানে হল এই গ্যালাক্সি থেকে আসা যে আলো আমরা এই মুহূর্তে দেখছি তা ওই গ্যালাক্সি থেকে ২৫ লক্ষ বছর আগে রওয়ানা দিয়েছিল। অর্থাৎ আমরা এখন 'আন্ড্রোমিডা' গ্যালাক্সিকে যে রূপে দেখছি সেটা তার ২৫ লক্ষ বছর আগের অবস্থা। সুতরাং যত দূরের গ্যালাক্সি আমরা দেখতে পাব, সময়ের হিসাবে আমরা ততই পিছিয়ে যাব। কাজেই আমরা যদি মহাবিশ্ব উৎপত্তির সময় গ্যালাক্সিগুলো কেমন দেখতে ছিল জানতে চাই তাহলে আমাদের মহাকাশে আরও দূরের গ্যালাক্সিকে দেখতে হবে। গোটা মহাবিশ্বে এখনও অবধি প্রায় ১০ হাজার কোটি এমন গ্যালাক্সির সন্ধান আমরা পেয়েছি। সবচাইতে দূরের যে গ্যালাক্সি আমরা এখনও দেখতে পেয়েছি তার নাম 'MACS0647'। এটি আমাদের পৃথিবী থেকে প্রায় ১৩৩০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। এখন বিজ্ঞানীদের হিসাবে এই মহাবিশ্বের বয়স প্রায় ১৩৮০ কোটি বছর। তার মানে 'MACS0647' মহাবিশ্ব সৃষ্টির ৫০ কোটি বছর পরের অবস্থার বিবরণ আমাদের দেবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা খুব ভালো উপায় নয়। প্রথমত এই গ্যালাক্সি এতই দূরে যে সেখানে কোনো পরীক্ষামূলক মহাকাশযান পাঠানো সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত আমরা কেবল এই গ্যালাক্সির অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছি, কিন্তু তাকে খুঁটিয়ে দেখার মতো প্রযুক্তি আমাদের হাতে নেই। কিন্তু এই গ্যালাক্সিগুলো সম্পর্কে একটা ধারণা আমরা পেয়েছি। দেখা যাচ্ছে গ্যালাক্সিগুলো মহাশূন্যে মোটেই স্থির নেই। বরং তারা ক্রমান্বয়ে পরস্পরের থেকে দূরে সরছে। অর্থাৎ প্রতি মুহূর্তে আমাদের মহাবিশ্ব ফুলে-ফেঁপে উঠছে। তাহলে সময়ের উলটো দিকে যদি আমরা যাই তাহলে দাঁড়ায় যে গোড়াতে এই গ্যালাক্সিগুলো খুব কাছে ছিল। কিন্তু তারা ছিল কীভাবে? সৌর-পরিবার কি এভাবেই ছিল কেবল সবাই আরও কাছাকাছি ছিল? তাহলে কি 'মিল্কিওয়ে' আর 'অ্যান্ড্রোমিডা' একে অপরের সঙ্গে মিশে ছিল তাদের সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্রকে নিয়ে? এমনটা যে হওয়া সম্ভব না তা সহজেই বোঝা যায়। সৃষ্টির প্রথম-লগ্ন ছিল একটা শক্তিবিন্দু। যেহেতু আমরা এতক্ষণে বুঝেছি দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতার মতো সময়ও একটা মাত্রা সুতরাং সময়ের একটা শুরু আছে। আমরা এও দেখেছি যে সময় আসলে কোনো ঘটনা থেকে আমাদের কাছে আলো এসে পৌঁছোনার ব্যবধান। তাহলে এটা ভাবাই যুক্তিসঙ্গত যে মহাবিশ্ব সৃষ্টি আমাদের এই বিশ্বের প্রথম ঘটনা। তাই আমরা সময়ের মাপ এই বিন্দুর সাপেক্ষেই করব। নীচের চিত্রে এই ধারণাটা পরিষ্কার হবে। 'ক' এবং 'খ' দুটি ঘটনা। এখন সৃষ্টি বিন্দুর সাপেক্ষে 'ক'-এর সময়ের ব্যবধান এবং সৃষ্টি বিন্দুর সাপেক্ষে 'খ'-এর সময়ের ব্যবধানের অন্তরই হল মহাবিশ্বে 'ক' এবং 'খ' দুটি ঘটনার সময়ের ব্যবধান। একইভাবে 'ক' এবং 'খ'-এর ভেতর স্থানের ব্যবধানও সৃষ্টি বিন্দুর সাপেক্ষে মাপা যায়। এটি সুবিধাজনক। তাহলে আমরা ধরতে পারি বর্তমান মহাবিশ্বে যে স্থান এবং কাল আমরা মাপি তার শুরু এই মহাবিশ্বের শুরু থেকে। তার আগে এই স্থান এবং এই সময়ের কোনো অস্তিত্ব ছিল না।

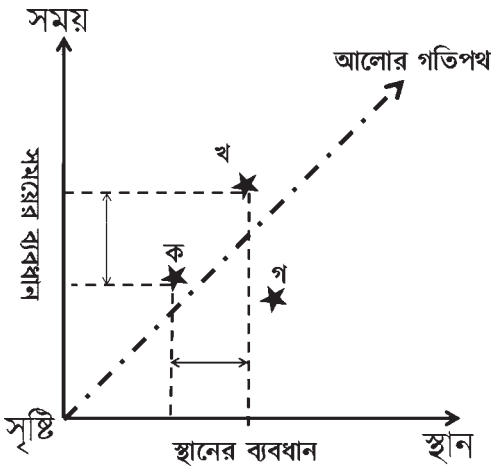

চিত্র ২. স্থান-কাল লেখচিত্রে দুটি ঘটনার অবস্থান।

আপেক্ষিকতার সূত্র অনুযায়ী কোনো কিছুই আলোর চেয়ে বেশি বেগে যেতে পারে না। সুতরাং স্থান-কাল লেখচিত্রে দেখানো আলোর গতিপথের ডান দিকে কোনো ঘটনা, যেমন 'গ' থেকে কোনো আলো 'ক' বা 'খ'-তে পৌঁছোবে না। সুতরাং 'ক' বা 'খ'-এর কাছে 'গ'-এর কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। বিজ্ঞানের ভাষায় 'ক' ও 'খ'-এর বিশ্ব এবং 'গ'-এর বিশ্ব আলাদা। তেমনি সৃষ্টি বিন্দুর আগের কোনো ঘটনা থেকেও আলো 'ক' বা 'খ'-এর কাছে পৌঁছোবে না। তাহলে এটা পরিষ্কার যে আমাদের বর্তমান বিশ্বের শুরু একটি বিন্দু থেকে।

এই বিন্দুতে বিশ্ব তাহলে কেমন ছিল? আমরা যদি আকাশের নক্ষত্রদের কথা ভাবি তাহলে আমরা জিজ্ঞাসা করব যে এই নক্ষত্রগুলো এমন অবিরাম আলো, তাপ ও অন্যান্য শক্তি তৈরি করছে কী করে? আবারও সেই আপেক্ষিকতার সূত্রে ফেরত যেতে হয়। সেখানে আইনস্টাইন দেখালেন যে আসলে বস্তুর ভর ও শক্তি আদতে এক, অর্থাৎ তারা রূপান্তরযোগ্য। কিছু পরিমাণ ভর উবে গেলে শক্তি তৈরি হয়

আবার উলটোটাও হয়। এই তত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগেই তৈরি হয় প্রথম পারমাণবিক বোমা। আবার এই একই প্রক্রিয়া চলে নক্ষত্রদের ভেতর। সেখানেও কিছু পরিমাণ ভর উবে গিয়ে তৈরি হয় বিপুল পরিমাণ শক্তি। এর উলটো প্রক্রিয়াটা ঘটেছিল মহাবিশ্ব শুরুর সময়। তখন ছিল কেবল অমিত পরিমাণ শক্তি। সেই শক্তি নিহিত ছিল খুব ছোটো স্থানে অর্থাৎ কোনো বিন্দুতে। তারপর সেই শক্তির বিস্ফোরণ ঘটাল। এটাই মহাবিস্ফোরণ বা 'বিগ ব্যাং'। এর প্রমাণ? এই বিস্ফোরণে তৈরি হওয়া শক্তি যা ছড়িয়ে পড়ে আজও তার চিহ্ন বর্তমান। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন মহাবিশ্বের অসীম শূন্যস্থানে আছে কেবল এক ধরনের তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ, যেমনটা আমরা রেডিয়ো বা মোবাইল ফোনের সংকেত পাঠাতে ব্যবহার করি। আমরা যখন রেডিয়ো চালাই তখন ঠিকঠাক রেডিয়ো ষ্টেশন না আসলে যে 'ঘষঘষ' শব্দ সৃষ্টি হয় তা আসলে মহাবিশ্বের এই ছড়িয়ে থাকা তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গেরই আওয়াজ। সুতরাং এই বিশ্বের উৎপত্তি যে 'বিগ ব্যাং' থেকে তা মোটামুটি প্রমাণিত। 'বিগ ব্যাং'-এর পর প্রথমে তৈরি হয় এক উত্তপ্ত গ্যাসপিণ্ড। এই গ্যাসপিণ্ড ছিল মূলত বিভিন্ন মৌলিক কণার এবং তাদের প্রতিরূপ বা 'অ্যান্টি-পার্টিকেল'। কোনো কণা এবং তার প্রতিরূপ একসঙ্গে এলে তারা ধ্বংস হয় এবং কিছু শক্তি উৎপন্ন করে। সৃষ্টির গোড়ায় তৈরি হওয়া প্রায় ৯৯% ভরই এভাবে ফের উবে গিয়ে শক্তিতে পরিণত হয়। যা থেকে যায় সেটাই বর্তমান বিশ্বের সব গ্রহ-নক্ষত্রের সমষ্টি। প্রথম তৈরি হওয়া মৌল হল হাইড্রোজেন। এটি সবচেয়ে সরল মৌল। একটি 'প্রোটন' এবং তাকে ঘিরে একটি 'ইলেকট্রন' পাক খেলেই তৈরি হয় হাইড্রোজেন। হাইড্রোজেনের একটি ধরন হল 'ডয়টেরিয়াম', যেখানে পরমাণুর কেন্দ্রে একটি বাড়তি মৌলিক কণা 'নিউট্রন' থাকে। যেহেতু প্রকৃতি কোনো সমসত্ত্ব স্বভাবের নয়, তাই অনুমান গোড়াতে ডয়টেরিয়ামও তৈরি হয় কিছু। এমন দুটি ডয়টেরিয়াম মিশে হয় 'হিলিয়াম' পরমাণু। যা আদতে বেশিরভাগ নক্ষত্রের কেন্দ্রে প্রবল চাপ ও তাপে তৈরি হয় বাকি ভারী মৌল যেমন লোহা ও অন্যান্য ধাতুগুলি। সুতরাং একথা বলাই যায় যে মানুষের শরীর আর নক্ষত্রের উপাদান আসলে একই। যেহেতু প্রকৃতি সমসত্ত্ব নয়, তাই শুরুতে কিছু জায়গায় মৌলিক কণার গ্যাসের ঘনত্ব ছিল বেশি। ফলে মহাকর্ষের টানে সেই জায়গাতেই বাকি কণারা আসতে থাকে। এভাবেই তৈরি হয় প্রথম দিকের নক্ষত্রগুলি। তারপর তাদের পারস্পরিক সংঘর্ষ থেকে বর্তমান গ্রহ-নক্ষত্রদের উৎপত্তি। আমাদের সৌরজগৎও এভাবেই তৈরি। এই ধারণা থেকে বিজ্ঞানীরা সৃষ্টির গোড়া থেকে গ্যালাক্সিগুলোর ছড়িয়ে পড়ার যে গাণিতিক মডেল বানিয়েছেন তার সাহায্যে আজ সমস্ত গ্যালাক্সিগুলোর অবস্থান হুবহু নির্ণয় করা যায়। শুধু তাই নয়, টেলিস্কোপের সাহায্যে মহাকাশে চোখ রাখলে অতীতের এই মহাজাগতিক ঘটনাগুলির রেশও আমরা খুঁজে পাই। মহাবিশ্ব সৃষ্টির রহস্য আজ বিজ্ঞানের সামনে উন্মোচিত।

কিন্তু একটি শেষ প্রশ্ন ঈশ্বরবাদীরা তুলতে পারেন তা হল গোটা সৃষ্টিতত্ত্বটাই তো দাঁড়িয়ে একটা আকস্মিকতার উপর। মহাবিস্ফোরণের ফলে এভাবে সব ঘটেছে বলেই আজকের দুনিয়া। অন্যরকম হলে তো এই দুনিয়া হত না। তাহলে ঘুরে-ফিরে নিয়তিবাদই ফেরত এল। মানুষের জন্ম নেওয়াও তাহলে নিয়তি। সুতরাং সেই নিয়তির সৃষ্টিকর্তা তাহলে আছেন। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের নয়া এই সৃষ্টিতত্ত্ব সেই সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেয়। আমরা দেখেছি যে মহাবিশ্বের আওতা আলোর গতিপথ দিয়ে সীমাবদ্ধ (চিত্র ২)। কাজেই আমাদের এই বিশ্বের বাইরে একাধিক বিশ্ব থাকতে পারে। কিন্তু চাইলেও তার অস্তিত্ব আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। হতেই পারে এক নয়, একাধিক মহাবিশ্ব আছে। কিন্তু তাদের সব ক-টি আলোর গতিপথ দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং পরস্পরকে প্রভাবিত করতে পারে না। সেইরকম বিশ্ব যদি থেকেও থাকে সেখানে কণা তৈরির প্রক্রিয়া ভিন্ন হলেই সেখানে আর মানুষ থাকবে না। ফলে সেই বিশ্বের নিয়তি ভিন্ন এবং সব অর্থেই নিয়তির সমস্ত সম্ভাবনা থাকতে পারে। তাহলে আর নিয়তির কোনো মানে থাকে না। কারণ নিয়তি তখনই প্রতিষ্ঠিত যখন প্রকৃতির কেবল নির্দিষ্ট একটি সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু বিজ্ঞানের কাছে একাধিক সম্ভাবনা গ্রহণযোগ্য। কোয়ান্টাম তত্ত্বের দার্শনিক ভিত্তিও তাই। আজকের বিশ্বে যে সম্ভাবনা আমরা দেখছি, আগামী বা পূর্বতন বিশ্বে সে সম্ভাবনা নাই থাকতে পারে। কিন্তু প্রকৃতির নিয়মেই তা জানার সুযোগ আমাদের নেই। সুতরাং মানুষের অস্তিত্ব কেবল এই মহাবিশ্বে আছে এবং তার উৎপত্তির সমস্ত ব্যাখ্যা আজ বিজ্ঞানের হাতে মজুত। সুতরাং এই বিশ্বে মানুষের উৎপত্তির রহস্য আর ব্যাখ্যাতীত নয়। তাই কোনো সৃষ্টিকর্তারও আর প্রয়োজন আজ নেই। সৃষ্টি সম্পর্কে যে অজ্ঞানতা একদিন বিধাতার জন্ম দিয়েছিল, সময়ের হাত ধরে, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা আজ সেই বিধাতারই মৃত্যু ঘোষণা করেছে।

গ্রন্থসূত্র

১. *'পরিবার, ব্যক্তি-মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি'* - এফ. এঙ্গেলস
২. *'রিলেটিভিটি : স্পেশাল অ্যান্ড জেনারেল'*- অ্যালবার্ট আইনস্টাইন
৩. *'দি গ্র্যান্ড ডিজাইন'*- স্টিফেন হকিং

শ্রীনিকেতন: একটি প্রতিষ্ঠানের পুনর্জন্ম

একরাম আলি

আমাদের গল্প শুরু হচ্ছে অনেক দূরে। ভোপালে।

লেক পাহাড় জঙ্গল প্রাসাদ আর যত্রতত্র পানের-পিকে-ভরা ঘিঞ্জি বসতিপূর্ণ বাজারের নির্বিবাদ অংশগ্রহণে ভোপাল শহরটা যে ঠিক কেমন, এককথায় বলা অসম্ভব। সন্ধ্যে হয়ে গেছে। আমরা খুঁজছিলাম স্থানীয় হাতের কাজের টুকিটাকি এক-আধটা জিনিস। যাকে বলে স্মারকদ্রব্য। কোথাও গেলে সেখানকার চিহ্ন বাড়ি অব্দি নিয়ে আসা। এমন সময় চোখ আটকে গেল ডানহাতি সাদা একটা প্রাসাদোপম অট্টালিকায়। অতিরিক্ত আলোয় আরও সাদা দেখাচ্ছে। এত আলো কীসের? নাকি ওখানে মধ্যপ্রদেশ সরকারের হস্তশিল্প মেলা চলছে।

মেলার চরিত্র সব জায়গায় কম-বেশি একই। ঘোরা, না কিনলেও অপ্রয়োজনীয় জিনিসের দরদাম করা, চলছিলই। থমকে যেতে হল এক অলস আতরের দোকানে। শোভা পাচ্ছে স্বচ্ছ চামড়ার বোতল, যার লম্বা গলা, সুডৌল পেটটি সোনালি তরলে পূর্ণ। এমন মধ্যযুগ থেকে চট করে চোখ ফেরানো যায় না।

কিন্তু আমরা খুঁজছি অন্য কিছু। একটা দোকানে চেনা-চেনা কিছু জামাকাপড় চোখে পড়ল। হিন্দিতে দাম জানতে চাইলে উত্তর এল পরিষ্কার বাংলায়। আমাদের বিস্মিত চোখের সামনে এক তরুণী। এবং বাঙালি। বাড়ি? কলকাতায়। না, ঠিক কলকাতায় নয়, বীরভূমে। বীরভূমের কোথায়? সিউড়ি। কোন পাড়ায়? এবার একটু থমকানো ভাব। ঠিক সিউড়ি নয়, চার কিমি দূরে, পতঙ্গা গ্রামে। বাবার নাম? এতটা তিনি আশা করেননি। কৃষ্ণপদ সরকার। কেষ্টবাবু? প্রাইমারি টিচার? রিটায়ার করেছেন সম্ভবত? আমাদের গ্রামের বাড়ি থেকে দেড় কিমি দূরে পতঙ্গা। সেই গাঁয়ের মেয়েটি ছত্তিশগড় আর রাজস্থানে গ্রামের মেয়েদের কয়েকটি স্বনির্ভর দল গড়েছে। তার কাজ দলগুলোকে ডিজাইন, কাপড় আর অন্যান্য সরঞ্জাম জোগানো। তাদেরই তৈরি নানা ধরনের জামাকাপড় মার্কেটিংয়ের কাজে সারা বছর সে ব্যস্ত। শ্রীনিকেতনের প্রাক্তনী। পতঙ্গা থেকে নিকটতম বাসস্টপে যেতে ধানখেত-চেরা রাস্তা কমপক্ষে তিন কিমি। এবং সাইকেলে সেই রাস্তা ঠেঙিয়ে যাওয়া-আসা একসময় তার দৈনন্দিন রুটিনের মধ্যেই পড়ত। খুব সহজে কি এটা সম্ভব হয়েছিল? হওয়ার কথা নয়।

কী করে এই জীবনটা সে পছন্দ করল? কেন? এই মেয়েটির বাস্তবতায় পৌঁছোতে গেলে কতটা অতীতে হাঁটতে হবে আমাদের? যদি বলি, শতবর্ষেরও আগে, ১৯০৭ কি ১৯০৮ সালে, ভুল বলা হবে না। আমরা যাব শিলাইদহে, প্রকৃতির অফুরান ঐশ্বর্য আর মানুষের অপরিসীম দারিদ্র্য যেখানে একাত্ম হয়ে থেকেও ধরিত্রীর বৈষম্যকে কোনো-এক কবির সামনে প্রকট করে তুলেছিল।

দুই

১৮৯০ খ্রিস্টাব্দ। উনতিরিশ বছরের তরুণ কবিকে পাঠানো হল শিলাইদহে, জমিদারি দেখাশোনায়। কলকাতাবাসী অভিজাতকুলোদ্ভব রবীন্দ্রনাথের মাথায় সে-এক গুরুভার দায়িত্ব। তবু ওই জলের ওপর সবুজের নুয়ে-পড়া প্রকৃতির আর সেখানকার মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ছবিগুলো তাঁকে নাড়িয়ে দিল। লিখলেন 'সোনার তরী' এবং আরও কিছু কবিতা। তার ঠিক ছ-বছর পর ১৮৯৬-এ 'চিত্রা'।

'সোনার তরী' কবিতা নিয়ে শহুরে-দুর্বোধ্যতার অভিযোগ উঠেছিল। একদিন আশ্রমের বালিকাদের ডাক এল তাদের গুরুদেবের কাছ থেকে। তিনটি নিতান্ত বালিকা গিয়ে দেখে, কলকাতা থেকে আসা মান্যগণ্য অতিথিরা সব বসে আছেন। গুরুদেব মেয়েদের কাছে জানতে চাইলেন 'সোনার তরী' কবিতাটি তারা বোঝে কি না। সমবেত 'হ্যাঁ' শোনার পর কবি তাদের বলতে বলেন। একজন গড়গড়িয়ে বলেও দেয়। শুনে অতিথিদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আক্ষেপ ছিল— এই ছোটোরা যেটা সহজে বুঝছে, আপনাদের মতো পণ্ডিতদের সেটা মনে হচ্ছে দুর্বোধ্য?

সেদিনের বালিকাদলে ছিলেন অমিতা সেনও।

ঘটনাটির উল্লেখ এ-কারণে যে শিলাইদহ তাঁর কবিতার

প্রাণ-চারিত্র্য কিছুটা পালটেছে, কিন্তু বিপত্তি বেধেছে পরিচিত নাগরিক পরিধি থেকে অনেক দূরে বিষয়বস্তুকে পৌঁছে দেওয়ায়। ক্রমে নদী খাল বিল হাওর পেরিয়ে, ঘন গাছপালার আড়াল সরিয়ে, তিনি দেখতে পেয়েছেন অভুক্ত আর মননদৈন্য মানুষের সারি। বৈষম্য আর সংস্কারের বাঁধন। অশিক্ষা আর হাজার বছরের অচল কৃষিব্যবস্থা। আর, তাদের জন্যে করবার মতো অঢেল কাজ।

তিন বছর পরই লিখতে হল 'এবার ফিরাও মোরে'। কবিতাটি শুরু হচ্ছে এভাবে:

> 'সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ শত কর্মে রত,
> তুই শুধু ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মতো
> মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে একাকী বিষণ্ণ তরুচ্ছায়ে
> দূরবনগন্ধবহ মন্দগতি ক্লান্ত তপ্তবায়ে
> সারাদিন বাজাইলি বাঁশি। ওরে তুই ওঠ্ আজি;
> আগুন লেগেছে কোথা? কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি
> জাগাতে জগৎ-জনে? কোথা হতে ধ্বনিছে ক্রন্দনে
> শূন্যতল? কোন্ অন্ধকারামাঝে জর্জর বন্ধনে
> অনাথিনী মাগিছে সহায়?...'

সেই শুরু। শত-শত বছরের মালিন্য-লেগে-থাকা ক্ষয়িষ্ণু গ্রামসমাজের নবজাগরণ নাহলে সমস্ত জাগরণের চেষ্টাই যে মিথ্যা, তাঁর মাথায় সেই যে ঢুকল, আমৃত্যু সেই চিন্তা ক্রমপল্লবিত হয়েছে। জমিদারির পিছুটান ছিলই। ক্রমে সে-বাধা দূর হয়েছে একটু-একটু করে, শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে। পল্লি-সংগঠন, পল্লি-উন্নয়ন— এসব কথা শুধু কথার কথা হয়েই থেকে যায়নি। তাঁর বিশ্বাস ছিল, দেশ থেকে শুধু বিদেশিদের তাড়ালেই দেশ স্বাধীন হবে না। দেশের মানুষ স্বাবলম্বী না-হলে প্রকৃত স্বাধীনতা আসবে না।

বিপুল সৃষ্টিকর্মের পাশাপাশি তাঁর এই কর্মোদ্যোগের তিনটে পর্ব আমরা দেখতে পাই। প্রথমে শিলাইদহে, ১৯০৭-০৮ সালে। পরে সেই উদ্যোগেরই কিছু বিস্তৃত রূপ দেখা যায় পতিসরে, ১৯১৫ সালে।

তিনি ছিলেন নিখুঁতের প্রত্যাশী। তাই ওই দুই পর্বের আংশিক ব্যর্থতা তাঁকে সাময়িকভাবে হতাশ করেছে। একথা ভাবলে আশ্চর্য না হয়ে পারা যায় না যে, যিনি চাইতেন প্রতিটি কাজ হবে ফুলের পাপড়ির মতো নিখুঁত, সুন্দর, মৌলিক, সৌরভপূর্ণ; তিনি কী করে সারা জীবন এত অজস্র কাজ করতে পেরেছেন!

কিন্তু তাঁর হতাশা ছিল সাময়িক। সেই হতাশার চেয়ে অনেক-অনেক বড়ো ছিল স্বপ্ন। আর, স্বপ্নকে রূপ দেওয়ার নম্রকঠিন প্রতিজ্ঞা।

অবশেষে, শিলাইদহ আর পতিসরের গ্রামোন্নয়নের স্বপ্ন পরিণতি পেল শ্রীনিকেতনে। রবীন্দ্রনাথ অনেক দিন থেকেই ভাবছিলেন, জ্ঞানযোগের সঙ্গে কর্মযোগ যুক্ত না হলে শিক্ষা পূর্ণতা পেতে পারে না। খুঁজছিলেন কী করে সেটা হতে পারে। তাঁর সেই খোঁজার পর্বেই রবীন্দ্র-কবিতার অনুরাগী লেনার্ড নাইট এলমহার্স্টের সঙ্গে কবির পরিচয় হল নিউ ইয়র্কে, ১৯২০ সালে। এলমহার্স্ট তখন কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিশাস্ত্রের ছাত্র। তাঁর প্রিয় কবি এলমহার্স্টকে আসতে বললেন শান্তিনিকেতনে। আর, পরের বছরই শান্তিনিকেতনে দুইয়ের মিলন হল ১৯২১ সালের ২৭ নভেম্বর। এক আমগাছের ছায়ায় বসে রবীন্দ্রনাথ আর এলমহার্স্ট শ্রীনিকেতনের কর্ম-পরিকল্পনা নিয়ে লম্বা কথা বললেন। তার মাত্র আড়াই মাস পর আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়ে গেল শ্রীনিকেতনের কাজ। সেদিনটি ছিল ১৯২২ সাল, ১৭ ফেব্রুয়ারি।

সূচনালগ্নে নাম ছিল 'স্কুল অফ এগ্রিকালচার'। পরে নাম পালটে হয় শ্রীনিকেতন। রবীন্দ্রনাথের সেই উদ্দেশ্য যে দেশময় সত্যি-সত্যিই ছড়িয়ে পড়বে একদিন, সেদিন সন্দেহ ছিল অনেকেরই। ওই যে তিনি বলেছিলেন, 'বীজের মধ্যে যে প্রত্যাশা সে থাকে মাটির নীচে গোপনে। তাকে দেখা যায় না বলেই তাকে সন্দেহ করা সহজ।'

কুঠিবাড়ি এবং আশপাশের জমি বহু আগেই রবীন্দ্রনাথের কেনা ছিল চুয়ান্ন হাজার ন-শো ষাট টাকায়। সে সম্পত্তি কোন কাজে লাগবে, অতি নিকটজনও স্পষ্ট জানতেন না। প্রতিষ্ঠানটি হওয়ার সময় সবাই আন্দাজ করলেন। তার পরের পুরো অর্থটাই দেন এলমহার্স্টের শুভার্থী, বান্ধবী, পরে স্ত্রী— ডরোথি হুইটনি স্ট্রেট। ডরোথি প্রথম দফায় দিয়েছিলেন পঁচিশ হাজার ডলার, যেটা দিয়ে কাজ শুরু হয়। বলা হয়, রবীন্দ্রনাথের নোবেল-অর্থ দানের আগে-পরে এত বড়ো দান আর কেউ বিশ্বভারতীকে করেননি। এলমহার্স্ট বহু বার এসেছেন। কিন্তু সে-যাত্রায় ছিলেন মাত্র চোদ্দো মাস। অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে কাজ শুরু হয় মাত্র দশ জন ছাত্র নিয়ে। রথীন্দ্রনাথ, সন্তোষ মজুমদার, গৌরগোপাল ঘোষ— এঁদের ওপর ভার ছিল শ্রীনিকেতনের। আর ছিলেন গ্রামোন্নয়নে নিবেদিত প্রাণ কালীমোহন ঘোষ। এলেন কাসাহারি নামের এক জাপানি ভদ্রলোক, যিনি কাঠের কাজের সঙ্গে হাঁসমুরগি পালন এবং বাগান পরিচর্যায় ছিলেন দক্ষ। গড়ে উঠতে সময় লেগেছে। একটু একটু করে প্রসার ঘটেছে নতুন নতুন কর্মশিক্ষার। ১৯২৭-এর ১৭ সেপ্টেম্বর জাভা থেকে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'আমি যখন চলে আসছি আমাদের নিমন্ত্রণকর্তা আমাকে খুব একটি মূল্যবান উপহার দিলেন। বড়ো একটি বাটিক শিল্পের কাপড়। বললেন, এইরকমের বিশেষ কাপড় রাজবংশের ছেলেরা ছাড়া কেউ পরতে পায় না। সুতরাং এ জাতের কাপড় আমি কোথাও কিনতে পেতুম না।' তারপর থেকে শুরু হল বাটিক শিল্পের চর্চাও, যা আজ অতি প্রসিদ্ধ।

তিন

কেন শ্রীনিকেতন? অনেক বার অনেকভাবে তাঁর উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। আমরা শ্রীনিকেতন শিল্পভাণ্ডার উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ-প্রদত্ত ভাষণের কিছু অংশ এখানে পড়ব:

> 'আজ প্রায় চল্লিশ বছর হল শিক্ষা ও পল্লীসংস্কারের সংকল্প মনে নিয়ে পদ্মাতীর থেকে শান্তিনিকেতন আশ্রমে আমার আসন বদল করেছি। আমার সম্বল ছিল স্বল্প, অভিজ্ঞতা ছিল সংকীর্ণ, বাল্যকাল থেকেই একমাত্র সাহিত্যচর্চায় সম্পূর্ণ নিবিষ্ট ছিলেম।
>
> কর্ম উপলক্ষে বাংলার পল্লীগ্রামের নিকট-পরিচয়ের সুযোগ আমার ঘটেছিল। পল্লীবাসীদের ঘরে পানীয় জলের অভাব স্বচক্ষে দেখেছি, রোগের প্রভাব ও যথোচিত অন্নের দৈন্য তাদের জীর্ণ দেহ ব্যাপ্ত করে লক্ষগোচর হয়েছে। অশিক্ষায় জড়তাপ্রাপ্ত মন নিয়ে তারা পদে পদে কিরকম প্রবঞ্চিত ও পীড়িত হয়ে থাকে তার প্রমাণ বার বার পেয়েছি। সেদিনকার নগরবাসী ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায় যখন রাষ্ট্রিক প্রগতির উজান পথে তাঁদের চেষ্টা-চালনায় প্রবৃত্ত ছিলেন তখন তাঁরা চিন্তাও করেন নি যে জনসাধারণের পুঞ্জীভূত নিঃসহায়তার বোঝা নিয়ে অগ্রসর হবার আশার চেয়ে তলিয়ে যাবার আশঙ্কাই প্রবল।...
>
> আমার সেদিনকার মনের আক্ষেপ কেবল যে কোনো কোনো কবিতাতেই প্রকাশ করেছিলুম তা নয়, এই লেখনীবাহন কবিকে অকস্মাৎ টেনে এনেছিল দুর্গম কাজের ক্ষেত্রে। দরিদ্রের একমাত্র শক্তি ছিল মনোরথ।
>
> খুব বড়ো একটা চাষের ক্ষেত্র পাব এমন আশাও ছিল না, কিন্তু বীজবপনের একটুখানি জমি পাওয়া যেতে পারে এটা অসম্ভব মনে হয় নি।
>
> বীরভূমের নীরস কঠোর জমির মধ্যে সেই বীজবপন কাজের পত্তন করেছিলুম। বীজের মধ্যে যে প্রত্যাশা সে থাকে মাটির নীচে গোপনে। তাকে দেখা যায় না বলেই তাকে সন্দেহ করা সহজ। অন্তত তাকে উপেক্ষা করলে কাউকে দোষ দেওয়া যায় না। বিশেষত আমার একটা দুর্নাম ছিল আমি ধনীসন্তান, তার চেয়ে দুর্নাম ছিল আমি কবি। মনের ক্ষোভে অনেকবার ভেবেছি যাঁরা ধনীও নন কবিও নন সেই-সব যোগ্য ব্যক্তিরা আজ আছেন কোথায়।...'

ওই একই ভাষণে কবি বলছেন—

> 'সৃষ্টিকাজে আনন্দ মানুষের স্বভাবসিদ্ধ, এইখানেই সে পশুদের থেকে পৃথক এবং বড়ো। পল্লী যে কেবল চাষবাস চালিয়ে আপনি অল্প পরিমাণে খাবে এবং আমাদের ভূরিপরিমাণে খাওয়াবে তা তো নয়। সকল দেশেই পল্লীসাহিত্য পল্লীশিল্প পল্লীগান পল্লীনৃত্য নানা আকারে স্বতঃস্ফূর্তিতে দেখা দিয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে আধুনিক কালে বাহিরে পল্লীর জলাশয় যেমন শুকিয়েছে, কলুষিত হয়েছে, অন্তরে তার জীবনের আনন্দউৎসেরও সেই দশা। সেইজন্যে যে রূপসৃষ্টি মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম, শুধু তার থেকে পল্লীবাসীরা যে নির্বাসিত হয়েছে তা নয়, এই নিরন্তর নীরসতার জন্যে তারা দেহে-প্রাণেও মরে।...
>
> আমার ইচ্ছা ছিল সৃষ্টির এই আনন্দপ্রবাহে পল্লীর শুষ্কচিত্তভূমিকে অভিষিক্ত করতে সাহায্য করব, নানা দিকে তার আত্মপ্রকাশের নানা পথ খুলে যাবে। এই রূপসৃষ্টি কেবল ধনলাভ করবার অভিপ্রায়ে নয়, আত্মলাভ করবার উদ্দেশে। একটা দৃষ্টান্ত দিই। কাছের কোনো গ্রামে আমাদের মেয়েরা সেখানকার মেয়েদের সূচিশিল্পশিক্ষার প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁদের কোনো একজন ছাত্রী একখানি কাপড়কে সুন্দর করে শিল্পিত করেছিল। সে গরিব ঘরের মেয়ে। তার শিক্ষয়িত্রীরা মনে করলেন ঐ কাপড়টি যদি তাঁরা ভালো দাম দিয়ে কিনে নেন তা হলে তার উৎসাহ হবে এবং উপকার হবে। কেনবার প্রস্তাব শুনে মেয়েটি বললে, 'এ আমি বিক্রি করব না।' এই-যে আপন মনের সৃষ্টির আনন্দ, যার দাম সকল দামের বেশি, একে অকেজো বলে উপেক্ষা করব নাকি? এই আনন্দ যদি গভীরভাবে পল্লীর মধ্যে সঞ্চার করা যায় তা হলেই তার যথার্থ আত্মরক্ষার পথ করা যায়।... আমাদের কর্মব্যবস্থায় আমরা জীবিকার সমস্যাকে উপেক্ষা করি নি, কিন্তু সৌন্দর্যের পথে আনন্দের মহার্ঘতাকেও স্বীকার করেছি।'

উদ্ধৃতি বেশ দীর্ঘ হল ভোপালে দেখা আমাদের ওই মেয়েটির জন্যে। মেয়েটি হয়তো অনেক কিছুই করতে সক্ষম ছিল। হয়তো ছিল না। কিন্তু যে-কাজটি নিজের জন্যে উপযুক্ত মনে করে সে বেছে নিয়েছে, সেই কাজটিকে তো আমাদের শ্রদ্ধা না-করে উপায় নেই। কেননা, বাঙালি-ভীরুতাকে জয় করে 'মাস গেলে মাইনে পাই, চাকরি করে চিকেন খাই'-গোছের নিরাপদ ঘেরাটোপের বাইরে সে তার পা ফেলতে পেরেছে। কোনো অভয়বাণী কি শুনতে পেয়েছিল সে? কার?

চার

ট্রেনে যাঁরা বোলপুর যাওয়া-আসা করেন, এমন সব হকারদের মুখোমুখি তাঁদের হতেই হয়, যাঁদের পণ্য আজ বহুদিন হল শান্তিনিকেতনি হস্তশিল্প নামে পরিচিত। শান্তিনিকেতন বেড়াতে গেলে খোয়াইয়ের হাটেও আজকাল যেতে হয়, সস্তায় ওই একই জিনিস পাওয়ার লোভে। ট্রেনে এমন যাত্রী দেখেছি, যিনি পেল্লায় বোঁচকা নিয়ে কলকাতা আসছেন। বোঁচকা-ভর্তি

শান্তিনিকেতনি গয়না, বাটিক অথবা কাঁথা স্টিচের শাড়ি বা অন্য পোশাক, ব্যাগ এবং আরও রকমারি জিনিসপত্র।

কোথায় যাবে এগুলো? বড়বাজার। দক্ষিণাপণ। বার বার প্রশ্ন করেও অনেকসময় ঠিক উত্তরটি পাওয়া যায় না। কেন?

এইসব হস্তশিল্প আসলে শ্রীনিকেতনের তৈরি নয়। এমনকী নয় আমার কুটিরেরও। তাহলে?

এখানে আমার কুটিরের কথা আসবে। শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার কিছু পরে স্বাধীনতা সংগ্রামী সুষেম মুখোপাধ্যায় শ্রীনিকেতনের অদূরে প্রতিষ্ঠা করেন আমার কুটির, কিছুটা শ্রীনিকেতনেরই আদলে। উদ্দেশ্য অনেকটাই শ্রীনিকেতনের মতো। আজ আমার কুটিরের সঙ্গে যুক্ত প্রায় বারো-শো কর্মী। তাদের উৎপাদিত জিনিসপত্র এখন কেনে মূলত ভারত সরকারের হস্তশিল্প দপ্তর। বাৎসরিক বিক্রির পরিমাণ পাঁচ কোটি টাকার মতো। শ্রীনিকেতন আর আমার কুটির থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বহু ছাত্র-ছাত্রী এখন নিজেদের উদ্যোগে একই কাজ করছেন। বীরভূম জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে মূলত মহিলারা আজ ব্যস্ত এই হস্তশিল্পের জোগান দিতে। কোথায়, কোন পদ্ধতিতে কাজ হচ্ছে, কারা করছেন, বড়ো একটা গবেষণা করলে জানা যেতে পারে সেসব তথ্য।

তাই, যাকে আমরা শান্তিনিকেতনি হস্তশিল্প বলি, তার বাজারের হিসেব করে ওঠা অসম্ভবই। আন্দাজ করেন কেউ কেউ, হতে পারে অঙ্কটা পনেরো কোটির কম নয়। এ তো গেল প্রত্যক্ষভাবে বোলপুর-শান্তিনিকেতনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ব্যস্ততার এক জগৎ। ঠিক একইভাবে, প্রথমে কেন্দ্রীয় স্তরে এবং পরে রাজ্যে রাজ্যে, দেশীয় কৃষিব্যবস্থা আর হস্তশিল্পকে— যা ছিল দীর্ঘ অবহেলায় মুমূর্ষু— স্বাধীনতার পর সরকারি উদ্যোগে ঢেলে সাজানোর চেষ্টা শুরু হয়। আমরা ভুলে যাই, সেই কাজে এক কবির দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্নের, কত পরিকল্পনার, সময় আর সম্পদ ত্যাগের, কত-কত শ্রমের দাগ লেগে আছে।

শিল্পী : সুরজিৎ সরকার

সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে

তপস্যা ঘোষ

একদিন কলেজের ক্যান্টিনে এক সহকর্মীর সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিলাম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার নতুন সিলেবাস নিয়ে কথা হচ্ছিল। তিনি হঠাৎ বললেন, দেখেছেন কত মুসলমানকে ঢুকিয়েছে নতুন সিলেবাসে। কে পড়াবে এসব? আরে, বাংলাদেশের সাহিত্য এবার সিলেবাসে ঢুকেছে তো! কিন্তু তিনি মন থেকে এটা মেনে নিতে পারছেন না। মনে পড়ে গেল, ছেলেবেলায় পড়া এস ওয়াজেদ আলির 'ভারতবর্ষ' গল্পের লাইন, 'সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে। কোথাও তার পরিবর্তন ঘটেনি'। বাঙালি চেতনায় এই *বাক্যবন্ধ* গেঁথে আছে। আমাদের প্রজন্ম স্কুলপাঠ্য বাংলা গল্প-সংকলনে এইসব গল্প পড়তে পড়তে নিজেদের সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু ট্র্যাডিশন অ-ব্যাহত। হিন্দু-মুসলমান ব্যবধান ক্রমপ্রসরমান।

কীভাবে তৈরি হয়েছিল গল্পটি? বাঙালি মুসলমান এই লেখক পথ চলতে চলতে কলকাতার এক মুদিখানায় সপরিবারে একইভাবে রামায়ণপাঠের দৃশ্য দেখেছিলেন দু-বার, পঁচিশ বছরের ব্যবধানে; দৃশ্য অবিকল; তাঁর মনে হয়েছিল, 'আমি দিব্যচক্ষু পেয়েছি। প্রকৃত ভারতবর্ষের নিখুঁত একটি ছবি আমার চোখের সামনে ফুটে উঠল।' পারিবারিক এই রামায়ণচর্চায় মুগ্ধ হয়েছিলেন আলি, অনুভব করেছিলেন ট্র্যাডিশন ও সংস্কৃতি। সংস্কৃতির ট্র্যাডিশন।

'ভারতবর্ষ' বেরিয়েছিল ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে 'মোহাম্মদী' পত্রিকায়। দৈনন্দিন একটি তুচ্ছ দৃশ্য; লেখকের উপলব্ধি সেটিকে চিরন্তন করে দিল; একটি প্রবচনের জন্ম হল; সেটি বাঙালি মননে গেঁথে গেল, ধর্মীয় দেওয়াল খাড়া হয়ে রইল আমাদের মাঝে তবুও। ওয়াজেদ আলি তাঁর সাহিত্যচর্চায় আজীবন ওই দেওয়ালটুকু ভাঙতে চেয়েছিলেন। তাঁর জন্ম ১৮৯০-এ, মৃত্যু ১৯৫১। বিশ শতকের এই পঞ্চাশ বছরে বাঙালি মুসলমান চেয়েছে তার জাতিপরিচয় জোরদার করতে। তাতে শামিল ছিলেন এই লেখকও। তাঁর লেখার ভরকেন্দ্র অখণ্ড বাঙালি জাতিপরিচয়। 'সাহিত্য' প্রবন্ধে তাঁর অকপট উচ্চারণ 'আমি মুসলমান সমাজের বটে, কিন্তু তারও উপর আমি মানুষ, আমি ভারতবাসী বটে, কিন্তু তারও উপর আমি মানুষ, আমি বাঙালি বটে, কিন্তু তারও উপর আমি মানুষ।' মানবতাবাদের চর্চায় নিয়োজিত ধর্মপ্রাণ ওয়াজেদ ধর্মপরিচয়কে গৌণ করেছেন বরাবর। তাঁর ক্ষোভ, বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কৃষ্টির বিকাশ না হওয়ার দায় সম্পূর্ণভাবে মুসলমানের, হিন্দুর নয়। কারণ উচ্চশিক্ষিত মুসলমান বাংলাচর্চা করে না। ফলে বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের প্রভাবের অভাব রয়ে গেছে। ধর্মীয় বিভাজন সাহিত্যের বিকাশের অন্তরায়। মুসলমানের রক্ষণশীলতা আর বাংলা-ঔদাসীন্য তাকে বাংলা সাহিত্য থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। আলির অভিযোগ, শুধুমাত্র বাঙালি মুসলমানই নিজের জাতিপরিচয়ের চেয়ে ধর্মপরিচয়কে বেশি প্রাধান্য দেয়, তাই বাংলা সাহিত্য তার আপন হয়ে ওঠেনি। 'একজন বাঙালি মুসলমানকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে কিন্তু বলবেন তিনি মুসলমান। তার দেশ কোথা জিজ্ঞাসা করলে বলবেন নোয়াখালি কিংবা কুমিল্লা; হুগলি কিংবা বর্ধমান। সোজাসুজি বাঙালি বলে পরিচয় দিতে যেন তাঁর কুণ্ঠা আসে।' এই হীনম্মন্যতাই বাঙালি মুসলমানের জাতি-অহংকারকে খর্ব করে রেখেছে।

উনিশ শতক এবং বিশ শতক জুড়ে বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের অনুসন্ধান-প্রক্রিয়া নিয়ত সঞ্চরমান। সভাসমিতি বা পত্রপত্রিকায় এ-বিষয়ে নিরন্তর আলোচনা বা তর্কবিতর্কে মুসলমান তার জাতিপরিচয় নির্ধারণে উন্মুখ। ধর্ম ও জাতিসত্তার দ্বন্দ্ব প্রকট হয়েছে ক্রমশ; বিশ শতকেও এই একইভাবে চলেছে বিরোধ ও সমন্বয়-প্রক্রিয়া। বস্তুত মুসলমানের এই দ্বন্দ্ব আজও সমাজকে দ্বিধাবিভক্ত করে রেখেছে। সভাসমিতি বা পত্রপত্রিকার মধ্যে যেহেতু গোষ্ঠীচেতনার প্রকাশ ঘটে, তাই এগুলো থেকেও মুসলমানের অবস্থান বোঝা যায়। সভাসমিতিগুলোতে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত প্রয়াস কিন্তু দেখা যায় না। কোনো যে বাধা ছিল এমন নয়, এক অলক্ষ্য ও অলঙ্ঘ্য ব্যবধান থেকেই গিয়েছিল। ওয়াজেদ আলিও এ সম্পর্কে সচেতন করেছেন তাঁর রচনাবলিতে। তাঁর মতে এ-ব্যবধান ঘোচানোর একটিই পথ— সাহিত্য। আর 'বাঙালির

স্বতন্ত্র জাতীয়তাবাদের' ওপর আস্থা ছিল তাঁর। তাঁর দেশপ্রেমের ধারণায় খিলাফত বা প্যান-ইসলামিজমের কোনো জায়গা ছিল না। যে দেশপ্রেম ওই অচলায়তনকে ঘিরে সাম্প্রদায়িকতার আবর্তে পাক খায়, তা কখনো ন্যায়বোধ চরিতার্থ করে না। তিনি যে মুসলমান সাহিত্য কল্পনা করেন, তার অবলম্বন হবে পরিবর্তন-গতি-নতুনত্ব, 'ডায়নামিক শ্রেণির মানুষ'। 'সাহিত্যের কারবার আচারপন্থী মুসলমানদের নিয়ে নয়, তার কারবার হল আদর্শপন্থী মুসলমানদের নিয়ে; প্রাণহীন মুসলমানদের নিয়ে নয়, জীবন্ত-চলন্ত মুসলমানদের নিয়ে; সাহিত্য জড়ের ধর্ম প্রকাশ করে না, প্রাণের ধর্মই প্রকাশ করে; সাহিত্যের কারবার ডোবাকে নিয়ে নয়, সমুদ্রকে নিয়ে— স্রোতস্বতীকে নিয়ে'। দাঁড়ি-গোঁফ-পোশাক এবং আচারবিচার ইত্যাদি নিয়ে ধর্মীয় বাড়াবাড়ি করার ফলে মুসলমানের একটা স্থবির চেহারা সকলের চেতনায় বাসা বাঁধে। লেখক এই বদ্ধ জলাশয় থেকে মুক্তি চান মুসলমানের।

ওয়াজেদ আলি স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষেও সওয়াল করে বলেছেন, জাতির মঙ্গলের জন্য পর্দাপ্রথা দূর করা একান্ত প্রয়োজন। 'অবশ্য ইসলাম স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের জন্য হিজাব বা শালীনতার যে সীমা নির্দেশ করে দিয়েছে, তাকে অতিক্রম করার প্রয়োজন আমাদের নেই'। ধর্ম নিয়ে মজে না থেকে মাতৃভাষায় অর্থাৎ বাংলায় 'জাতীয় সাহিত্য' সৃষ্টি করে মুসলমান তার নিজস্ব পরিচিতি তৈরি করুক। 'আমাদের মধ্যে এখনও পর্যন্ত কোনো উল্লেখযোগ্য সাহিত্য গড়ে ওঠেনি বলে' হয়তো মুসলমান পিছিয়ে পড়েছে, কিন্তু সাহিত্যের মাধ্যমে তা গড়ে তোলা সম্ভব, এমনটাই তাঁর অভিমত। বাঙালি মুসলমানের ইতিহাসচেতনার অভাব এবং সংবাদপত্রের অনস্তিত্ব তাদের পিছিয়ে থাকার অন্যতম কারণ বলে মনে করেন তিনি। এর প্রতিকারের উপায় হিন্দু বা মুসলমান এই ধর্মান্ধতাকে পেরিয়ে 'হিন্দুস্থানি' হয়ে ওঠা।

অবশ্য বিশ শতকের শুরু পর্যন্ত মুসলমান কোনো উল্লেখযোগ্য সাহিত্য রচনা করেনি, এ-কথাটির মধ্যে অতিশয়োক্তি আছে। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ থেকে মুসলমান রচিত বাংলা উদাহরণ পাওয়া যায়; ধর্মকেন্দ্রিক সাহিত্য হয়েও যা মানবতাবাদের ধারা আশ্রয় করেছে। উনিশ শতক থেকে এ-ধারা আরো জোরদার। দোভাষী পুঁথির যুগ পেরিয়ে বাংলা গদ্যসাহিত্যেও মুসলমানের আত্মপ্রকাশ ঘটে। হয়তো সেসব লেখায় সাহিত্যগুণ তেমন নেই, কিন্তু ইতিহাসের খাতিরে সেগুলিকে আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি না। ক্রমশ উনিশ শতকের শেষ দিকে সাহিত্য একটু একটু করে পরিণত হয়েছে। গদ্য, কবিতা, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাঙালি মুসলমানের পদক্ষেপণে বাংলা সাহিত্য সম্পন্ন হয়েছে। ১৯৪৭-এ দেশবিভাগ-পরবর্তী পূর্ববঙ্গীয় বাংলা সাহিত্য এবং বাংলাদেশের সাহিত্য নিজস্ব ঘরানা তৈরি করতে পেরেছে। আলি যে পঞ্চাশ বছর প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত প্রকাশ করেছেন, তখনও মুসলমান আত্মপ্রকাশে পরাঙ্মুখ ছিল না। এমনকী বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস তৈরিতেও তাঁরা পিছিয়ে ছিলেন না। ১৯১৮ সালে আহসান উল্লা লিখেছিলেন 'বঙ্গভাষা ও মুসলমান সাহিত্য'; এটি সাহিত্য-ইতিহাস না হলেও সাহিত্য-ইতিহাসের ভঙ্গিতে লেখা; আদতে এটি বক্তৃতা হলেও পরে ছাপা হয়েছিল। ১৯৩৫ সালে লেখা হয়েছিল 'আরকান রাজসভার বাংলা সাহিত্য'; লেখক মুহম্মদ এনামুল হক এবং আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ।

এর ফলে বাংলা সাহিত্যের পরিধি বিস্তৃত হল, বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হল, হিন্দুর সমান্তরালে মুসলমান রচিত সাহিত্য গোচরে এল, বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবিদের রচনায় ধর্মের মিলন সূচিত হল, দেববাদ অতিক্রম করে মানবীয় প্রেমের কথা শোনা গেল এবং উপাখ্যানমূলক কাব্যের ধারা জোরদার হল; ফলে এনামুল হক এবং আবদুল করিম সগর্বে লিখলেন, 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে বাঙ্গালার মুসলমানের যতটা হাত রহিয়াছে, হিন্দুদের ততখানি নহে। এদেশের হিন্দুগণ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্মদাতা বটে, কিন্তু তাহার আশৈশব লালন, পালন ও রক্ষাকর্তা বাঙ্গালার মুসলমান'। সাহিত্যের ইতিহাস যে জাতির ইতিহাসের আকর-গ্রন্থ হয়ে উঠতে পারে, এই বইটি তার প্রমাণ।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছিলেন বাঙালি আত্মবিস্মৃত জাত; এ-বিষয়েও মনে করা যায়, বাঙালি ট্র্যাডিশন মেনে চলেছে, ঐতিহ্যের অনেক কিছুই বাঙালি বিস্মৃত হয়েছে। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে অনেক লেখকই আলোচনার পরিধিতে আর আসেন না। তেমনই একজন এস ওয়াজেদ আলি। অথচ 'ভারতবর্ষ' গল্পটি ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত মাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রমের অন্তর্গত ছিল; তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস 'গ্রানাডার শেষ বীর'-ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার দ্রুতপঠন হিসেবে ১৯৪৩ সালে এবং 'আকবরের রাষ্ট্রসাধনা' কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৫২ সালের প্রবেশিকা পরীক্ষার দ্রুতপঠন হিসেবে অনুমোদিত হয়। তাঁর এই ঐতিহাসিক উপন্যাস নিয়ে সমকালীন পত্রপত্রিকাও খুব উচ্ছ্বসিত হয়েছিল। *আনন্দবাজার, অমৃতবাজার, ভারতী* এবং *উদয়াচল* পত্রিকায় এই লেখার সহজতা এবং সাবলীলতা প্রশংসিত হয়েছিল; এটিকে অবশ্যপাঠ্য বলে মনে করা হয়েছিল।

আলির গল্প বিষয়েও সেই একই কথা খাটে। সব গল্পই যে রসোত্তীর্ণ, তা হয়তো নয়, কিন্তু প্রথাগত ধারণার বিপরীতে

মুসলমান সমাজ নিয়ে অন্য ছবি তৈরি হয়; মানবিকতার নতুন অভিমুখ চিনিয়ে দেন তিনি। তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টি প্রবন্ধ; বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে বিচরণ তাঁর; ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অথবা ব্যক্তিগত যেকোনো ধরনের প্রবন্ধের ভিত মানবিকতা এবং অসাম্প্রদায়িক ভারতবর্ষ। নবীদিবসের সভাপতিত্ব করতে গিয়ে তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য মোহাম্মদের প্রশংসা করার জন্য অন্য ধর্মের নিন্দা করা আত্ম-অবমাননারই নামান্তর; ওই সভায় নবীকে নিয়ে শ্রেষ্ঠ বক্তৃতাটি দিয়েছেন কিন্তু একজন হিন্দু। এই মিলনেই তিনি চেয়েছিলেন সকলকে মিলিত করতে। 'সাহিত্যের লক্ষ্য' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, মধ্যযুগে মুসলমান বিজেতার সঙ্গে এসেছিল 'প্রেমিক সুফিরা'; ভারত প্লাবিত হয়েছিল ভক্তি ও প্রেমে; কবীর, নানক, সুরদাস, শ্রীচৈতন্যের উদার মানবিকতায় স্বপ্ন জন্ম নিয়েছিল। এরই পরিণামে 'সাধকসম্রাট আকবর'-এর আবির্ভাব। আলির 'আকবরের রাষ্ট্রসাধনা' লেখার প্রেরণাও এটাই। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার নির্যাস 'আফ্রিদি তরুণী' স্বাধীনব্যক্তিত্ব এক মেয়ের আখ্যান; ১৯১৬ সালে প্রথম মহাযুদ্ধে সৈনিক হওয়ার সুবাদে যা সঞ্চয় করেছিলেন আলি।

হিন্দু লেখকরা যেভাবে 'সংস্কৃতবহুল সমাসাদিপূর্ণ পদের ব্যবহার ত্যাগ করে' সহজ বাংলায় লিখেছেন, মুসলমান লেখকরা সে-পথ অস্বীকার করে জটিল ভাষা আশ্রয় করেছেন। লেখার স্বতঃস্ফূর্ততা আহত হয়েছে তার ফলে। তাঁর মতে মুসলমানের আগ্রহ রক্ষণশীলতায়। 'বাঙালি মুসলমানের সাহিত্য সমস্যা' প্রবন্ধে আলি অন্বেষণ করেছেন সমস্যার মূল; বাঙালি মুসলমান এতদিন পর্যন্ত বাংলা ভাষার চর্চাকে দূষণীয় মনে করেছেন; 'তাঁদের কথ্য ভাষার এবং রুচির পরিচর্তনের সঙ্গে বাঙ্গালার সাহিত্যিক ভাষার কোনো organic সম্বন্ধ আছে, সে-কথা তাঁরাও ভাবেননি আর তাঁদের প্রতিবেশী হিন্দুরাও ভাবেননি।— বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ওপর বাঙ্গালি হিন্দুর একাধিপত্য এখন শেষ হতে বসেছে। অনেক দেখে ও অনেক ঠকে বাঙ্গালি মুসলমান পরের মাতৃভাষাকে ছেড়ে নিজের মাতৃভাষাকেই সাহিত্যের বাহনরূপে গ্রহণ করেছে'। দ্বিতীয়ত পরিভাষা-নির্মাণে হিন্দু লেখকরা সংস্কৃত ভাষার ভাণ্ডার ব্যবহার করেছেন; মুসলমান লেখকরা যদি আরবি ভাষা থেকে উপাদান সংগ্রহ করেন, তাহলে আপত্তি হওয়া উচিত নয়। তৃতীয়ত বাংলা বর্ণমালা মুসলমানের প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত নয়। 'বাঙ্গালি মুসলমানের সাহিত্যসাধনার পথ' প্রবন্ধে আলি লিখেছেন, 'বাঙ্গালা লিখনপ্রণালীর, অর্থাৎ বর্ণমালার সংস্কারও আমাদের কালচারের সন্তোষজনক অভিব্যক্তির জন্য একান্ত প্রয়োজন। বর্তমান বর্ণমালার সাহায্যে আমাদের নাম পর্যন্ত ভালো করে লেখা যায় না। nizam লিখতে হয় নিজাম; কেউ কেউ আবার লিখতে আরম্ভ করেছেন নিযাম। sultan-কে লিখতে হয় সুলতান, কেউ কেউ আবার লিখেন ছুলতান। বর্তমান বর্ণমালার সাহায্যে আরবি ও ফার্সি শব্দের অনুলিখন (transcription) সম্পূর্ণ অসম্ভব'। এই খুঁতগুলোর সংশোধন করা কালচারের যথোচিত বিকাশের জন্য অপরিহার্য।

এই সমস্যাগুলোর সমাধানও ভেবেছেনও আলি; প্রত্যেক জাতি তার কালচারের ভাষা থেকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা তৈরি করেছে; তাঁর আক্ষেপ, মুসলমানের পুঁথিসাহিত্য যদি ক্রমোন্নত হয়ে আধুনিক যুগের উপযোগী সাহিত্যে পরিণত হত, তাহলে কোনো অসুবিধে হত না; তা যখন ঘটেনি, তখন পুঁথিসাহিত্যের জগতে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। পুঁথিসাহিত্যের জগতে ফিরে গেলে হিন্দু ও মুসলমানের ব্যবধান বাড়বে বই কমবে না; অপরিচয় ক্রমপ্রসারিত হবে। ধর্মের পরিভাষা তৈরি হোক আরবি থেকে আর অন্যান্য পরিভাষা তৈরি হোক প্রয়োজনানুযায়ী যেকোনো ভাষা থেকে। মুসলমানের প্রয়োজনে বাংলা বর্ণমালায় কিছু নতুন হরফ তৈরি করার কথা ভেবেছেন তিনি। মান্য ভাষা প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, পশ্চিমবঙ্গের কথ্য ভাষার সঙ্গে লিখিত ভাষার যে সাদৃশ্য, বঙ্গের অন্য কোনো অংশের সঙ্গে তা নেই; এ-ভাষা মার্জিত ও শ্রুতিমধুর। বাংলার রাজধানী কলকাতাতেই বাংলার বিভিন্ন অংশের অধিবাসীর পারস্পরিক ভাববিনিময় হয়। এরই ফলে পশ্চিমবঙ্গের ভাষা গোটা বঙ্গদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কথ্য ও সাহিত্যিক ভাষায় পরিণত হয়েছে; এ-বিষয়ে আপত্তি না করে ওই ভাষাকে মান্যতা দিলে বাঙ্গালির 'প্রকৃত জাতীয় সাহিত্য' তৈরি হবে এবং যথাযথ ভাবপ্রকাশের বাহন হয়ে উঠতে পারবে।

একইসঙ্গে তিনি চেয়েছেন, শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কার। মক্তব, জুনিয়র মাদ্রাসা বা নিউ-স্কিম সিনিয়র মাদ্রাসা কোনোটিকেই তিনি উপযোগী বলে মনে করেননি। এদের সিলেবাস যথার্থ শিক্ষার প্রতিবন্ধক। আরবি ও উর্দু ভাষার মতো দুটো কঠিন ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার ফলে মুসলমান ছেলে-মেয়েরা পড়াশোনায় আগ্রহ হারায়। হাই স্কুলের সিলেবাস অনেক আধুনিক ও যুগোপযোগী। তা ছাড়া মুসলমান সমাজের জন্য যে ক-জন মৌলবী দরকার, তার জন্য ওই সিলেবাসটা সকলের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়। তাঁর মতে ধর্মশিক্ষাও হওয়া উচিত মাতৃভাষায়। আর মুসলমানদের উৎসব-অনুষ্ঠান পালন করতে হবে আনন্দের মধ্য দিয়ে; গানকে পাপ ভাবাটা ভুল; গান ছাড়া মনের মুক্তি অসম্ভব। গান, ছবি, নাটক ইত্যাদির অনুশীলনের মধ্য দিয়েই নিজেদের কৃষ্টিকে সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে। এসব ভাবনা রূপায়ণের জন্য তিনি একটি লিটারেরি একাদেমির প্রয়োজন বোধ করেছিলেন। কলকাতায় ১৯১১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'; প্রথম

সম্পাদক মনোনীত হন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। ১৯২৫ সালে এই সমিতির সভাপতি হয়েছিলেন আলি।

হুগলি জেলার তাজপুর গ্রামের এই মানুষটির গ্রামের স্কুলে লেখাপড়া শুরু হলেও পরবর্তী পড়াশোনা ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায়; ১৯১২ সালে যান ইংল্যান্ড এবং কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একইসঙ্গে বিএ এবং বার-অ্যাট-ল পাশ করেন। প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত সবুজপত্র পত্রিকাকে কেন্দ্র করে তাঁর সাহিত্যজীবনের সূত্রপাত হয়েছিল। ১৯৩২ সালে তিনি প্রকাশ করেন একটি সচিত্র বাংলা মাসিক 'গুলিস্তা'। এই সময়ে বাঙালি মুসলমান লেখকরা তাঁদের স্বতন্ত্র পরিচিতি তৈরি করে ফেলেছেন; পত্রপত্রিকা, সভাসমিতি, সাহিত্য-সংস্কৃতি ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই তাঁরা আলোড়ন তুলেছেন; উদারপন্থী, মধ্যপন্থী এবং রক্ষণশীলদের বিরোধ এবং সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে, ধর্ম ও জাতিসত্তার দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে এই আলোড়ন ক্রমশ দানা বেঁধেছে। হিন্দু-মুসলমান বিরোধ যে রয়েছে তা অস্বীকার করা যাবে না নিশ্চয়ই, কিন্তু নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে হিন্দু-মুসলমানসম্প্রীতির জন্য এঁরা সরব হয়েছেন বার বার।

শিল্পী : সুরজিৎ সরকার

সিনেমার চার পেয়াদা

সোমেশ্বর ভৌমিক

আসামীর সংখ্যা এক। কিন্তু সমাজপতি, ধর্মীয় নেতা আর প্রশাসনিক কর্তাদের চোখে তার ভূমিকা দিন-কে-দিন সন্দেহজনকই শুধু নয়, বিপজ্জনকও হয়ে উঠেছে। ফলে তাকে নিয়ন্ত্রণে বা বশে রাখার নানা আয়োজন ক্রমেই দানা বাঁধছে। চক্রব্যূহ তৈরি করা হচ্ছে তাকে ঘিরে। আপাতত তাকে পাহারায় রেখেছে চার পেয়াদা। এই লেখা সেই আসামী আর তার চার পেয়াদাকে নিয়ে।

পেয়াদা নম্বর ১

ভাবছি, কী বলতেন সত্যজিৎ রায় সঞ্জয় লীলা বনশালি পরিচালিত *পদ্মাবত* সিনেমাটি নিয়ে তুমুল তর্কবিতর্কের মধ্যে।

জানার কোনো উপায় নেই। তবু, পুরাণকথা আর সিনেমার সম্পর্ক নিয়ে তাঁর ভাবনার কিছুটা ইঙ্গিত তিনি দিয়েছিলেন ১৯৭০-এর দশকে লন্ডনের ন্যাশনাল ফিল্ম থিয়েটারে অনুষ্ঠিত এক আলোচনাচক্রে। সমালোচক ডেরেক ম্যালকমের প্রশ্নের উত্তরে সত্যজিৎ রায় জানিয়েছিলেন, মহাভারতের কোনো কোনো আখ্যান নিয়ে ছবি করার বাসনা থাকলেও সে-পথে উনি পা বাড়াননি ভারতীয় সেন্সর ব্যবস্থার কথা ভেবে। তাঁর কথায়, এই মহাকাব্যের জনপ্রিয় ভাষ্যগুলোয় ভীষ্ম, কৃষ্ণ, ধৃতরাষ্ট্র, যুধিষ্ঠির, কর্ণ, কুন্তী, দ্রৌপদীর মতো প্রধান কয়েকটি চরিত্রে এক ধরনের অতিমানবিক লক্ষণ আরোপিত হয়েছে। এর সুবাদে সাধারণ মানুষের মনে তাদের প্রত্যেকের এক-একটি কৃত্রিম মূর্তি তৈরি হয়েছে— কারও কারও ক্ষেত্রে সদর্থক, আবার কারও কারও ক্ষেত্রে নঞর্থক। এইসব মূর্তি আবেগ দিয়ে তৈরি, যুক্তি দিয়ে নয়, এমনকী তা করা হয়েছে হয়তো মূল ভাষ্যের পরিবর্তন ঘটিয়েই। ফলে তিনি যদি সিনেমার পর্দায় এদের দোষে-গুণে মেশানো চরিত্র হিসেবে দেখাতে চান, তাহলে তা সমস্যা তৈরি করতে পারে। বাড়তি আর-একটি বাধার কথাও বলেছিলেন সত্যজিৎ। একটা সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে শিল্পসম্মতভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্যে নানা ধরনের মানুষের মধ্যে বিচিত্র আর জটিল সব সম্পর্কের উল্লেখ আছে মহাভারতে, যেগুলোর সবই আজকের নৈতিক মাপকাঠিতে অনুমোদন পাবে না, আর সিনেমার পর্দায় সেসব দেখাতে গেলে অহেতুক সমস্যাও তৈরি হবে।

তখনও এদেশে হিন্দুত্বের রমরমা শুরু হয়নি। ফলে সত্যজিৎ কেবল সেন্সরের সমস্যার কথাই ভেবেছিলেন। বলা বাহুল্য, এদেশে শিল্প-সাহিত্যের আঙিনায় একমাত্র সরকারি পেয়াদার ভূমিকায় আজও সগৌরবে বিরাজ করছে কেন্দ্রীয় চলচ্চিত্র অনুমোদন পর্ষদ, যার পোশাকি নাম সেন্ট্রাল বোর্ড অব ফিল্ম সার্টিফিকেশন। অবশ্য সত্যজিৎ যখন কথাগুলো বলেছিলেন তখন সেটির নাম ছিল সেন্ট্রাল র্বোড অব ফিল্ম সেন্সরশিপ। ঔপনিবেশিক আমলে তৈরি এই ব্যবস্থাটিকে স্বাধীন ভারতেও চালু রেখে শুধু নয়, একটা কেন্দ্রীয় কাঠামোর মধ্যে এনে সকলকে অবাক করে দিয়েছিলেন জওহরলাল নেহরুর সরকার। ১৯৮২ সালে নামের বদল ছাড়া ১৯৫২ সাল থেকে একই কাজ করে যাচ্ছে এই সংস্থা।

ভারতের সিনেমা হলে কোনো ছবি দেখানোর আগে সে-ছবির প্রযোজক বা পরিচালক অথবা (বিদেশি ছবি হলে) আমদানিকারীকে বোর্ডের কাছে আবেদন জানাতে হয় ছাড়পত্রের জন্যে। বোর্ডের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা ছবির বিষয়, দৃশ্য, ভাষা ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে জনমানসে ছবির সম্ভাব্য অভিঘাত বিচার করে তাঁদের সুপারিশ জানান। সেই অনুযায়ী হয় ছবিটি অবিকল মুক্তি পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়, নয়তো কিছু সংশোধনের সাপেক্ষে ছাড়পত্র পায়। ক্ষেত্রবিশেষে অবশ্য বোর্ড ছবিটিকে নিষিদ্ধ বলেও ঘোষণা করতে পারে। ১৯৫২ সালে সংসদে পাস হওয়া ভারতীয় চলচ্চিত্র আইন মোতাবেক এই প্রাক্-অনুমোদনের ব্যবস্থাটি চালু আছে গত ছেষট্টি বছর ধরে।

আপাতদৃষ্টে নানারকম আইন-কানুন মেনেই এইসব কাজ করা হয়। যেমন, উল্লিখিত আইন অনুযায়ী তৈরি হয়েছে প্রয়োগবিধি বা রুল্স, তা ছাড়াও আছে ছবি বিচারের নানা মাপকাঠি দিয়ে তৈরি নির্দেশাবলী বা গাইডলাইনস। ফলে এটি একটি ত্রিস্তরীয় ব্যবস্থা। কিন্তু পর্ষদের দৈনন্দিন কাজের ক্ষেত্রে তৃতীয় স্তরের এই নির্দেশাবলীর প্রয়োগ নিয়ে প্রায় প্রতিদিনই

বিতর্ক ওঠে। মূল অভিযোগটি এই যে, বিভিন্ন ছবিতে এসবের প্রয়োগে বিশেষ সংগতি দেখা যায় না। এমনকী অনেকে বলেন, এগুলোর যৌক্তিকতাও প্রশ্নের ঊর্ধ্বে নয়। অবশ্য তার চেয়েও বড়ো কথা, মূল আইন বা সেই আইনের অধীনে প্রণীত প্রয়োগবিধি নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। ঠিক এই মুহূর্তে দেশের সর্বোচ্চ আদালতে এ-নিয়ে একটি মামলা চলছে, যেটি করেছেন বিশিষ্ট নাট্যনির্দেশক, পরিচালক এবং অভিনেতা অমল পালেকর।

এক বছরেরও বেশি সময় ধরে চলা এই মামলার রায় কী হয় সেটা ভবিষ্যৎ-ই বলবে। তবে আজকে দাঁড়িয়ে একমাত্র চলচ্চিত্র অনুমোদন পর্ষদকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারতেন না সত্যজিৎ। তাঁকে আরো ভাবতে হত হিন্দুত্ববাদীদের কথাও, যারা একটি নির্মীয়মাণ ছবির বিষয়ে নানা গুজবের ভিত্তিতেই মারমুখী হয়ে উঠেছিল।

প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো, *প্রতিদ্বন্দ্বী* ছবিতে একটি দৃশ্যে উনি নার্সদের নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছিল সত্যজিতের বিরুদ্ধেও। সমালোচনা করা হয়েছিল সেন্সর পর্ষদেরও। তবে এখন বিষয়টি নিয়ে বেশি জলঘোলা হয়নি। এটা ১৯৬৯ সালের ঘটনা। এর পঁচিশ বছর পরে অর্থাৎ ১৯৯৪ সাল থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে সেন্ট্রাল বোর্ড অব ফিল্ম সার্টিফিকেশন নাগরিকদের তরফে অভিযোগ জানানোর ব্যবস্থা চালু করেছেন। তারপরে আরো পঁচিশ বছর কাটতে চলল। বিষয়টি এখন প্রশাসন এবং পর্ষদ, উভয়েরই গলার কাঁটার মতো। দিনের পর দিন বেশি বেশি সংখ্যায় এইসব অভিযোগের ভিত্তি হয়ে দাঁড়াচ্ছে কোনো-না-কোনো সম্প্রদায়ের ভাবাবেগে আঘাত। বলা বাহুল্য, অভিযোগগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তুচ্ছ, উদ্দেশ্যমূলক, এমনকী উসকানিমূলকও। স্বাভাবিক কারণেই ভাবাবেগে আঘাতের মাত্রা নির্ধারণ করা, এমনকী সত্যতা যাচাই করারও কোনো স্বীকৃত পদ্ধতি সরকারের হাতে নেই। অথচ প্রশাসনিক নির্দেশে পর্ষদ প্রতিটি অভিযোগ খুঁটিয়ে দেখে সরকারের কাছে রিপোর্ট পাঠাতে বাধ্য। বিষয়টাকে সহজ করতে প্রশাসন তাই অভিযোগের ভাষার তীব্রতাকে মান্যতা দিয়ে, সেটিকে আইন-শৃঙ্খলার প্রশ্নে রূপান্তরিত করেন এবং ছবির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেন। তাই মাঝে মাঝেই শোনা যায়, স্থানীয় প্রশাসনের নির্দেশে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে কোনো ছবির প্রদর্শনীর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। এভাবেই পরিস্থিতি জটিল থেকে জটিলতর হয়। আর, সরকারেরই একটি প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব হ্রাস পায় জনতার চাপে।

পেয়াদা নম্বর ২

পদ্মাবত ছবিটা তৈরির সময় থেকেই এটা নিয়ে 'রাজপুত'-দের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছিল। বিশেষ কিছু না-জেনে, না-দেখেই 'রাজপুত'-দের কিছু স্বঘোষিত অভিভাবক আর নেতা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, এ-ছবি রানী পদ্মাবতী-র মর্যাদাহানি করেছে, ইতিহাস বিকৃত করে রাজপুত (এবং ফলত হিন্দু) ভাবাবেগে আঘাত করছে। এর পেছনে তথ্যের সমর্থন দেওয়ার দায় তাঁদের ছিল না। আসল কথা হল, এরকমই তাঁরা মনে করেছিলেন আর এককাট্টা হয়েছিলেন এ-ছবির প্রদর্শনী আটকানোর দাবিতে। যাঁরা এ-ছবির হয়ে কথা বলেছিলেন তাঁদের সবাইকে শারীরিক নির্যাতনের হুমকিও দেওয়া হয়েছিল। ফৌজদারি আইনের বিচারে এই হুমকি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কিন্তু তাঁদের কোনো শাস্তি হয়নি। বরং প্রসূন যোশি-র নেতৃত্বাধীন সেন্সর বোর্ড ছেঁদো অজুহাতে ছবির ছাড়পত্র পাওয়ার প্রক্রিয়াটিকে বিলম্বিত করেছে। এসবের মধ্যে একটি সংসদীয় কমিটিও তৈরি করা হয়েছিল সঞ্জয় লীলা বনশালি আর প্রসূন জোশি-র বক্তব্য শোনার জন্য। সেখানে গিয়ে বনশালি বলেছেন, উনি মূলত মধ্যযুগীয় কবি মালিক মহম্মদ জ্যায়সি-র 'পদ্মাবৎ' কাব্য অনুসরণে তাঁর ছবি তৈরি করেছেন। কিন্তু তাতে ইতিহাসেরও ছায়া আছে, আর সেক্ষেত্রে উনি যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করেছেন, বিস্তর গবেষণাও করেছেন। তাঁর কথা মানলে বলতে হয়, সিনেমার পর্দায় আক্ষরিক অর্থেই একটা সোনার পাথরবাটি দেখাতে চাইছিলেন উনি। আর তাঁরই কথার সূত্র ধরে প্রসূন জোশি বলেছিলেন, এ-ছবির ঐতিহাসিক যাথার্থ্য নির্ণয় করতে অনেক সময় লাগবে। অবশেষে কয়েক জন ইতিহাসবিদদের পরামর্শ নিয়ে ফিল্ম সার্টিফিকেশন বোর্ড এ-ছবিকে ছাড়পত্র দিয়েছেন। তাতে ছবিতে খুব যে কিছু বদল হয়েছে তা কিন্তু নয়। কালক্রমে সে-ছবি দেখে রাজপুত বাহুবলীর দল তাঁদের আপত্তিও প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। ফলে শেষপর্যন্ত শান্তিকল্যাণ।

কিন্তু একটা ছবি নিয়ে এই হট্টগোলের ব্যাপারটা এই জমানার একটা চেনা ছকের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে, যেখানে ইতিহাসের পাঠ বা ভাষ্য নিয়ে বেশ জোরদার বিতর্কের একটা আবহাওয়া তৈরি করা হচ্ছে। এমনকী ইতিহাস নিয়ে তন্নিষ্ঠ অনুসন্ধান আর গবেষণার দায় সম্পূর্ণ ঝেড়ে ফেলে একদল লোক বিশেষজ্ঞের জামা গায়ে পরে আজকাল কিংবদন্তিকেও ইতিহাসের আসনে বসাতে পিছপা হচ্ছেন না। আর তাঁদের কাজে উৎসাহিত হচ্ছেন বহু সংখ্যক সাধারণ মানুষ, যাঁদের বিশ্বাসে মিলায় রাম বা কৃষ্ণ, এমনকী পদ্মাবতীও। সেই উৎসাহেরই প্রতিফলন দেখা গেল *পদ্মাবত* সিনেমাটিকে ঘিরে। বলা ভালো, সিনেমায় এই নামের চরিত্রটিকে ঘিরে। রাজপুত জনতার দাবি ছিল, সিনেমার এই চরিত্র শুধু রাজপুত নারীদেরই নয়, অপমান করেছে তামাম হিন্দু নারীদের। জনতা শুধু দাবি করে ক্ষান্ত থাকলেও এত কথা উঠত না। প্রশাসনের প্রশ্রয়ে

রীতিমতো তাণ্ডব চালিয়েছে তারা। এবং কালক্রমে প্রমাণিত হয়েছে, গুজরাত আর হিমাচল প্রদেশের বিধানসভা ভোটের দিকে তাকিয়েই এইসব কার্যক্রম। ব্যাপারটা এতটাই ন্যক্কারজনক জায়গায় চলে গিয়েছিল যে, নিজে সংসদীয় কমিটির সদস্য হয়েও লালকৃষ্ণ আডবানি বলেছিলেন, সরকার নিযুক্ত ফিল্ম সার্টিফিকেশন বোর্ড থাকতে এরকম একটি কমিটির সামনে বিষয়টিকে তুলে আনা উচিত হয়নি। কোনো শ্রেয়োবোধ বা কাণ্ডজ্ঞান থেকে উনি কথাটা বলেছিলেন এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। তাঁর এই উক্তি যাকে বলে politically correct থাকার তাগিদে। তথ্য ও সম্প্রচার দফতরের প্রাক্তন মন্ত্রী হিসেব উনি ভালোই জানেন চলচ্চিত্র অনুমোদন পর্ষদের কাজের ধরন আর পরিধি। বিশেষ করে, অনুমোদন-প্রক্রিয়ার প্রায়োগিক পরিসরে যে বিধিতালিকা বা গাইড লাইনস ব্যবহার করা হয়, তাকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে অনুমোদন পর্ষদ যেকোনো ছবিকেই নিষিদ্ধ বা সংশোধন করতে পারে, সে ব্যাপারটি তাঁর মোটেই অজানা নয়।

সিনেমার সরকারি পেয়াদার যে দায়িত্ব, তার মূল কথা হল, সেন্সর বোর্ডকে দেখতে হবে যেন কোনো ছবি দেশের সার্বভৌমত্ব আর অখণ্ডতাকে প্রশ্ন না করে, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত না করে, জনশৃঙ্খলা ব্যাহত না করে বা বিশৃঙ্খলায় ইন্ধন না জোগায়, বিচারব্যবস্থাকে হেয় না করে বা আদালত অবমাননা না করে, সহ-নাগরিকদের মানহানি না করে, ব্যক্তিগত কুৎসা প্রচার না করে, অশ্লীলতার প্রচার না করে বা তাতে ইন্ধন না জোগায়, অথবা কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচার না করে। এই তালিকার তাৎপর্য এতই ব্যাপক যে এর সাহায্যে আজকের জমানায় কট্টর হিন্দুত্ববাদী থেকে সোচ্চার দেশপ্রেমিক সকলেরই চাহিদা পূরণ করা যাবে। তিনি যে-কথা ভেঙে বলেননি তা হল, রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ যথেষ্ট হয়েছে। আর এভাবেই বিষয়টিকে নিছক রাজপুত অস্মিতার মতো বায়বীয় ভাবাবেগের আঙিনা থেকে ইতিহাসের ঠিক-ভুলের প্রশ্নে ঘুরিয়ে দেওয়া গেছে। ঠিক জায়গায় (অর্থাৎ সেন্সর বোর্ডে) যথাযথ বার্তাও পৌঁছে গিয়েছে। এখন সেন্সর বোর্ডকে তাদের কাজ করতে দেওয়াই ভালো। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আডবানি বুঝতে পেরেছিলেন, অনেক দিন ধরে অহেতুক হট্টগোল আর তাণ্ডবে মানুষের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হতে পারে। তাই প্রচারিত হয়েছিল তাঁর চতুর সাবধানবাণী।

পদ্মাবত-কাণ্ড এদেশের সিনেমাজগতে একেবারে নতুন কোনো ঘটনা অবশ্য নয়। এর আগে দীপা মেহতা-র নির্মীয়মাণ ছবি *ওয়াটার* বা রোনাল্ড জফ-এর নির্মীয়মাণ ছবি *সিটি অব জয়* ঘিরে 'জনতা'-র এমন বিক্ষোভ আমরা দেখেছি।

পেয়াদা নম্বর ৩

সিনেমা হল ব্যবসায়িক পণ্য। সেই পণ্যের বাজারে পেয়াদার কোনো অভাব নেই। তাদের প্রধান কাজ বাজারে স্থিতাবস্থা বজায় রাখা। এই স্থিতাবস্থার অর্থ, যেসব সংস্থা ইতিমধ্যেই বাজারে জাঁকিয়ে বসে ব্যাবসা করছে, তাদের নতুন কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীকে সহজে বাজারে ঢুকতে না দেওয়া। প্রায় দেড়শো বছর ধরে পৃথিবীজুড়ে ব্যাবসা-বাণিজ্যের এটাই মূলমন্ত্র। তত্ত্বগতভাবে যতই অবাধ বাণিজ্য বা সরকারি নিয়ন্ত্রণহীন বাজারের চালিকাশক্তি হিসেবে সুস্থ প্রতিযোগিতার গুণগান করা হোক, আসল কথা হল প্রতিযোগিতাকে বাজার মোটেই ভালো চোখে দেখে না। ফলে পৃথিবীর অধিকাংশ বাজারেই প্রতিযোগিতার প-ও নেই। সিনেমার বাজারও এর ব্যতিক্রম নয়। এই বাজারকে কুক্ষিগত করে রাখে প্রযোজক, পরিবেশক আর প্রদর্শকের এক চক্র, যারা একে অন্যের সঙ্গে ব্যবসায়িক গাঁটছড়ায় বাঁধা। এরা ছবির বিষয় থেকে কাহিনি-বিন্যাস, শিল্পী-নির্বাচন, প্রযোজনার খুঁটিনাটি (যেমন স্টুডিয়ো, লোকেশন, কলাকুশলী নির্বাচন), প্রচারের কৌশল এবং সবশেষে মুক্তির দিন, সবকিছুই কঠোর নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করে। লগ্নিকারীরা এসব নিয়ে মাথা ঘামাবে বা পরামর্শ দেবে, সেটা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু আদতে লগ্নিকারীরা যা করে, তাকে বলা যায় নির্মাতাদের (অর্থাৎ পরিচালকদের) প্রতি নির্দেশ। পরামর্শ বা নির্দেশ, যা-ই বলি, এগুলো কালক্রমে বাজারের নিয়মে পরিণত হয়। যেসব পরিচালক এই নিয়মের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে ছবি করতে পারে, বাজারে জায়গা পাওয়ার ব্যাপারে তাদেরই অগ্রাধিকার। প্রযোজকদের দাক্ষিণ্যে তারা পায় পরিবেশক আর প্রদর্শকের আনুকূল্য। অন্যদের সামনে সারি সারি পাঁচিল। সেই পাঁচিল টপকে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়োজন ধৈর্য এবং অধ্যবসায়।

এখনকার সফল পরিচালক জুটি শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং নন্দিতা রায়ের যৌথ প্রচেষ্টার প্রথম ফসল ছিল *ইচ্ছে* নামের ছবি। ছবি তৈরি শেষ হওয়ার পর দীর্ঘ তিন বছর লেগেছিল এ-ছবির পর্দা পর্যন্ত পৌঁছোতে। বাজারের চলতি সব নিয়ম মেনে তৈরি হয়নি এ-ছবি। চলচ্চিত্র জগতে কিছু শুভানুধ্যায়ীর সুপারিশে নতুন প্রযোজকদের সাহায্য নিয়ে খানিকটা ইচ্ছেডানায় ভর করেই ছবি তৈরি করেছিলেন শিবব্রত-নন্দিতা। মধ্যবিত্ত-জীবনের টানাপোড়েন নিয়ে তৈরি এই ছবিতে ছিল না তারকার মেলা, আর তার সঙ্গে দৃশ্যের এবং শ্রুতির আড়ম্বর। ফলে অধুনা মাল্টিপ্লেক্সপ্রধান বাজারে এ-ছবির ভবিষ্যৎ নিয়ে দ্বিধায় ছিলেন কর্ণধারেরা। কিন্তু তাঁদের আশঙ্কাকে ভুল প্রমাণ করে দর্শকমহলে বিপুল সাড়া ফেলল এ-ছবি। এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি এই জুটিকে। তাঁদের তৈরি করা ছকটাই হয়ে উঠেছে সফল এক ঘরানা। এই

ঘরানা নিছক ব্যবসায়িক মডেলের গণ্ডি পেরিয়ে এখন এক সফল ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের জন্ম দিয়েছে, যারা বাজারের নিয়মটাকে খানিকটা প্রসারিত করেছে।

পরিচালক অনীক দত্তের প্রথম ছবি *ভূতের ভবিষ্যৎ*-ও অনিশ্চিত বাজারের আশঙ্কায় তৈরি হওয়ার পরে বহুদিন আটকে ছিল। বাংলা সিনেমার ইতিহাসে দর্শকধন্য কমেডি ছবির উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি সত্ত্বেও এ-ছবি সেই ঐতিহ্যের গড়পড়তা ঘরানাকে খানিকটা পাশ কাটিয়েই এগিয়েছে। এর মেজাজ বরং কিছুটা হলেও সত্যজিৎ রায়ের *পরশপাথর* বা মৃণাল সেনের *আকাশকুসুম*-এর উত্তরসূরি, যেখানে স্ল্যাপস্টিক, ফার্স আর স্যাটায়ারের মিশেল দিয়ে দর্শকদের আমোদিত করার চেষ্টা দেখা গেছে। পরশপাথর বা আকাশকুসুম দর্শকের আনুকূল্য পায়নি। এ-ছবি নিয়েও তাই বাজারের মাথাদের আশঙ্কা ছিল। কিন্তু সেই আশঙ্কাকে ভুল প্রমাণ করে এ-ছবি পেয়েছে অভাবনীয় সাড়া।

কিছুদিন আগে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তালনবমী' নামের ছোটোগল্প অবলম্বনে তৈরি একটি ছবি (*সহজ পাঠের গল্পো*) নিয়ে বেশ মজার ব্যাপার ঘটতে দেখলাম আমরা। এ-ছবি ঠিক মাল্টিপ্লেক্স ঘরানার নয়। শহুরে উচ্চ বা উচ্চ-মধ্যবিত্ত জীবনের তথাকথিত সমস্যার চর্বিতচর্বণ নেই তাতে। কিন্তু সমস্ত ছবিজুড়ে ছড়িয়ে আছে গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আঁকাড়া জীবনের স্পর্শ, যাদের জীবনে অচ্ছে দিনের গল্প হল এক দুঃস্বপ্নের পালা। অল্প বাজেটে তৈরি এই ছবির প্রচারেও ছিল না ঢক্কানিনাদ, যেমন থাকে মাল্টিপ্লেক্স ঘরানার ছবিতে। ফলে মুক্তি পাওয়ার পরে এ-ছবির গুণপনার কথা জানতে সময় লেগেছে মানুষের। আর বাজারের দোহাই দিয়ে ছবিটিকে হল থেকে তুলে দেওয়া হয়েছে বার বার। মানুষের দাবিতে ফিরিয়েও আনতে হয়েছে আবার। যতদূর মনে পড়ছে, তিন বা চার দফায় এ-ছবি দেখানো হয়েছে বিভিন্ন হল-এ। তাতে মোটামুটি ব্যাবসাও করেছে। কিন্তু বাজারের পেয়াদারা এতখানি সক্রিয় না হলে এ-ছবির ব্যাবসা যে আরো ভালো হত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অবাক করার মতো তথ্য হল এই যে, সেন্সর বোর্ড থেকে ছাড়পত্র পাওয়া ছবির মধ্যে প্রায় ২০ শতাংশ স্রেফ এই পেয়াদা চক্রের কারসাজিতেই বাজারে আসতে পারে না।

১৯৯৭ সালে মুম্বাইয়ে চলচ্চিত্র জগতের চাঁইরা মিলে একটা সংস্থা তৈরি করেছিলেন, মুম্বাই অ্যাকাডেমি অব মুভিং ইমেজ, বা সংক্ষেপে MAMI। MAMI-র একটি বার্ষিক প্রকল্প MAMI Mumbai Film Festival। গত কয়েক বছর ধরে এই উদ্‌যোগের মাথায় তাঁরা রেখেছেন মুকেশ আম্বানিকে। তাঁর বদান্যতার স্বীকৃতিতে উৎসবের নামের আগে জোড়া হয়েছে Jio। আমরা জানি এটি মুকেশ আম্বানি-র নতুন পণ্য, যা দিয়ে উনি ভারতের সংযোগ-দুনিয়ায় বিপ্লব আনতে চান।

তা, ২০১৬ সালের উৎসবটি ছবির সম্ভারের চেয়েও বেশি প্রচার পেয়েছিল তার পৃষ্ঠপোষকের উচ্চকিত দেশপ্রেম-প্রদর্শনীর কারণে। উৎসব শুরুর কয়েক দিন আগে কর্তৃপক্ষ জানালেন, সাম্প্রতিক ঘটনাবলির পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ আমন্ত্রিত একটি ছবি *জাগো হুয়া সবেরা*-কে উৎসব থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হল। তার পরেই মুকেশের হুংকার, আমি আগে ভারতীয়, তার পরে অন্য কিছু। তা ছাড়া আমি বুদ্ধিজীবীও নই। অস্যার্থ, তাঁর টাকায় আয়োজিত উৎসবে সংস্কৃতি বা ইতিহাসের খাতিরেও *জাগো হুয়া সবেরা* দেখানো যাবে না। এর একমাত্র কারণ, ১৯৫৯ সালে নির্মিত ছবিটি পাকিস্তানি। সত্যের খাতিরে বলে রাখা ভালো, মুকেশের এই ঘোষণার ঠিক আগেই ঘটে গেছে কাশ্মীরের উরিতে পাক জঙ্গিদের হামলা এবং বদলাস্বরূপ সীমান্ত পেরিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সার্জিকাল স্ট্রাইক। চলচ্চিত্র-প্রদর্শকরাও বললেন, মুম্বইয়ের যেসব ছবিতে পাকিস্তানি শিল্পী কাজ করেছেন, তাঁদের ছবি তাঁরা দেখাবেন না। আবার দেশপ্রেম, এবং সার্জিকাল স্ট্রাইক। এঁদের দেখাদেখি দেশপ্রেমী মুকেশও নিজের মতো একটা সার্জিকাল স্ট্রাইক করে দেখালেন। MAMI-র যাঁরা কর্ণধার, মূলত প্রযোজক, পরিচালক আর অভিনেতা, তাঁরা মুখ খোলারও ঝুঁকি নিলেন না। আর, কিছুদিন পরে এঁদেরই একটি দল রাজ্য সরকারের মধ্যস্থতায় প্রদর্শকদের কাছে মুচলেকা দিয়ে এলেন। সেই মুচলেকার প্রথম কথা, যেসব ছবিতে পাকিস্তানি শিল্পীরা কাজ করেছেন, সেসব ছবির মুক্তির জন্যে ছবিপিছু পাঁচ কোটি টাকা তাঁরা সেনাবাহিনীর ত্রাণ তহবিলে দেবেন, পাকিস্তানি হামলায় নিহত জওয়ানদের পরিবারের জন্যে। তা ছাড়া, ভবিষ্যতে পাকিস্তানি শিল্পীদের তাঁরা ছবিতে নেবেন না। সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য তাঁদের এই মহৎ দান প্রত্যাখ্যান করে বিবৃতি দিয়েছেন নিহত জওয়ানদের আত্মীয়কুল।[১]

MAMI-র তাবড় কেউকেটাদের না-হয় উপায় ছিল না বাবুর ইচ্ছের বিরুদ্ধাচরণ করার। কিন্তু *জাগো হুয়া সবেরা*-র এই অন্যায় অপসারণ নিয়ে মুম্বইয়ের বাইরেও চলচ্চিত্র জগতে প্রতিবাদ হল কই? আমাদের এই সর্ববিষয়ে প্রতিবাদমুখর কলকাতাতেও কোনো সভা ধরনা বা মোমবাতি মিছিলের দেখা পাওয়া যায়নি। এটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত। তবে বোঝা যায়, আস্তে আস্তে এই শহরের মানুষও হারিয়ে ফেলছেন ইতিহাসের সঙ্গে তাঁদের যোগ।

পাকিস্তানি ছবি হলেও *জাগো হুয়া সবেরা*-র সঙ্গে বাঙালি সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য যোগ আছে। এ-ছবির উৎস মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস *পদ্মা নদীর মাঝি*। ছবির অভিনেতাদের সবাই আদতে বাঙালি। একজন ছাড়া তাঁদের সকলেই অবশ্য অপেশাদার, কয়েক জন শখের মঞ্চাভিনেতা,

অন্যান্যরা সাধারণ মানুষ, চরিত্রের প্রয়োজনে ক্যামেরার সামনে তাঁদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া হয়েছিল। একমাত্র পেশাদার অভিনেতার নাম তৃপ্তি মিত্র। এ-ছবির সুরকার তিমিরবরণ। ছবির শুটিং হয়েছিল তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানে ঢাকার কাছে মেঘনা নদীর তীরে। তবে হ্যাঁ, এ-ছবির প্রযোজক (নুমান তাসির) আর পরিচালক (এ জে কারদার[২]) দুজনেই পাকিস্তানি। এবং ছবির চিত্রনাট্যকার বিখ্যাত উর্দু কবি ফ্যয়েজ আহ্‌মেদ ফ্যয়েজ।

বলা বাহুল্য, গড়পড়তা বিনোদনমূলক কোনো প্রকল্প ছিল না এটি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিমানবাহিনীর পাইলট হিসেবে কাজ করা এ জে কারদার যুদ্ধের পরে অবসর নিয়ে ব্রিটেনে চলচ্চিত্র-সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশে (পাকিস্তানে) ফিরে সুযোগ খুঁজছিলেন একটি ছবি বানানোর। প্রশিক্ষণ-পর্বে ইতালীয় নব-বাস্তবতাবাদী ধারার চলচ্চিত্র এবং সেগুলি তৈরির বিবরণ তাঁকে উদ্‌বুদ্ধ করেছিল। মনে রাখতে হবে, প্রায় সেই একই সময়ে সত্যজিৎ রায়ও লন্ডনে বসে নব বাস্তবতাবাদী চলচ্চিত্র দেখে এবং সেগুলি তৈরি করার ইতিহাস জেনে স্থির করছেন ছবি করলে এভাবেই করবেন।

দেশে ফিরে সত্যজিৎ এক নতুন আদর্শে ভর করে শুরু করলেন *পথের পাঁচালী* বানানো। তারপর অনেক প্রতিকূলতা পেরিয়ে সে-ছবি বিশ্বজয় করল। কারদারের জাগো হুয়া সবেরা-র কাজ শুরু হয়েছিল অল্প কিছুদিন পরেই। পথের পাঁচালী-র মতো এ-ছবির গঠনও প্রথাসিদ্ধ আখ্যানমূলক ধারার অনুসারী নয়। কিন্তু পথের পাঁচালী-তে যেটুকু নাটকীয়তা আছে, এ-ছবিতে তা-ও নেই। এখানে আখ্যানের বুনোট খুবই আলগা। তার বদলে আছে শুধু নদীতীরবর্তী মৎস্যজীবীদের জীবন আর জীবিকার সরল উপস্থাপন। এই উপস্থাপনা গড়পড়তা দর্শকের সিনেমা দেখার অভিজ্ঞতা থেকে বহু যোজন দূরের বস্তু। তা ছাড়া মানিকের উপন্যাসের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত, তাঁদের মনেও মূল সাহিত্যের এই নিরাভরণ অনুবাদ খুব দাগ কাটেনি। তা ছাড়া, চিত্রনাট্যকার নিজে শক্তিশালী কবি হলেও ভিন্ ভাষার উপন্যাস থেকে চিত্রনাট্য তৈরির সময় কতটা উপন্যাসের মর্মে পৌঁছোতে পেরেছিলেন, সে প্রশ্নও মনে আসে।

ইংরেজ ক্যামেরাম্যান আর এডিটরের হাতে রূপায়িত হলেও বক্স অফিসে একেবারেই সফল হয়নি *জাগো হুয়া সবেরা*। পূর্ব-পাকিস্তানের কয়েকটি মাত্র সিনেমাহলে মুক্তি পাওয়ার পরে এক সপ্তাহও চলেনি। আর পশ্চিম-পাকিস্তানে? ১৯৫৯ সালে সেখানে যখন এ-ছবির মুক্তির তোড়জোড় চলছে, ঠিক তখনই দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিশৃঙ্খলা দমনের অজুহাতে জেনারেল আইয়ুব খানের নেতৃত্বে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে প্রশাসনের দখল নিল। আর রীতিমতো হুমকি দিয়ে *জাগো হুয়া সবেরা*-র মুক্তি বাতিল করা হল। এরপরেই শুরু হল দেশজুড়ে বামপন্থী কর্মীদের ধরপাকড়। সেই দলে ছিলেন ফ্যয়েজ আহ্‌মেদ ফ্যয়েজ-ও। অবশ্য বিদেশিদের কাছে ভালোমানুষি দেখানোর জন্যে ১৯৬০ সালে ছবিটিকে পাঠানো হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অস্কারের বিদেশি ছবির প্রতিযোগিতায়। পাঠানো হয়েছিল মস্কো-র আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে। সেখানে এ-ছবির কপালে একটি পুরস্কারও জুটেছিল।

কিন্তু তার পরে প্রায় পাঁচ দশক ধরে ছবির কোনো খোঁজ ছিল না। ২০০৭ সালে নুমান তাসিরের পুত্র অঞ্জুম বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা প্রিন্ট থেকে প্রদর্শনযোগ্য একটি সংস্করণ তৈরি করেন। সেটিকে পরে আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে আরো উন্নত করা হয়। গত কয়েক বছর ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় এমনকী নামকরা চলচ্চিত্র উৎসবেও দেখানো হয়েছে এই ছবি। ২০১২ সালেই এর একটি প্রদর্শনী হয়েছিল কলকাতায়। ২০১৬ সালে কান চলচ্চিত্র উৎসবে ধ্রুপদি চলচ্চিত্র বিভাগে দেখানো হয়েছিল *জাগো হুয়া সবেরা*। সেখানেই মুম্বাই চলচ্চিত্র জগতের বেশ কয়েক জন চাঁই এ-ছবিকে বেছে এনেছিলেন। তারই জেরে ছবির Jio MAMI Mumbai Film Festival-এ আগমন। কিন্তু সাতান্ন বছর পরে আবারও উপমহাদেশের সংকীর্ণ রাজনীতির বলি হল *জাগো হুয়া সবেরা*।

তবে দুটো ঘটনার মধ্যে একটু তফাত থেকে গেল। ১৯৫৯ সালে পশ্চিম-পাকিস্তানে এ-ছবির প্রদর্শন বন্ধ হয়েছিল সামরিক বাহিনীর হুমকির জেরে। ২০১৬ সালে মুম্বইয়ের এক আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে এ-ছবির প্রদর্শন বন্ধ হল একজন শিল্পপতির ফতোয়ায়। আর প্রমাণ হল, হাতে প্রশাসনিক ক্ষমতা থাকলেই শুধু নয়, টাকা এবং প্রভাব থাকলেও ফিল্ম সেন্সরশিপ নামক ছাঁকনিটার ওপর অধিকার কায়েম করা যায়।

নির্দেশিকা

১. এইসব খবর নানা ইংরেজি দৈনিক থেকে সংগ্রহ করে একটা প্রতিবেদন তৈরি করেছিলাম প্রথম সারির বাংলা দৈনিকের জন্যে। মুকেশ আম্বানির পরোক্ষ উল্লেখ ছাপাতেও অসুবিধে বোধ করেছিল সেই পত্রিকা। অথচ এই পত্রিকারই পাতায় নিয়ম করে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তাব্যক্তিদের সমালোচনা করা হয়, নাম করেই।

২. এঁর দাদা এ আর কারদার ছিলেন বিখ্যাত প্রযোজক এবং পরিচালক, যিনি স্বাধীনতার আগে কাজ করেছেন লাহোর, কলকাতা এবং বম্বে-তে। স্বাধীনতার পরে আত্মীয়/পরিচালক মেহবুব খানের সঙ্গে পাকিস্তানে গিয়েও বম্বে ফিরে আসেন, দুজনেই, আর বাকি জীবন এদেশেই, ওই বম্বে বা মুম্বইতেই, কাজ করেছেন, সাফল্যের সঙ্গে।

ISO 9001:2008

NIGHTINGALE HOSPITAL

11, Shakespeare Sarani, Kolkata - 700 071
Phone : 2282-7465 / 7462 / 7969 - 72
Doctors Booking (10.00 a.m. to 6.00 p.m.)
98743 26662 / 98743 76667
Fax : 00-91-33-2282-6454
E-mail : feedback@nightingalehospital.com
Website : www.nightingalehospital.com

মেঘ-পিয়ন আর মানুষ-চিঠি

সায়তি ঘোষ

বাংলা কবিতা বেশি পড়িনি আমি। যা সবাই জানে তাই ভাসা-ভাসা জানি। কিন্তু শিলং থেকে চেরাপুঞ্জি যাওয়ার পথে বার বার মনে হচ্ছিল এখানে না এসেই কি শক্তি চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন—

বৃষ্টি পড়ে এখানে বারোমাস
এখানে মেঘ গাভীর মতো চরে।

এই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা যে উপর থেকে নীচে তাকিয়ে মেঘ দেখছি। ড্রাইভার নির্মলকাকু বললেন, 'লাইলঙ্কট এসে গেছে... একটা ব্রিজ পেরোতে হবে... আপনারা হেঁটে দেখে আসুন।'

কোনো ব্রিজ দেখতে পেলাম না। চারপাশ ছাই-ছাই রঙে ঢাকা। সেই রং ফুঁড়ে আমরা এগোলাম। আসলে হাঁটছি মেঘের মধ্যে দিয়ে। ব্রিজও আছে মেঘে ঢাকা। একটু নেমে ভিউ পয়েন্টে যাওয়া যায়। গেলামও বেশ কিছু দূর। এগোতে যে খুব ইচ্ছে করছিল তা নয়। মেঘের কাছে খেলায় হেরে বার বার বোকা হয়ে যাচ্ছি। সেই যে ছোটোবেলায় পড়েছিলাম 'মেঘের খেলা দেখে কত খেলা পড়ে মনে, / কতদিনের লুকোচুরি, কত ঘরের কোণে'। তার মধ্যে একটা ঘর-ঘরোয়া ব্যাপার ছিল। কিন্তু এ যেন বিশ্বব্যাপী মেঘ, আমরা সবাই তার খেলায় হেরে ভূত!

প্রকৃতির কাছে যে প্রতিমুহূর্তেই হারছি, তা আরো স্পষ্ট বুঝলাম 'ওয়াকাবা ফল্‌স'-এ পৌঁছে। টিকিট কেটে গেট দিয়ে তো ঢুকেছি। চতুর্দিকে ঘন কুয়াশা। সে কুয়াশা ভেদ করে কিছুই ঠাহর হয় না। কোথায় ওয়াকাবা কোথায় কী... কানে শুধু আসছে জল পড়ার মৃদু শব্দ। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। বেরিয়ে আসছি। টিকিট কাউন্টারের ভদ্রলোক বললেন, 'চেরাপুঞ্জি থেকে শিলং ফিরবে তো? ফেরার পথে একবার নেমো, এই টিকিটেই হয়ে যাবে। ওয়াকাবা দেখতে পাবে হয়তো।' খুব রাগ হল। ছেলেভুলোনো কথা। দুপুর ১১.৩০-এ যাকে ঘন কুয়াশায় দেখতে পেলাম না, তাকে নাকি দেখব বিকেলবেলায়, সূর্যাস্তের কাছাকাছি সময়ে! বিকেল ৫টায় সেই আশ্চর্য অভিজ্ঞতাটা হল। রুক্ষ, দুর্গম পাহাড়ের গায়ে ক্ষীণস্রোতা ওয়াকাবা দীর্ঘ পথ ধরে চলেছে। কোথাও কোথাও সেই পাহাড় সবুজে ঢাকা, কোথাও নিরাবরণ রুক্ষ, যেন নির্মম। এত স্পষ্ট দেখা গেল ওয়াকাবাকে যে আমার মতো কাঁচা ফটোগ্রাফারের লেন্সেও দিব্যি ধরা পড়ে গেল। গেটে দেখলাম সকালের লোকেরা নেই। থাকলে ধন্যবাদ দিতাম।

তবে আরো মজা হয়েছিল চেরাপুঞ্জির অন্তিম স্পট 'সেভেন সিস্টার্স ফল'-এ। সাতটি পাহাড়ি ঝোরার সমন্বয়— প্রত্যেকটি হল উত্তর-পূর্ব ভারতের সাতটি প্রদেশের প্রতিনিধি। পৌঁছে দেখলাম নীচে তো শুধুই সবুজ আর মাঝে মাঝে কুয়াশা। আর মাঝে মাঝে সরু কিছু একটা। 'এও কি ওয়াকাবার মতো জলের শব্দ আছে কিন্তু জল নেই? ওই ছাই-রঙের ব্যাপারটা নিশ্চয় কুয়াশা হবে।' মা পাশ থেকে বললেন। বাবা দেখছি কোনো কথা বলছেন না। তারপর মা-র প্রতি তির্যক ভঙ্গিতে বললেন, 'তুমি না দেখতেই পাচ্ছ না, আমি তো ঝোরাও দেখছি ঝোরাতে মাছও দেখছি।' আমি অবাক হয়ে গেলাম বাবার চশমায় দূরবিন লাগানো নাকি...

আবার মৎস্যপ্রেমী বলে হয়তো মরুভূমির আলেয়ার মতো এখানের জলে কাল্পনিক মাছ দেখছেন... শেষে আমিই এই 'ঝোরা সন্ধান' নাটকে যবনিকা টানতে বলে উঠলাম, 'যাকে মাছ ভাবছ, সেই তো সেভেন সিস্টার্স'। রুপুলি মাছের সারির মতো কয়েকটি ধারা চিক্‌চিক্ করছে। কুয়াশা ফুঁড়ে সাত জনকে দেখতে পাইনি। তবে জনা পাঁচেক ধরা দিয়েছিল।

সেভেন সিস্টার্স-এ পৌঁছোনোর আগে চেরাপুঞ্জিতে রামকৃষ্ণ মিশনের স্কুলটি বড়ো ভালো লেগেছিল। অরুণাচল প্রদেশ, অসাম, মণিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, মেঘালয়, ত্রিপুরা— এই সাতটি প্রদেশের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের অতীত এবং বর্তমান নিয়ে মনোজ্ঞ প্রদর্শনী। দুটি ঘরজুড়ে। বহু প্রাগৈতিহাসিক উপাদান, প্রকৃতির অতীত ও বর্তমানের আলোকচিত্র। সেখানেই দেখলাম চেরাপুঞ্জিতেও নাকি ছিল এক 'স্যাক্রেড ফরেস্ট'। এই মিউজিয়ামে ঢুকবার আগে এর কথা শুনিনি। আগের দিন পূর্ব-খাসি পাহাড় মফলং-এ 'স্যাক্রেড

ফরেস্ট' দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু চেরাপুঞ্জির পবিত্র বনাঞ্চলের খবর ছবির বাইরে আর কেউ কিছু দিতে পারলেন না। আমার হঠাৎ করে ঠিক হওয়া শিলং ভ্রমণে মেঘ আর কুয়াশা যতই বোকা বানাক, মফলং-এর 'স্যাক্রেড ফরেস্ট' আমাকে মুগ্ধ করেছে সবচেয়ে বেশি।

গ্রামের তরুণদের কর্মহীনতার সমস্যা মোকাবিলার জন্য বনাঞ্চলে ঢুকতে এখন গাইডের ব্যবস্থা হয়েছে। আমাদের গাইড ছিল জন। বয়স যা বলল আমার থেকে বছর-দুয়েকের বড়ো হবে। জনের মুখে শুনলাম কীভাবে ষাঁড় বলির সময় সবাই ওই বনে দলবদ্ধ হয়ে বলির জায়গায় যায়। যে পাত্রে রক্ত রাখা হয়, সেটিও আমাদের দেখাল। বলল পুরোহিত বুঝতে পারেন, পাত্রের রক্ত চিতার অবয়ব ধারণ করছে না সাপের। যদি চিতা হয় তো বলি সার্থক। যে অশুভকে কাটাতে বলির সিদ্ধান্ত হয়েছিল তা শেষ। আর যদি সাপ হয়, তবে পুনরায় বলির আয়োজন করতে হবে। বনাঞ্চলের ঠিক বাইরে বিভিন্ন আকারের প্রস্তরখণ্ডগুলি দেখিয়ে জন যেভাবে প্রাচীন রাজপরিবারের সদস্যদের কথা বলছিল, তা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। মনে মনে ভাবলাম, এই প্রথম একজনের মুখ থেকে লোককথা শুনছি যে নিজে ওই লোককথায় পূর্ণ বিশ্বাস করে। বলির কথা ভাবতেই খারাপ লাগে, তা আবার পুরোহিত সাপের অবয়ব দেখলে আবার বলি! কিন্তু সংস্কারের কি কিছু জোরালো দিকও আছে? 'মফলং'-এর মানুষের বিশ্বাস ওই পবিত্র বনাঞ্চল থেকে মাটিতে ঝরে পড়া গাছের পাতাও বাইরে নিয়ে যাওয়া যায় না। নিলে তা একান্ত অশুভ। গাছের ফল বনের মধ্যে বসে তুমি খেতে পার। কিন্তু বনের বাইরে তুমি নেবে না। এই সংস্কারে ভর করেই তো দামি রুদ্রাক্ষ থেকে কত কত গাছ অক্ষত অবস্থায় বনে রয়েছে। সে বনের ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নৈঃশব্দ্যের ধ্বনিকে উপলব্ধি করা যায়। পায়ের তলায় কত ঝরে যাওয়া পাতা। মাটির সঙ্গে মিশে মিশে প্রকৃতির রসদ তৈরি করেছে। আমাদের শহুরে চোখে অবাক হয়ে দেখি গাছেদের একদিকে শ্যাওলা জমেছে। অন্যদিকে শ্যাওলা নেই। আশ্চর্য সেই মেলামেশা চেহারা। জন বুঝিয়ে বলল, যেদিকে শ্যাওলা, সেদিকটা সূর্যের স্পর্শ পায় না, অর্থাৎ পশ্চিম দিক, আর অন্যদিকটা সূর্যের ছোঁয়ায় শ্যাওলা ছাড়া; সূর্যকে জানান দেয় সেই দিক। অত নিঃশব্দ বলেই অনেক দূর থেকে পাহাড়ি ঝোরার শব্দ পাওয়া যায়। ঝোরার ধ্বনি প্রথম শোনা আর সেই ঝোরাকে চোখে দেখার মধ্যে অনেকখানি ব্যবধান। একটা গোটা দিন ওই বনাঞ্চলে কাটালেও মুগ্ধতা শেষ হত না। আকাঁড়া প্রকৃতির বর্ণ-গন্ধ-ধ্বনি এমন করে আমার কাছে আগে ধরা দেয়নি। মফলং ছেড়ে যেতে যেতে মনে হচ্ছিল আবার কবে আসব।

মে মাসের মাঝামাঝি শিলং পৌঁছে ১৪ ডিগ্রি তাপমাত্রা পেয়ে বেশ পুলকিত হয়েছিলাম। কিন্তু সেদিন মফলং থেকে আমাদের পরবর্তী যাত্রা বুঝিয়ে দিল গরম কাকে বলে। না, পথ বেশ ভালোই ছিল ঠান্ডা ঠান্ডা।

'মওলিননং'-এ লিভিং রুট ব্রিজ বেশ রোমাঞ্চিত করেছিল। সত্যিই কি শুধুমাত্র গাছের মূল নিজেই নিজেকে বিছিয়ে বিছিয়ে এই সেতু বেঁধেছে নিজেকে? সেতুর ওপর দাঁড়ানো যায় না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হেঁটে সেতু পেরিয়ে যেতে হয়। আর সেতু পেরিয়ে জলের ধারে ছোটো-বড়ো পাথরের ওপর বসতে যে কী ভালো লাগে। বিভিন্ন আকারের পাথর জলের নীচে তার, তাতে ছোটো-বড়ো ছিদ্র।

মওলিননং থেকে যতই ডাওকি সীমান্তের দিকে এগোতে লাগলাম, ততই যেন কলকাতার গরম কাছে আসতে লাগল। ডাওকি নদী দেখিয়ে নির্মলকাকু বললেন, নদীর জলে যাদের দেখতে পারছেন, চান করছে, সব বাংলাদেশের মানুষ। একধারে গাড়ি রেখে আমরা গিয়ে দাঁড়ালাম ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী দ্বারের সামনে। লরি যাচ্ছে ভারত থেকে। দু-পা এগিয়ে সবুজ বোর্ডে সাদা দিয়ে লেখা বাংলাদেশে আপনাকে স্বাগতম। তলায় লাল কালি দিয়ে 'Welcome to Bangladesh'। একদিকে একফালি সবুজ, গরু-বাছুরেরা ঘাস খেতে খেতে সীমান্ত পেরিয়ে যাচ্ছে। অনেক ছোটোবেলার একটা কথা মনে পড়ল। টাকিতে ইছামতীর ধারে বসলে নদীর ওপারে সাতক্ষীরা গ্রাম। বিকেলবেলা আজানের ধ্বনি স্পষ্ট ভেসে আসে। যে গেস্ট হাউসে ছিলাম তার সামনের ঝুপসি গাছটাতে নদীর উপরের আকাশ দিয়ে উড়ে এসে বসল পাখি। আমার মনে হয়েছিল বুঝি বাংলাদেশের পাখি। পাসপোর্ট ছাড়াই ভারতে চলে আসতে পারল। ভাঙা এবড়ো-খেবড়ো পাথরের সিঁড়ি দিয়ে ডাওকি নদীর ধারে নামলে দেশ-বিদেশের একটা আশ্চর্য মেলবন্ধন দেখা যায়। বোঝা কঠিন কোনটা ভারত, কোনটা বাংলাদেশ। ফেরার পথে বড্ড ভুগেছিলাম। সারি সারি লরি বাংলাদেশে ঢুকছে। প্রায় এক-দেড় ঘণ্টা বাড়তি সময় লেগে গেল, আর ফেরবার পথে যত শিলং কাছে আসে, বৃষ্টি আসে ঝেঁপে। আবার সেই বৃষ্টি পড়ে এখানে বারো মাসের দেশ। নির্মলকাকুকে মনে হচ্ছিল বুঝি প্লেনও চালাতে পারেন, প্রবল বৃষ্টিতে ওই পাহাড়ি পথে কী নির্বিকারভাবে পান খেতে খেতে শিলং শহরে ঢুকিয়ে দিলেন।

তবে ওই যে দেড়-দু-ঘণ্টা বাড়তি লাগল, তার ফলে শিলং শহরটাকে তেমনভাবে চেনা হল না। ছিলাম আমরা 'Brahm Home Rest House'-এ। শিলং-এর চৌরঙ্গী পুলিশপাড়ার ওপরে। ওয়ার্ডস লেক হাঁটা পথ। যেদিন বিকেলে শিলং পৌঁছোলাম সেদিনই টুক করে লেকে গিয়ে বেশ অনেকটা সময়

কাটিয়েছিলাম। কিন্তু পায়ে হেঁটে বেড়ানো হয়নি লাবানপাড়ায়। আরো ভালো করে দেখার ইচ্ছে ছিল রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত বাড়িগুলি, যার একটির নাম জিতভূমি। ভাবতেই রোমাঞ্চ হয়। এইখানে বসে লেখা হয়েছিল রক্তকরবী। ঠিক যেমন আজকের বদলে যাওয়া লাবানপাড়ায় হাঁটতে পারলে একটা মিছিমিছি খেলা খেলাই যেত— এইখানেই বুঝি ছিল যোগমায়ার বাড়ি, এখনকার কোন বাড়িটার কাছে! লীলা মজুমদারের শৈশবের শিলংকে আজকের শিলং-এ খুঁজে পাওয়া দুরূহ। তবু আর একটু খোঁজার ইচ্ছে ছিল। হাইউইন্ডস বাড়ি তো পেলামই না। জানা ছিল সেখানে ওষুধের দোকান-হাসপাতাল হয়েছে কিন্তু হাইউইন্ডস নামটি লেখা রয়েছে। সে বাড়ির কাছে পায়ের পাতা ডোবানো ঝোরাটিও এখন পাওয়া যায়। কিছুই দেখা হল না। শুধু পেয়েছি পাইনমাউন্ট স্কুল— যেখানকার ছাত্রী ছিলেন লীলা মজুমদার। আর দেখলাম বড়পানি ফিরবার দিন, ১৭ মে। গৌহাটি থেকে ফিরবার উড়ান ধরার আগে। সেই কবে থেকে পড়ছি লীলা মজুমদারের গল্পে 'বড়পানি' 'বড়পানি'। কী সুন্দর জায়গা। বিশাল লেক, আর তাকে নানাভাবে দেখার জন্য বিভিন্ন ভিউপয়েন্ট। সত্যিই তো শিলং-এ থাকলে সপ্তাহে একবার এই বড়পানিকে দেখা তো কিছুই নয়। আর সপ্তাহে সপ্তাহে যদি বড়পানি দেখে কেউ নিজের শৈশবে, তবেই কি সে লিখতে পারে ওরকম গদ্য! এ উক্তি অবশ্য আমার নয়, আমার মায়ের, লীলা মজুমদারের প্রবল ভক্ত, একেবারে খেপে উঠলেন বড়পানি দেখে। বললেন, 'এত সুন্দর জিনিস ছোটোবেলায় রোজ রোজ দেখলে ওরকম পাগল করা গদ্য লেখা আর বেশি কথা কী?'

দোকান-বাজার, লোকজন, জীবনযাত্রা এসবও মাত্র তিন দিনে তেমন জমল না। তবে চেরাপুঞ্জি থেকে ফেরবার পথে শিলং-এর বিখ্যাত এলেফ্যান্ট ফল্‌স দেখতে পেয়েছিলাম। সময়ের টানাটানি ছিল, বন্ধ হতে আর বেশি দেরি ছিল না। আরো দেখতে পারলে ভালো লাগত। কিন্তু যা দেখলাম তা মনে রাখার মতো। শিলং পিক যাওয়া হয়নি। পরের বার নিশ্চয় যাব। Brahm Home-এর সুরজিৎ-আঙ্কেলকে সেরকমই বলে এসেছি।

আমরা শিলচর থেকে গাড়িতে শিলং গিয়েছিলাম। বরাক নদীর কথা ফিরে ফিরেই মনে হয়। মাত্র দেড় দিন ছিলাম শিলচরে, বরাককে ঠিকমতো সময় দেওয়া হয়নি। আসলে হুট করে যাওয়া খুব অল্পদিনের জন্য। শিলচরে দ্বিজেন্দ্র-ডলি ট্রাস্টের আমন্ত্রণে মায়ের বক্তৃতা দিতে যাওয়া উপলক্ষেই আমাদের এই হঠাৎ করে ঠিক হওয়া বেড়ানো। ওই ট্রাস্টের কর্ণধার দূর্বা আন্টি (ড. দূর্বা দেব)। আন্টির মতো মানুষকে দেখাও একটা অভিজ্ঞতা। যেমন উদ্যোগী, তেমন কর্মক্ষম। শুনেছিলাম হাঁপানিতে খুব কষ্ট পেতেন। বিরাট বাড়ির একটা তলায় গ্রন্থাগার। প্রচুর বাংলা বই। আসল চমকটা লাগল দূর্বা আন্টির ঘরে ঢুকে। ১৩ মে শিলচরে বেশ গরম। ঘরে পাখা চলছে। আর পাখার তলায় অত্যন্ত সুদৃশ্য আবরণ দেওয়া গদির ওপর বসে আছে নসুবালা। ট্রাস্টের অন্যতম কর্মী শ্যামানন্দ আঙ্কেল (চৌধুরী)। বললেন, 'নসুবালার কথা জানেন না? ওই তো দূর্বার অভিভাবক। শুনলাম ছাগলটি চার বছর হল দূর্বা আন্টির কাছে। নসুর দিদিমা নসুর মায়ের জন্মের পর বেশিদিন বাঁচেনি। নসুর মাও নসুকে জন্ম দেওয়ার পর পরই মারা যায়। তাই দূর্বা আন্টির মনে হয় সংসারধর্ম ওদের ধাতে নেই। নসু ওই বাড়িতেই আছে। তার কোনো ছাগল বন্ধু নেই। রাতে আন্টির ঘরে শোয়। আন্টির COPD নাকি নসুর সাহচর্যে কমে গেছে। কোনোদিন ভেবে দেখিনি কিন্তু শুনে মনে হল হতেও পারে; ছাগলের দুধ তো রোগীর পথ্যও বটে। হয়তো তার নিশ্বাসেও মানুষের শ্বাসকষ্টের উপশম হতে পারে।

১২ মে শিলচর গেছি। কলকাতায় ফিরে এসেছি ১৭ মে। কিন্তু এরই মধ্যে প্রকৃতির আশ্চর্য ঐশ্বর্য ছাড়াও কত মানুষের মুখ যে আমার অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করেছে, তা ভুলবার নয়। দূর্বা আন্টির সৌজন্য আর আতিথেয়তা একান্ত আন্তরিক। আবার দেখা হলে ভালো লাগবে। Brahm Home-এর সামনের ফুলের বাগানটিকে আমি এখনও স্বপ্নে দেখি। তবু তো এপ্রিলে ফুরিয়ে গেছিল, রডোড্রেনড্রন ছিল না। রেস্ট হাউসের দেওয়ালে কী সুন্দর সব ছবি। সঙ্গের গ্রন্থাগারে আছে অমূল্য সম্পদ। কী করে যে গোছানো যাবে, কীভাবেই-বা পড়ুয়াদের কাজে আসবে, সে নিয়ে সুরজিৎ আঙ্কেল চিন্তা করছেন। আসলে তিন দিনে কিছুই বোঝা যায় না। ওইরকম মনমাতানো প্রকৃতি। মানুষের জীবনযাপনের প্রকৃতি নির্ভর, আবহাওয়া নির্ভর চলন সব মিলে একটা অখণ্ড শান্তির বোধই হচ্ছিল। যদিও শুনেছিলাম ওখানকার বিভিন্ন প্রজাতির ঘাত-প্রতিঘাত নাকি লেগেই থাকে। আমরা ফিরে আসার পর পরই অচল শিলং-এর বর্ণনা পেয়েছি সংবাদপত্রে। আসলে তিন দিনের বেড়ানো আর ৩৫৬ দিনের জীবনযাপনের মধ্যে অনেক ব্যবধান। মনে পড়ছিল শিলচরের বক্তৃতাসভায় যশস্বী অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্যের উত্তেজনা, যন্ত্রণা, ক্ষোভ। আত্মপরিচয়ের প্রমাণ দিতে হবে প্রশাসনের কাছে তাঁকে, তাঁর মতো অনেককে। মনে পড়ছিল নির্মলকাকুর কথা— প্রকৃতই যারা অনেকদিনের অধিবাসী, তাদের কাগজপত্র তেমন গোছানো নেই। আত্মপরিচয় নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে, এ ধারণাটাই তাদের কাছে অলীক। আর সত্যিই যারা অনুপ্রবেশকারী তাদের প্রমাণপত্রে কোনো খুঁত নেই। মাঝেমধ্যেই মনে পড়ে 'Brahm Home' রেস্ট হাউসের কর্মী সেই ছেলেটির কথা যার নামটাও

জানা হয়নি। হারমোনিকা চমৎকার বাজায়, আর পুলিশপাড়ার খাসি এম্পোরিয়ামের সেই দিদি। কী দায়িত্ব নিয়ে দোকান চালায়। অনেক বাঁশের জিনিস কিনলাম বলে, আমাকে একটা উপহার দিয়ে দিল।

কত মুখ মনে পড়ে; ডাওকি সীমান্ত যাওয়ার পথে 'লিভিং রুট ব্রিজ'-এর আনন্দ মনে নিয়ে 'Cleanest village of Asia'— 'মওলিননং'-এ ঢুকছিলাম। মনে প্রশ্ন ছিল— এতই পরিষ্কার, তো পেট্রোল চালিত গাড়িগুলোকে ঢুকতে দিচ্ছে কেন? বাইরের গাড়ি দূরে রেখে ব্যাটারি চালিত গাড়িতে তো ঢুকতে বলছে না, এশিয়ার সবচেয়ে পরিষ্কার গ্রামে? এরকম সাত-পাঁচ ভাবছি, হঠাৎ লালচে-গোলাপি জামা পরা এক শিশু আমার দিকে হাত বাড়াল। অসাধারণ মুখ। বললাম, 'দাঁড়া তোকে কোলে নেব, আগে একটা ছবি তুলি।' দেখলাম বেশ ব্যক্তিত্ব। হাত বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে কোলে না নেওয়ায়, মুখের ওপর হাত চাপা দিয়ে শুধু চোখ দেখিয়ে তাকাল। সেরকম রাগী ছবিই উঠল। তারপর যেই কোলে তুলেছি, অন্য মানুষ। গোটা মুখ দেখিয়ে পোজ দিল। মার মোবাইলে আছে সেই ছবি। মাঝে মাঝে ভাবি এই যে উপর থেকে নীচে তাকিয়ে মেঘ দেখা, কুয়াশা ঢাকা জলপ্রপাতের বিকেল মুখে করে নিরাবরণ হয়ে ওঠা, মেঘ কুয়াশা পেরিয়ে রুপোলি মাছের মতো সেভেন সিস্টার্স-এর দেখা দেওয়া— এদের থেকে কি কম রোমাঞ্চকর 'মওলিননং'-এর ওই শিশুর চোখদুটি? কেন যে ও ওর নিত্যকার দৈনন্দিনে আমাকে হঠাৎ হাত বাড়িয়ে ডেকেছিল, তা তো জানা হবে না কোনোদিন।

শৈশবের ওই ডাক প্রকৃতির মতোই সত্যি আর রোমাঞ্চকর বলেই হয়তো তেমন তেমন কবি শিলং-এ না গিয়েও লিখতে পারেন:

বৃষ্টি পড়ে এখানে বারোমাস
এখানে মেঘ গাভীর মতো চরে'।

শিল্পী : সুরজিৎ সরকার

পঞ্চকবি প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন

সুধীর চক্রবর্তী

সম্প্রতি বেশ কিছুকাল ধরে প্রধানত কলকাতার মঞ্চে এবং তার সঙ্গে দূরদর্শনের চ্যানেলে, এমনকি এ সবের দেখাদেখি শহরতলি আর মফস্বলেও 'পঞ্চকবির গান' বলে একটি সংগীতানুষ্ঠান চালু হয়েছে, জনাদরও মিলছে। একক বা সম্মেলক কণ্ঠপ্রয়োগে 'পঞ্চকবির গান' যথেষ্ট মঞ্চসফল একটা আইটেম। এখানে উদ্‌যোক্তা বা কণ্ঠবাদকের পরিকল্পনায় পরিবেশিত হয় যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১), দ্বিজেন্দ্রলাল (১৮৬৩), রজনীকান্ত (১৮৬৫), অতুলপ্রসাদ (১৮৭১) এবং নজরুল ইসলামের (১৮৯৯) কয়েকটি বিখ্যাত গান— বলা যায় একটি কমপ্যাক্ট প্যাকেজ, ফাইভ ইন ওয়ান। আসলে হালফিল বাংলা গানের যা হতদশা এবং বাজার এত সঙ্গীন যে মনভোলানো নতুন ব্র্যাণ্ড না আনলে টিকে থাকাই মুস্কিল। রেকর্ড, সিডি এখন না কিনে ঘরে বসে একটি বৈদ্যুতিন বহুমুখী গুপিযন্ত্রের মালিক হলেই সগর্বে বলা যাবে দেখব এবার জগৎটাকে। যে কোনও গান, যে কোনও ভাষা ও দেশের এখন করায়ত্ত, প্রযুক্তি সম্ভব। চিপস্, ইউটিউব, পেন ড্রাইভ, এই সব নামের ক্ষুদ্রতম যন্ত্র প্রয়াসে বৃহৎ গানের বিশ্ব এখন অনর্গলিত। কাজে কাজেই শহুরে অনুষ্ঠান-মঞ্চের আহ্বানে লোক সমাগম ঘটাবে ও কাঞ্চনমূল্য অর্জনের লক্ষ্যে, মঞ্চে বাদ্যকরদের বিচিত্র সব ভঙ্গিগত দেখনদারি, ঝিনচাক্ পোশাক ও নৃত্যশৈলী প্রদর্শনের পর্বান্তরে নতুন যে-অবতার দেখা দিয়েছেন তার পাঁচফোড়ন যুক্ত স্বাদু প্রোগ্রামের নাম 'পঞ্চকবির গান'। বেশ তো, আমাদের মতো প্রতিবাদভীরু গানপ্রেমিকের কী-বা বলবার থাকে? তবে সমাজে দু-একজন বেআক্কেলে উদুখল পাবলিক তো থাকে, তারা খামোখা কাউকে না পেয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করে, 'হ্যাঁ মশাই, এই পঞ্চকবি মানে কী? আচ্ছা এই লিস্টে দিলীপকুমার রায়ের নামটা নেই কেন?' তাঁর গান কি অচল অধম, নাকি ঈষৎ কঠিন বলে বর্জনীয়?' শুনেই মনে পড়ল কবিগুরুর দুটি বচন, গায়ে গায়ে। 'সত্য যে কঠিন' এবং 'কঠিনেরে ভালোবাসিলাম'। সত্যিই তো দিলীপকুমারের গান গাইতে হলে রীতিমতো এলেমদার হতে হয় আর কণ্ঠস্বরের ঘোরাফেরা এত ঘাটে লাগাতে হয় যে সে বড় বিড়ম্বনা। স্বভাবত মুখতোড় কিন্তু সমর্থ গায়ক কবীর সুমন একটি গানে ভারি সুন্দর করে লিখেছিলেন,

আছে দিলীপকুমার রায়ের কণ্ঠ
সমস্ত সুর হস্তদন্ত
হারমনিয়াম।

একেবারে সহি বাত।

ভাগ্যক্রমে ১৯৫৬ সালে কলকাতায় এক অভিজাত পরিবারে সামনাসামনি বসে দিলীপকুমার রায় নামের সেই অলৌকিক কিন্নরের ঘণ্টাতিনেক ধরে অবিশ্রান্ত গান গাওয়া শুনেছি। বরং বলা উচিত দেখেছি। দেখবার মতোই তো! গাইতে গাইতে গানের তোড়ে পরম স্নেহে হারমোনিয়ামটা কোলে তুলে নিয়েছেন কখন কে জানে! দক্ষ আঙুল উদারা থেকে মুদারা ছুঁয়ে তারসপ্তকে খেলা করছে সাবলীল গতিতে। অনুগত ভৃত্যের মতো কণ্ঠধ্বনি সেই যন্ত্রের সঙ্গে বয়ে যাচ্ছে। গান তো নয়, আত্মহারা নিবেদন। সামনে খাতাটাতা নেই— সব গানই স্মৃতিধার্য। যেমন কীর্তনে সড়গড়, তেমনি টপ্‌খেয়ালের কারুবাসনায় সজাগ। দেবভাষায় লেখা স্তোত্রে যত স্বচ্ছন্দ, তেমনই প্রমত্ত প্রসাদী গানে। অনায়াসে সুর টপকে যাচ্ছেন, আবার বিদেশি গানের ধাঁচে সুরের উচ্চাবচ চলন বাতলাচ্ছেন। সবশেষে যখন মীরাবাইয়ের ভজনে এলেন তখন সুরের মধ্যে উচ্ছলিত হল ভক্তচিত্তের আত্মগত গাম্ভীর্য। ছোটখাট মীড় মুরকির সাজানো সৌন্দর্যের সঙ্গে সংগতি রেখে তানকারির ঐশ্বর্য ফুটে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেললাম এমন যে সাংগীতিক দক্ষতা আর অনায়াস কণ্ঠবাদন, তার মূলে আছে দীর্ঘ অনুশীলনের পরম্পরা এবং বংশজ প্রতিপত্তি। পিতামহ দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় ছিলেন খানদানী কালেয়াত, রাগদারী গানের শিল্পী— নিজেই গান লিখে সুর দিয়ে গাইতেন। তাঁর পুত্র দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন কৈশোর থেকে স্বরচিত গানে সুর প্রয়োগ করে গায়নপ্রতিভায়

সমুজ্জ্বল। পরে বিলেত গিয়ে শিখে নেন পাশ্চাত্য সুরের ওঠানামা, গতিধর্ম ও স্বরক্ষেপণের কৌশল। আয়ত্ত করেন গানের সুরের উদাত্ততা ও লাবণ্য। শিখে নেন হাসির গানের হালকা চাল এবং ব্যঙ্গ বিদ্রূপের বিভিন্ন মজাদার ভাব ও সুরের বয়নকর্ম। নাটকের গানে আনেন ডুয়েট ও কোরাসের অভিনবত্ব— স্বদেশী গানে সৃষ্টি করেন তেজোদ্দীপ্ত পৌরুষ আর প্রতিবাদী কণ্ঠ। এই ঐতিহ্যেই তো দিলীপকুমারের বেড়ে ওঠা!

আসলে মানুষটি ছিলেন স্বভাবজিজ্ঞাসু। অধ্যাত্মবাদ আর দ্বৈতবাদে বিশ্বাসী থেকে গানের ভেতরে অন্বেষণ করে গেছেন জীবনের প্রকৃত ভিত্তি। সারা পৃথিবীর নানা প্রান্তে যেসব মননজীবী ও মানবতাবাদী চিন্তক তথা সৃষ্টিশীল প্রতিভাধররা ছিলেন, যাঁরা জীবনের দিশা দিতে পারতেন, তাঁদের কাছে ছুটে গেছেন ঝাঁকে ঝাঁকে প্রশ্ন নিয়ে। তাঁদের তাৎক্ষণিক উত্তর ও জ্ঞানতত্ত্বের মূল অভিমুখ বুঝে নিয়ে সমগ্র সাক্ষাৎকারের কথ্যরূপ সংকলন করেছিলেন 'তীর্থংকর' নামের বইতে, যার ইংরেজি নামান্তর 'Among the great'। বাংলা ও ইংরেজি দুটি ভাষাতেই তিনি রচনাদক্ষ ছিলেন। 'তীর্থংকর' বইতে মোট পাঁচজন বন্দিত মানবপুত্রের সঙ্গে আলাপচারির সারকথা লিখে গেছেন। তাঁরা হলেন য়ুরোপের রোমা রঁলা ও বার্ট্রাণ্ড রাসেল, আর ভারতের রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী আর শ্রীঅরবিন্দ। আশ্চর্য যে, এসব ব্যতিক্রমী অনেকান্ত ভাবুকদের সঙ্গে তিনি সংগীত সম্পর্কেও প্রচুর ভাব বিনিময় করেছিলেন, কারণ তিনি শুধু সুধাকণ্ঠী গায়ক বা পারফর্মার ছিলেন না— গানের উদ্দেশ্য ও অভিমুখ সম্পর্কে তাঁর জিজ্ঞাসা ও অন্তরগত অস্থিরতা ছিল প্রবল।

তাই নিছক পিতৃপিতামহের পরম্পরা-বাহিত গানচর্চা নয়, প্রাণের টানে প্রথম যৌবনে দিলীপকুমার অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্রের কাছে কীর্তন শিখতে যান। তিনি যতটা সম্ভব শিষ্যকে কীর্তনে নিষ্ণাত করে নিয়ে যান নবদ্বীপ ব্রজবাসীর কাছে, যিনি শুধু পারঙ্গম ও কৃতী ছিলেন না, অধিকারী ব্যক্তি ও কীর্তনের গঠনশৈলী এবং তাল বাদ্যে অধীত ছিলেন। পিতৃবন্ধু সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের কাছে তালিম নেন খেয়াল ও টপ্‌খেয়ালে। বেহালানিবাসী সেকালের প্রখ্যাত খেয়াল শিক্ষক বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে নিয়মিত যেতেন এবং টপ্পা শিখতে যেতেন চন্দননগরের রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কাছে। গানবিদ্যা আয়ত্ত করবার জন্য তাঁর এত যে ব্যাকুলতা তার মূলে ছিল জিজ্ঞাসু চিত্তবৃত্তি আর মেধা-মননের সমন্বয়। বিনোদনমুখী নয়।

সেই জিজ্ঞাসা ব্যাপকতা পেল বিদেশ যাবার সূত্রে। তিনি ছিলেন গণিতের সেরা ছাত্র প্রেসিডেন্সি কলেজে। সেখান থেকে যান কেমব্রিজে। সেখানে গণিতে (ট্রাইপিস) ও সংগীতে (পার্ট ওয়ান) পাশ করে বার্লিনে হাজির হন কণ্ঠসংগীত চর্চা করতে। তাঁর সাংগীতিক প্রজ্ঞা অচিরে সে দেশের আরোনিয়ান, লিডিয়ান, মিক্সোলিডিয়ান, ডোরিয়ান, এয়োলিয়ন এবং ফ্রিজিয়ান বর্গের প্রাচীন সুরপরম্পরার সঙ্গে ভারতীয় মার্গ সংগীতের বিলাবল, ইমন, খাম্বাজ, কাফী, আশাবরী ও ভৈরবী ঠাটের মিল আবিষ্কার করেন। মাত্র ২৩ বছরের যুবক দিলীপকুমার সরাসরি রোমা রঁলার বাড়িতে গিয়ে বাংলা গান শুনিয়ে আসেন। ততদিনে তাঁর মধ্যে যে ভারতীয় গানের সংস্কার ছিল তার ওপরে পড়ল পরিমার্জিত পাশ্চাত্য গানের প্রলেপ। কত অনায়াসে লিখে গেছেন,

> বিলেতে— মানে ইংলণ্ডে ছিলাম প্রায় দু'বৎসর। এর মধ্যে প্রায় দেড় বৎসর কাটিয়েছি কেম্ব্রিজে, বাকি সময়টা কখনও লন্ডনে, কখনও নানা রম্যস্থানে, কখনও প্যারিসে, সুইজারল্যান্ডে, হল্যান্ডে, রাইন উপত্যকায়। তৃতীয় বৎসরে যাই বার্লিনে গান ও জার্মান ভাষা শিখতে। তারপরে লুসানো, ভিয়েনা, প্রাগ, বুদাপেস্ত প্রভৃতি নানা শহরে নিমন্ত্রিত হয়ে গান গেয়ে ও গানের সম্বন্ধে বক্তৃতাদি দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরি।

ইত্যবসরে তিনি আয়ত্ত করে নিয়েছেন পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে স্বরক্ষেপণের কৌশল ও সে জাতীয় গানের সুরের স্বতঃস্ফূর্ত চলন। পরে যে-শিক্ষা নিজের গানে লাগাবেন। প্রকারান্তরে অবশ্য সেটাই হয়ে উঠল তাঁর দৈলীপি গানের গায়নের পক্ষে মস্ত প্রতিবন্ধক, কেননা অত নিরীক্ষাবহুল যথেচ্ছ সুরপ্রয়োগের দক্ষতা তো গড়পড়তা শিল্পীদের পক্ষে সহজ নয়। দিলীপকুমার স্বকণ্ঠে যে কটি গান রেকর্ড করে গেছেন এবং উমা বসুকে দিয়ে যে কটি গান গাইয়েছেন একক বা নিজের সঙ্গে দ্বৈত কণ্ঠে, তা বাংলাগানের শাশ্বত সম্পদ। গায়ক হিসাবে তো বটেই, কম্পোজার হিসাবেও সেসব রেকর্ডে যে উচ্চমার্গের শিল্পিতা ও সংগীতবোধের নমুনা রয়ে গেছে তা অনন্য কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত অননুসারিত। অর্থাৎ পরবর্তী প্রজন্ম সেই গান তার মতো করে গাইতে পারেনি। তাই বলে যে তাঁর গানগুলি আমাদের দেশের কোনও সংগীত শিক্ষাকেন্দ্রে চর্চা করা হবে না কোনওদিন, তার কারণ অনুমান করা অসম্ভব নয়। প্রথম কারণ, তিনি বাংলাদেশের সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র কলকাতা ত্যাগ করেন ১৯২৮ সালে, মাত্র ৩১ বছর বয়সে। অথচ জীবিত ছিলেন দীর্ঘ ৮৩ বছর বয়স পর্যন্ত— থাকতেন পণ্ডিচেরি ও পুণায়। দ্বিতীয় কারণ তাঁর আশ্রমবাসিত সন্ন্যাসজীবন। যেখানে বাংলাগানের কোনও পরিবেশ ছিল না। তবু তিনি নিয়মিত গান গাইতেন, তবে ক্রমশ তা একান্তভাবে ভক্তিপথমুখী হয়ে গেল।

এখানে মনে রাখা দরকার, কোনও ব্যক্তির মরণোত্তর প্রতিষ্ঠা বা তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে ধারাবাহিক চর্চা, অনুধাবন, প্রচার

এবং পরবর্তী প্রজন্ম পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে লাগে কোনও না কোনও প্রতিষ্ঠান বা ট্রাস্টের নিরন্তর তৎপরতার ব্যস্ততা। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করে শান্তিনিকেতনের অবাধ প্রসারিত প্রাকৃতিকতার মধ্যে তার রূপায়ণ করে যেতে পেরেছিলেন বলে, বিশেষ করে সংগীতভবন গড়ে তুলেছিলেন বলে, তাঁর সমগ্র গানসংগ্রহ পাওয়া যায়, তিরিশজন স্বরলিপিকারের প্রয়াসে তাঁর রচিত গানের প্রায় সবটাই স্বরলিপিবদ্ধ হয়েছে। সংগঠিত হয়েছে রবীন্দ্রসংগীতের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীমণ্ডলী তথা সমজদার শ্রেণি। বিশ্বভারতী পেয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের পর্যাপ্ত অনুদান। কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অন্তত দশটি প্রতিষ্ঠান যেখানে তাঁর গান শেখানো হয়, চর্চা হয় তাঁর গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যের। বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্রভারতীতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পাঠক্রমে রবীন্দ্রসংগীত চর্চা চলে এবং পিএইচডি ডিগ্রি দেওয়া হয়। ডিগ্রিধারীরা সমাজে মান্যতা লাভ করে এবং কাঞ্চন কৌলীন্য লাভের পথ খোলে শিক্ষার্থীদের।

এর পাশে নিষ্ঠুর ও বাস্তব সত্য হল, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ ও দিলীপকুমারের গান চর্চার কোনও স্ট্যান্ডার্ড প্রতিষ্ঠান নেই, কোনও অছি নেই। তাঁদের গান শেখাবার মতো প্রশিক্ষক নেই। সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেই। স্বরলিপি সামান্যই আছে। এঁদের গান শেখালে বা শিখলে সমাজে মান্যতা জোটে না। গণমাধ্যম যাকে বলে, অর্থাৎ রেকর্ড কোম্পানি, আকাশবাণী, চলচ্চিত্র ও দূরদর্শনের প্রচার পরিকল্পনায় এঁদের গানের তেমন চাহিদা নেই।

সেইসঙ্গে মনে পড়ে যে, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রয়াত হন মাত্র ৫০ বছর বয়সে এবং রজনীকান্ত ৪৫ বছরে। অতুলপ্রসাদ তাঁর জীবনের শেষ ৩২ বছর থাকতেন লখ্‌নৌ প্রবাসে। যেখানে বঙ্গসমাজ ছিল নিতান্ত শীর্ণ ও নিরুদ্যম। দ্বিজেন্দ্রলালের গান জনপ্রিয়তা পেয়েছিল পেশাদার রঙ্গমঞ্চে। সেই নাট্যধারা ও নটনটী যেহেতু এখন নিশ্চিহ্ন কাজে কাজেই সেইসব অসামান্য নাট্যসংগীত এখন অদৃশ্য। তাঁর একমাত্র পুত্র, সবচেয়ে সক্ষম গায়ক, যৌবনেই যোগী হয়ে যান।

কলকাতায় দ্বিজেন্দ্রলালের নির্মিত বসতবাড়িটি পর্যন্ত স্থায়িত্ব পায়নি। অতুলপ্রসাদের লেখা গানের সংকলন 'গীতিগুচ্ছ' কলকাতার ব্রাহ্মসমাজ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে মোট ২০৭ খানি গান আছে। একসময়ে দিলীপকুমার রায় ও সাহানা দেবীর ব্যক্তিগত উদ্যমে ৭৫টি অতুলপ্রসাদী গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হয়েছিল। সেগুলি এখনও গাওয়া যায়। বাকি ১৩২টি গান আমরা এখন এবং ভবিষ্যতে পাঠ করতে পারব কিন্তু গাইতে পারব না। রজনীকান্তের গানের ভবিতব্য এতটা দুর্দশাগ্রস্ত নয়। তাঁর দৌহিত্র দিলীপকুমার রায় (ছোট) এখন শতবর্ষ পেরিয়ে বার্ধক্য পীড়িত, তবে তাঁর করা রজনীকান্তের কিছু গানের স্বরলিপি দুটি খণ্ডে গ্রন্থবদ্ধ হয়েছে, প্রকাশক-পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি। তথ্য হিসাবে মনে পড়ে যায় যে, দুরারোগ্য কর্কট রোগে মরণোন্মুখ রজনীকান্ত ব্যাধির চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহের জন্য মাত্র ৪০০ টাকায় তাঁর দু'-খানি গানের সংকলনের ('বাণী' ও 'কল্যাণী') স্বত্ব বিক্রি করে দেন। এসব বাস্তব বিড়ম্বনা-কথা পঞ্চকবির গান শুনতে শুনতে কারোর মনে না পড়াই স্বাস্থ্যকর, অন্তত স্বস্তিকর।

এবারে বরং অন্য একটা কথা বলি। প্রথমেই বোঝা উচিত যে 'পঞ্চকবি' শব্দবন্ধটির অর্থ যথেষ্ট ধূসর। কেননা কবিতা আর গান সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দুটি শৈলী, তাদের অভিমুখও আলাদা। সতর্ক অবলোকনে সবাই মানবেন যে, ধরে নেওয়া যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথ থেকে নজরুল পর্যন্ত সকলেই একাধারে কবি ও সংগীতকার, যদিও অতুলপ্রসাদের লেখা একটিও কবিতা আমরা কেউ পড়িনি। তাহলে বুঝতে হবে, যাঁরা এই পঞ্চকবির তরিকা বানিয়েছেন তাঁরা 'কবি' বলতে অনেক বড় পরিধির সংজ্ঞার্থ তথা দ্যোতনা মেনে নিয়েছেন। ছাত্রবয়সে পড়েছিলাম কবি মানে যিনি কূজন করতে পারেন। তার পরে জানলাম, সংগীতকারদের বলা হয় 'বাগ্‌গেয়কার', কেননা তাঁদের কাজ হল বাক্ বা শব্দে সুরসংযোগ করে, তাল ও লয়ে গেঁথে গীতিরূপ গঠন করা। তবে নাটক যেমন অভিনেয়, গানও তেমনই গেয়। সেই গায়নে গায়ক-গায়িকার সঙ্গে সহযোগ থাকে বাদ্যকারদের। তবে এত সত্ত্বেও গান সম্পূর্ণতা পায় না, যতক্ষণ না তার শ্রোতা বা সমজদার জোটে। কবিতায় এতসব আয়োজন লাগে না, সেখানে সরাসরি থাকে দুটি অস্তিত্ব— কবিতা ও পাঠক।

কবির কবিতা আর পাঠকের সমজদারি অনেকটা আপেক্ষিক ব্যাপার। সঙ্গে সঙ্গে যে কবিতার পাঠকপ্রীতি জুটে যায় এমন নাও হতে পারে। আবার উল্‌টোটাও হতে পারে, অর্থাৎ কবি সদ্য সদ্য পেয়ে গেলেন প্রচুর মুগ্ধ পাঠক কিন্তু পরে আর সেই আবেগের স্রোত থাকল না। নজরুলের কবিতা নিয়ে এমন ঘটনা আমরাই প্রত্যক্ষ দেখেছি। বিদ্রোহী কবির কবিতা সারা দেশে তুলেছিল তীব্র আলোড়ন আর উত্তেজনা। কিন্তু সহসাই যেন তা স্তিমিত হয়ে পড়ল। অথচ আশ্চর্য যে, জীবনানন্দ দাশের কবিতা তাঁর সমকালে কতটুকুই-বা সমাদর পেয়েছিল? তাঁর নিজস্ব কবি-ভাষা আর মগ্ন আত্মবীক্ষার অন্তর্দীপ্ত শান্ত নিরুদ্বেগ কবিতাবিশ্ব এতটাই ইঙ্গিত গর্ভ আর সংকেতময় ছিল যে, সমকালীনদের সংবেদনে অভিপ্রেত সাড়া তোলেনি। প্রচ্ছন্ন একটু-আধটু ব্যঙ্গ বিদ্রূপ পরিহাস জুটছিল বরং। তারপরে তাঁর মরণোত্তর সময় ও সমাজে ধীরে ধীরে কিন্তু অভ্রান্তভাবে জীবনানন্দীয় কবিতার নিজস্ব শব্দবয়ন ও চিত্রকল্প, প্রকৃতিময়তা ও ইতিহাসবোধ একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলল প্রজন্মান্তরের

পাঠকদের অন্তঃপটে। বাংলা কবিতাই যেন বদলে গেল নবীন অবলোকনে, অভিনব প্রেমহীনতা ও নিঃসীম একাকিত্বের কথনে। যার রেশ এখনও বহমান।

গানের ক্ষেত্রে কিন্তু এমনতর ব্যাপার সচরাচর ঘটে না। যে গান সমকালীন শ্রোতাদের সমাদর পায় না, তা আর পরবর্তীকালে চর্চিত হতে পারে না। অথচ প্রকৃত ভালো গান সমকালকে তৃপ্ত প্রসন্ন করে কী এক রসায়নে কালান্তরে উত্তীর্ণ হয়ে যায়। চিরকালের গানে তাই থাকে চিরকালের শ্রোতা। তবে গান জিনিসটা স্বনির্ভর শিল্প নয়, তাকে দৃঢ়ভাবে অনুশীলন করে, বাদ্যযন্ত্রের সহযোগ নিয়ে, আসরে বা মঞ্চে যথাযথ আন্তরিকতায় শিল্পীকে উপস্থাপন করতে হয় রসগ্রাহী শ্রোতাদের সামনে। এই প্রসঙ্গে বিচার করে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের গান সমকালে যে ব্যাপক উন্মাদনা জাগিয়েছিল, তার একটা কারণ তাঁদের দুজনের গানে ছিল সুরস্বাতন্ত্র্য এবং বিষয়গত বৈচিত্র্য। লিরিকাল অথচ ড্রামাটিক। দেশি বিদেশি সুরমিশ্রণে অপরূপ অনন্য। রজনীকান্ত ও অতুলপ্রসাদের গান নাগরিক শ্রোতাদের তারিফ পায় নি। একান্তভাবে আত্মসর্বস্ব, আর্ত ও বেদনাময় নৈঃশব্দ্য তাঁদের গানকে উপভোগের বিষয় করে তুলতে পারে নি। রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে এই দুজনের সংযোগ ছিল না বলে, গানে গতিধর্ম আসেনি, সুরে জাগেনি প্রত্যাশিত চাঞ্চল্য ও উল্লাস।

কিন্তু এতসব তত্ত্বকথার আড়ালে আমাদের এই লেখার মূল প্রতিপাদ্য খানিকটা লক্ষ্যভ্রষ্ট যেন না হয়। আমাদের বলার কথাটা আসলে, রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলাল-রজনীকান্ত-অতুলপ্রসাদ-দিলীপকুমার— এই পাঁচজন বাগ্‌গেয়কারকে ঘিরে বাংলা গানের আলোকপর্বের একটি স্বতন্ত্র বৃত্ত খোঁজাই প্রকৃত কাজ। কেননা এঁরাই এনেছেন বাংলাগানের প্রকৃত আধুনিকতা— অশ্রান্ত নিরীক্ষায়, বাচনের একান্তী বিভায়, সাংগীতিক প্রতিভার প্রখর স্বাতন্ত্র্যে এবং বাংলা গানের স্বরূপ প্রতিষ্ঠার ব্রতে। মনে রাখতে হবে, শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সঙ্গে, গান রচনা এঁদের কারোর জীবিকা ছিল না। আপন আনন্দে, আত্ম আস্বাদনের টানে, নিজেই গাইবেন বলে, মরমীজনকে শোনাবেন বলে এঁরা পাঁচজন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গান রচনা করেছেন। এখনকার গান যেমন একটা স্পষ্ট পেশাদারী প্রোডাক্ট, যার নির্দিষ্ট বিনিময়মূল্য আছে, ক্রেতা বা উপভোক্তাকে আকৃষ্ট করবার বাজারী প্যাকেজ আছে— এঁদের তেমন দুর্মতি হয়নি। অর্থনীতির সহজ সূত্রে থাকে শ্রমবিভাগ বলে, অর্থাৎ একজন গান লিখবেন, আরেকজন সুর দেবেন, গাইবেন সবচেয়ে দক্ষ শিল্পী এবং থাকবেন একজন অ্যারেঞ্জার— বাজারে বেরোবে রাশি রাশি গান এবং সঠিক সময়কালে— এমন তো ভাবেননি এঁরা কেউ। নিজেরা বিশেষ ভাবাক্রান্ত নির্জন একক আচ্ছন্নতার বশে গান লিখে, তার ভাবানুসারী সুর সৃজন করে গাইবার আনন্দে গাইতেন। শ্রোতা দু-চারজন থাকলে ভালো, কেউ যদি সে-গান শিখে নেয় সে তো আরও ভালো। আত্মতৃপ্তি আর আত্মবিকাশের একটা গূঢ় মাধ্যম ছিল গান রচনার নিভৃত আনন্দ। অতুলপ্রসাদের একটা গানে আছে

মিছে তুই ভাবিস মন।
তুই গান গেয়ে যা গান গেয়ে যা আজীবন।

এই প্রত্যয় ও প্রয়াস, এই আত্মসংকল্পময় পর্যটন, গানের ভিতর দিয়ে আরেকটা ভুবন পর্যবেক্ষণের রোমাঞ্চ এঁদের গানে ভরপুর। তবে কাব্যে উপেক্ষিতার মতো, বাংলা গানের সমারোহপূর্ণ নিবেদনের আসরে সম্পূর্ণতা সাধনের কথা না ভেবে আমরা কেন বেছে বেছে শুধু দিলীপকুমার রায়ের গানকে অগৃহীত রেখে আত্মপ্রসাদ পেয়ে যাব সেটাই আমার এ-লেখার ব্যথিত প্রশ্ন।

ঋকবেদের মেয়েরা

মৌ দাশগুপ্ত

এই মুহূর্তে বহির্বিশ্বে ঋকবেদের রচনাকাল হিসেবে সবথেকে মান্য সময়সীমা ধরা হয় ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দকে। অর্থাৎ আজ থেকে অন্তত সাড়ে তিনহাজার বছর আগে রচিত হয়ে গিয়েছিল পৃথিবীর এযাবৎ-প্রাপ্ত প্রাচীনতম সাহিত্য। একে কেউ কেউ 'কেবল হিন্দুদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ' আখ্যায় সীমিত রাখতে চান কিন্তু ঋকবেদে ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, নাসত্য দেবতার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-অসুখের কথাও সমান মর্যাদায় স্থান পেয়েছিল। যিনিই মন্ত্র রচনা করেছেন তিনিই ঋষি, সে তিনি বিশ্বামিত্র বা অগস্ত্যের মতো মহাতপা পুরুষ হোন, অথবা কবষ ঐলুষের মতো জুয়াড়ি, কিংবা ঘোষার মতো বিয়ে না হয়ে বুড়িয়ে যাওয়া দুঃখী কুমারী মেয়ে। মন্ত্রে যে-বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে সেটিই সেই মন্ত্রের দেবতা (যা তেনোচ্যতে সা দেবতা— ঋকবেদের সর্বানুক্রমণী)। যেমন, ইন্দ্রের স্তুতিই যদি মন্ত্রের বিষয় হয় তবে সেখানে দেবতা হলেন ইন্দ্র, যদি দুই মানব-মানবীর প্রেম হয় বর্ণনীয় বিষয় তবে সে মন্ত্রের দেবতা হন রতি আর গভীর অন্ধকার রাত্রির বর্ণনায় স্বয়ং রাত্রিই দেবতা বলে গণ্য হন। এহেন সাড়ে দশ হাজারের বেশি মন্ত্রে গাঁথা ঋকবেদে ছড়িয়ে আছে তৎকালীন বৈদিক আর্যদের জীবনের হাজারো খুঁটিনাটি; তার মধ্যে রয়েছে তখনকার মেয়েদের কথাও।

প্রথমেই জেনে রাখা ভালো ঋকবেদেই পৃথিবীর প্রধান ধর্মগ্রন্থগুলির মধ্যে একমাত্র যার রচয়িতাদের তালিকায় ২৭ জন নারীর নাম পাওয়া যায় (দ্র. বৃহদ্দেবতা ২। ৮২-৮৪ এবং আর্ষানুক্রমণী ১০। ১০০-১০২)। যদিও এই ২৭ জনের মধ্যে অধিকাংশই বাস্তবিক নারী নন, তবু মন্ত্রগুলিতে নিহিত অভ্যন্তরীণ তথ্যের সমীক্ষায় এঁদের মধ্যে ১৩/১৪ জন সত্যিকারের রক্তমাংসের নারী ছিলেন বলে মেনে নেওয়া যায়। ঐতিহাসিক আল্‌টেকরের মতে ঋকবেদের নারী ঋষিদের মধ্যে লোপামুদ্রা, বিশ্ববারা এবং ঘোষা প্রকৃতই বিদ্যমান ছিলেন, এঁরা ছাড়াও ঋ. ১০।১৪৫ এবং ১০।১৫৯ সংখ্যক সূক্ত তথা কবিতার রচয়িতারা তাঁর মতে নিশ্চিতভাবেই নারী, যদিও পরম্পরা অনুযায়ী তাঁদের যে নাম জানা যায়— ইন্দ্রাণী এবং পৌলমী শচী— তা সত্যিই তাঁদের নাম কিনা সে বিষয়ে আল্‌টেকর সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। আল্‌টেকর কথিত এই ক'জন ছাড়াও ঋকবেদের নারী ঋষিদের পরম্পরাক্রমে আগত তালিকার মধ্যে রোমশা, অপালা, শশ্বতী, বসুক্রপত্নী, অগস্ত্যস্বসা, বাক্, গোধা, নিষৎ, উপনিষৎ এবং ঋ. ১০।১০ সূক্তের যমীও খুব সম্ভব সত্যিকারের নারী ছিলেন। এঁরা ছাড়া বৃহদ্দেবতা ও আর্ষানুক্রমণীতে উল্লিখিত অন্য নারী ঋষিদের মধ্যে কেউ ছিলেন পৌরাণিক চরিত্র— যেমন, সূর্যা সাবিত্রী, সরমা বা ঋ. ১০। ১৫৪ সূক্তের যমী বৈবস্বতী; কেউ বা স্ত্রীলিঙ্গবাচ্য জড় পদার্থ বা ভাববাচক শব্দ— যেমন, নদী, রাত্রি, মেধা, শ্রদ্ধা, দক্ষিণা; আবার কেউ বা দিব্যলোকের অধিবাসী— যেমন উর্বশী, অদিতি, ইন্দ্রমাতা ইত্যাদি।

সাধারণভাবে একটা প্রচলিত ধারণা এই যে বৈদিকযুগে মেয়েরা পুরুষদের সমান অধিকার ভোগ করতেন। পরবর্তী যুগে ভারতে নারীদের অবস্থানের সঙ্গে তুলনা করলে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে বেদের যুগে মেয়েরা অনেক ভালো অবস্থায় ছিলেন, কিন্তু তা-বলে সব ব্যাপারেই নারী পুরুষের সমান অধিকার ভোগ করতেন— এমনটা বলা অতিশয়োক্তি হবে, যেমন এটা বলাও যে বৈদিকযুগেও মেয়েরা সব ব্যাপারেই পুরুষের পদানত হয়ে থাকতেন। বেদের যুগে নারীর পুরুষের সঙ্গে সমানাধিকার ছিল— এর সপক্ষে সব থেকে বড়ো যুক্তি হিসেবে উপস্থাপিত করা হয় পত্নীর সহধর্মচারিণীর ভূমিকাটি, অর্থাৎ যাজ্ঞিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানে তাঁর স্বামীর সঙ্গে যৌথভাবে অংশগ্রহণের রেওয়াজটি (দ্র. পাণিনির ব্যাকরণসূত্র 'পত্যুর্নো যজ্ঞসংযোগে', অর্থাৎ যে স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে যজ্ঞ করেন তাঁকে পত্নী বলা হয়)। কিন্তু বলাবাহুল্য যে কেবল এইটুকুতেই নারীর সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা হয় না। তার প্রকৃত সামাজিক অবস্থান কী ছিল তা জানার জন্যে শুধু তার যজ্ঞে অধিকারের প্রসঙ্গ জানাই যথেষ্ট নয়, একটি মেয়ের জন্মাবধি জীবনের নানা স্তর পর্যালোচনার মাধ্যমে তাকে জানা জরুরি।

নারী ঋষিদের রচনায় যেমন জানা যায় ঋকবেদের মেয়েদের অন্তঃ এবং বহির্জগতের কিয়দংশ, তেমনই অন্য পুরুষ ঋষিদের রচনাতেও পাওয়া যায় তৎকালীন নারীদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে তথ্য। ঋকবেদের যুগে কন্যাসন্তান তেমন বাঞ্ছিত ছিল না, যতটা আকাঙ্ক্ষিত ছিল বহু বীর পুত্র। বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে একমাত্র বৃহদারণ্যক উপনিষদেই মেলে বিদুষী কন্যাসন্তান প্রাপ্তির জন্য দম্পতির পালনীয় আচারের কথা (দ্র. বৃ.উ. ৪/৪/১৮)। কিন্তু, অথর্ববেদে পুত্রসন্তান প্রাপ্তির জন্য বিহিত আচার (অ.বে. ৩/২৩, ৪/১১) অথবা তৈত্তিরীয় সংহিতায় ওই একই উদ্দেশ্যে বিহিত সংস্কার (তৈ.সং. ২/৬/৫/৪-৫)-এর মতো নিশ্চয়ই কন্যাপ্রাপ্তির আচারটি অত জনপ্রিয় ছিল না; ঋষিদের মন্ত্রে বারংবার পুত্র কামনাতেই তা প্রমাণ হয়। এছাড়াও পরবর্তীকালে পুংসবন নামে আচারটির জনপ্রিয়তাও এব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়। গর্ভস্থ ভ্রূণটি যাতে পুরুষ হয় সেই কামনায় পুংসবন অনুষ্ঠানটি করা হত। এমনকি ঋকবেদের নারী ঋষিরাও তাঁদের আরাধ্য দেবতার কাছে এতবার পুত্রকামনা করেছেন যে, সেখানে কন্যার অনুল্লেখ একটা রীতি বলেই গ্রহণ করা যায়। একমাত্র পৌলমী শচীর মন্ত্রেই শুনি একটি সম্রাজ্ঞী কন্যা ও বহু বীর পুত্রের জননী হবার কারণে তাঁর সগর্ব উচ্চারণ (ঋ. ১০/১৫৯/৩)।

তৈত্তিরীয় সংহিতায় একজায়গায় উপমাচ্ছলে উল্লেখ আছে জন্মের পর কন্যাসন্তানকে নিচে নামিয়ে রাখা হয় এবং পুত্রসন্তানকে উঁচুতে তুলে ধরা হয় (তৈ.সং. ৬/৬/৫/১০)। এ থেকে কোনও কোনও পণ্ডিত সিদ্ধান্ত করেছেন যে ঋকবেদের যুগে জন্মের পর কন্যাসন্তানকে পরিত্যাগের প্রথা ছিল, কিন্তু এ-মতের সমর্থনযোগ্য প্রমাণ মেলে না। অপেক্ষাকৃত অবাঞ্ছিত হলেও জন্মের পর কিন্তু বৈদিক পরিবার মেয়েটিকে অবহেলা করত না, বাবা-মায়ের স্নেহযত্ন থেকে সে বঞ্চিত হত না। ঋকবেদের ১/১৮৫/৫ মন্ত্রে আকাশ আর পৃথিবীকে বাবা-মায়ের কোলে শুয়ে থাকা দুই বোনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ঋষি বিশ্বামিত্র একটি মন্ত্রে বলেছেন— বাবা-মা যদি পুত্র ও কন্যা উভয়ের জন্ম দেন তবে পুত্র যজ্ঞকর্মের দায়িত্ব পালন করে আর কন্যা সম্মানের অধিকারী হয় (যদী মাতরো জনয়ন্ত বহ্নিমন্যঃ কর্তা সুকৃতোরন্য ঋন্ধন্— ঋ. ৩/৩১/২)। ঋকবেদের আরেকটি মন্ত্রে মা-মেয়ের পারস্পরিক ভালোবাসার ছবি আঁকা হয়েছে— মায়ের নিজের হাতে সাজিয়ে দেওয়া কন্যাটির মতোই উষা তাঁর সুন্দর দেহটি জগতের সামনে প্রকাশ করেন (সুসংকাশা মাতৃমৃষ্টেব যোষাবিস্তন্বং কৃণুষে দৃশে কম্— ঋ. ১/১২৩/১১)।

কন্যাকে শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্বও বৈদিক পরিবারের বাবা-মা পালন করতেন। সাংসারিক ও যজ্ঞের জন্যে আনুষ্ঠানিক— এই দুরকম শিক্ষাই আর্যকন্যারা পেত। ঘোষা ও অপালার মতো কুমারী কন্যারা তাঁদের আরাধ্য দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র রচনা করেছেন। বিশ্ববারা তাঁর মন্ত্রে স্পষ্ট বলেছেন যে, তিনি স্বয়ং অগ্নির উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদান করছেন। ঋকবেদের প্রসিদ্ধ ঋষি দীর্ঘতমার মা মমতা তাঁর সুমধুর যজ্ঞিয় স্তোত্রের জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন। অথর্ববেদে বলা হয়েছে ব্রহ্মচর্যের দ্বারা কন্যা যুবক পতি লাভ করে (ব্রহ্মচর্যেণ কন্যা যুবানং বিন্দতে পতিম্— অ.বে. ১১/৫/১৮)। এই ব্রহ্মচর্য শব্দটির অর্থ নিয়ে মতান্তর আছে, সুকুমারী ভট্টাচার্য তাঁর 'প্রাচীন ভারত : সমাজ ও সাহিত্য'-এ বলেছেন এই ব্রহ্মচর্য সম্ভবত কোনও ব্রত যা কুমারী কন্যারা ভালো বর পাবার আশায় করত, যেমন বাংলার মেয়েরা শিবরাত্রি ব্রত করে, সেরকমই। কিন্তু, বেদের সংহিতা অংশে ব্রহ্ম শব্দ বেদ বা মন্ত্র অর্থেই ব্যবহৃত এবং ঋকবেদে ও অথর্ববেদে বহুস্থানে ব্রহ্মচর্য শব্দটি বেদাধ্যয়ন প্রসঙ্গেই ব্যবহৃত হয়েছে কাজেই আলোচ্য ক্ষেত্রে ব্রহ্মচর্য শব্দের অর্থ বেদাধ্যয়ন না হবার কারণ নেই। আর্যকন্যারা তাদের সহোদরদের মতোই বিদ্যালাভ করত বলে বোধহয় এবং তাদের শিক্ষাদান করতেন সম্ভবত মহিলা আচার্য। পাণিনির ব্যাকরণে স্ত্রীপ্রত্যয় আলোচনায় আচার্যা (যে নারী নিজে আচার্য) ও আচার্যাণী (আচার্যের পত্নী), উপাধ্যায়া, উপাধ্যায়ী ও উপাধ্যায়ানী (দ্র. পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীসূত্র ৪/১/৪৯)। শব্দের পৃথক উল্লেখ নারী অধ্যাপিকাদের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে কাশকৃৎস্না (মীমাংসা দর্শনের একটি বিশেষ শাখায় বিশেষজ্ঞ আচার্যা) শব্দের উল্লেখও এ মতের সমর্থন করে (মহাভাষ্য ৪/১/১৪, ৩/১৫৫)।

ব্রহ্মচর্যের পরে বিয়ে থা করে মেয়েরা সংসারী হতেন কিন্তু কিছু নারী আজীবন কুমারী থেকে বেদাধ্যয়নে ব্যাপৃত থাকতেন— এঁদের বলা হত ব্রহ্মবাদিনী। আমাদের সাধারণ ধারণা হল ঋষিরা বুঝি সংসারবিমুখ সন্ন্যাসী, কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়, ঋষিরা প্রায়ই বিবাহিত সংসারী, যেমন অগস্ত্য-লোপামুদ্রা, চ্যবন-সুকন্যা। আর বেদে তো মন্ত্র যাঁর, তিনিই ঋষি, কাজেই ইন্দ্র-ইন্দ্রাণীর মতো দম্পতিও ঋষি। ঋকবেদের নারী ঋষিদের মধ্যে যাঁরা রক্তমাংসের নারী ছিলেন বলে আমাদের অনুমান, তাঁদেরও অনেকেই বিবাহিত, যেমন, রোমশা, লোপামুদ্রা, শশ্বতী, বসুক্রপত্নী, অগস্ত্যস্বসা ইত্যাদি। এঁদের মধ্যে রোমশা, লোপামুদ্রা এবং শশ্বতীর মন্ত্রগুলির অনুবাদ পড়লে রক্ষণশীলেরা মূর্ছা যাবেন; বিশদে যাচ্ছি না, এটুকু বলাই যথেষ্ট যে এঁদের তিনজনের মন্ত্রের দেবতাই রতি, মনে রাখতে হবে মন্ত্রের বিষয়বস্তুই মন্ত্রের দেবতা।

ঋকবেদের যুগে বহুক্ষেত্রেই মেয়েরা স্বয়ংবরা হতেন। বাল্যবিবাহ ছিল না। সমাজের সাধারণ পরিকাঠামো একপত্নীক ব্যবস্থাকেই অনুমোদন করত, কিন্তু বহুবিবাহ প্রথারও যথেষ্ট

প্রচলন ছিল। বিশেষ করে রাজপরিবার ও সম্ভ্রান্ত পুরোহিত বংশগুলিতে বহুবিবাহ প্রথা স্বাভাবিক ছিল। বহু মেয়ের বিয়েও হত না; অপালা ও ঘোষা এরকমই দুই কুমারী কন্যা, এঁরা কোনও চর্মরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে অঙ্গিরসের মেয়ে অকুপারও এমনই এক চর্মরোগাক্রান্ত মেয়ে। অপালার প্রার্থনায় ইন্দ্র তাঁকে রোগমুক্ত করেন। কিংবদন্তী অনুসারে ঘোষা প্রায় ষাট বছর বয়স পর্যন্ত অনূঢ়া অবস্থায় পিতৃগৃহে ছিলেন এবং মোটেই সুখী ছিলেন না। অশ্বী দেবতাদের উদ্দেশ্যে ঘোষার দুখানি কবিতায় ফুটে উঠেছে সংসার ও বীর স্বামীর ভালোবাসা পাবার জন্যে তাঁর অপরিসীম আকুলতা। কিংবদন্তী বলে অশ্বী দেবতারা ঘোষাকে নীরোগ করে তাঁর আশানুরূপ পতি দিয়েছিলেন (দ্র. বৃহদ্দেবতা ৭/৪১-৪৭)।

বিয়ের পর ঘর-গৃহস্থালীর সব কাজই পত্নী সামলাতেন— ঋকবেদের ও অথর্ববেদের বিবাহসূক্তগুলিতে বধূকে বারবার বলা হয়েছে পতিগৃহে যাবতীয় দ্বিপদ ও চতুষ্পদ প্রাণীর প্রতি কল্যাণময়ী হতে ও ভৃত্যদের প্রতি অনুকূল হতে (ঋ. ১০/৯৫/৪৩, ৪৪)। শ্বশুরবাড়িতে রানি হবেন তিনি; শ্বশুর, শাশুড়ি, ননদ, দেবর সকলের সম্রাজ্ঞী হবেন বধূ। অন্তত দশটি বীরপুত্রের জননী যেন তিনি হন আর পতিদেবতাটিকে যেন একাদশতম সন্তানের মতো দেখাশোনা করেন (ঋ. ১০/৮৫/৪৫)। উর্বশী যদিও রক্তমাংসের নারী নন, তবু তাঁর মন্ত্রে ফুটে উঠেছে ঋকবেদের কর্তব্যনিষ্ঠ বধূর ছবি— মর্তের রাজা পুরূরবার স্ত্রী হয়ে শ্বশুরবাড়িতে থাকার সময়ে উদয়াস্ত পরিশ্রম করতেন তিনি, নিজে দিনের শেষে সামান্য একটু ঘৃত পান করতেন কেবল (ঋ. ১০/৯৫/৪)।

সাধারণত স্বামী-স্ত্রী যুগ্মভাবে পারিবারিক সম্পত্তির অধিকারী হতেন, 'দম্পতী' শব্দটির অর্থ গৃহের অধিস্বামী এবং শব্দটি দ্বিবচনে থাকায় ব্যাকরণের 'একশেষ' বিধান অনুযায়ী এর অর্থ স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই। কিন্তু স্বামীর অবর্তমানে সম্পত্তিতে স্ত্রীর একক অধিকার মোটেই স্বীকৃত ছিল না, নাবালক পুত্রের অভিভাবক হিসেবে যেটুকু দেখাশোনা করার সেটুকুই স্ত্রী করতেন। যদি স্বামী অপুত্রক অবস্থায় মারা যেতেন, তাহলে? সেক্ষেত্রে তৎকালীন সমাজ সমর্থিত 'নিয়োগ-প্রথা'র মাধ্যমে তাঁর বিধবা পত্নীতে পুত্র উৎপাদন করানো হত অথবা দেবর বিবাহ করতেন বিধবা ভ্রাতৃবধূকে; দেবর ও ভ্রাতৃবধূর বিবাহ তখন খুবই স্বাভাবিক ঘটনা ছিল (দ্র. ঋ. ১০/১৮/৭,৮,৯)। ঋকবেদের বহু মন্ত্রে সরাসরি এবং উপমার মধ্যে দিয়ে দেবরের সঙ্গে বিধবা ভ্রাতৃবধূর মিলনের কথা বলা হয়েছে, আজও গাড়োয়াল অঞ্চলে এই প্রথা সমাজস্বীকৃত। ঋকবেদের যুগে সদ্য স্বামীহারা বধূ স্বামীর শেষ শয্যার পাশে শয়ন করতেন, এটি বহু প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় সহমরণ প্রথার স্মারক বলে মনে করেছেন প্রাচ্যবিদেরা, কারণ ঋকবেদের যুগে সহমরণ প্রথা প্রচলিত ছিল না (দ্র. আ.অ্যা.ম্যাকডোনেল, ভেদিক মাইথলজি)। সেই শ্মশানভূমির থেকে দেবর হাত ধরে মুমূর্ষু ভ্রাতৃবধূকে উঠিয়ে জীবনের দিকে নিয়ে আসতেন (উদীর্ষ্ব নার্যভি জীবলোকং/গতাসুমেতমুপ শেষ এহি।/হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং/পত্যুর্জনিত্বমভি সং বভূব। ঋ. ১০/১৮/৮)। একারণে নিরুক্তকার যাস্ক 'দেবর' শব্দটির অর্থগত ব্যুৎপত্তি দেখাতে গিয়ে বলেছেন 'দেবরঃ কস্মাৎ? দ্বিতীয়ো বর ইত্যুচ্যতে।' মানে, দেবর শব্দ এল কোথা থেকে? (যেহেতু তাকে) দ্বিতীয় বর বলা হয় (তাই)। ঋকবেদের যুগে যখন বহু বীর পুত্র উৎপাদন একটি সামাজিক প্রয়োজন বলে বিবেচিত হত, তখন একটি নারীর সহমরণে মৃত্যু বা বিধবা হিসেবে চির ব্রহ্মচর্য পালন একটি সামাজিক ক্ষতি বলেই গণ্য হত, বিধবার পুনর্বিবাহ প্রচলিত থাকায় নারীর মৃত স্বামীর সম্পত্তিতে অধিকারের ব্যাপারটি গুরুত্ব পায়নি।

বৃদ্ধবয়সে সন্তানবতী নারীর পুত্রই তাঁর দায়িত্ব বহন করত, একারণে নারী ঋষিদের প্রার্থনায় বারবার পুত্রসন্তানের জন্য আকূতি দেখি। যে-সব কুমারী কন্যা পিতৃগৃহে বৃদ্ধ হতেন (অমাজুর) তাঁরা ভাইয়ের সংসারেই থাকতেন। ভ্রাতৃহীন কন্যাদের বিবাহ হওয়াও মুশকিল ছিল; কেননা তৎকালীন সামাজিক প্রথা অনুযায়ী সেরকম কন্যার প্রথম পুত্রটি মাতামহকে দান করে দিতে হত এবং সে তাঁর বংশধারাই রক্ষা করত। কাজেই এরকম জামাতা খুঁজে পাওয়া কঠিন ছিল নিজের প্রথম পুত্রের স্বত্ব যে ছেড়ে দিতে প্রস্তুত। কন্যাপণের উল্লেখও ঋকবেদে আছে; গুণহীন পাত্রকে বহু ধনের বিনিময়ে কনে জোগাড় করতে হত, এরকম জামাতা নিন্দা ও উপহাসের পাত্র ছিল (অশ্রবং হি ভূরিদাবত্তরা বাং বিজামাতুর— ঋ. ১/১০৯/২)। পরবর্তী যুগে ধর্মশাস্ত্রগুলিতে এই কন্যাপণ আসুরবিবাহের একটি বৈশিষ্ট্য বলে উল্লিখিত হয়েছে।

ঋকবেদের নারীরা সভা-সমিতিতে অংশ নিতেন, মেলায় সকলের সঙ্গে উৎসবে মাততেন (ঋ. ১০/৮৫/২৬,২৭; ১০/৮৬/১০)। এই মননশীল তেজস্বিনী নারীকে যখন সপত্নীর সঙ্গে নিজের স্বামীকে ভাগ করে নিতে হত, তখন তাঁদের পীড়া কতদূর হত তা প্রকাশ পেয়েছে ইন্দ্রাণীর সপত্নীনাশক সূক্তে (ঋ. ১০/১৪৫) এবং পৌলমী শচীর আরেকটি সমধর্মী কবিতায় (ঋ. ১০/১৫৯)। বহুপত্নীক স্বামীর জীবনও যে বেশ কণ্টকময় হত তার প্রমাণ ঋকবেদের দুটি মন্ত্রে পাই যেখানে সপত্নীদের কলহে পীড়িত স্বামী কাতরভাবে বলছেন— পাঁজরার হাড়গুলো সতীনদের মতো আমাকে ভারী পীড়া দিচ্ছে (সং মা তপন্ত্যভিতঃ সপত্নীরিব পর্শবঃ— ঋ. ১/১০৫/৮ এবং ৮/১০/৩৩)।

পুরূরবা-উর্বশী সূক্তের উর্বশী যে রক্তমাংসের নারী নন

একথা আগেই বলা হয়েছে। তাও সেখানে উর্বশীর মুখে এখন একটি উক্তি আছে যা থেকে তৎকালীন সমাজে মেয়েদের প্রতি ছেলেদের মনোভাবের একটি সাধারণ পরিচয় মেলে— ন বৈ স্ত্রৈণানি সখ্যানি সন্তি/সালাবৃকাণাং হৃদয়ান্যেতা— মেয়েদের সঙ্গে সখ্য হয় না, তাদের হৃদয় হায়নার হৃদয়ের মতো (ঋ. ১০/৯৫/১৫)।

শেষকালে এটুকুই বলব, ঋকবেদের সমাজে নারীরা সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন ও পুরুষের সঙ্গে ধর্ম-কর্ম ও সামাজিক সব ব্যাপারে সমান অধিকার ভোগ করতেন— এ ধারণা যেমন অত্যুক্তি তেমনই মধ্যযুগীয় ভারতীয় মহিলাদের মতো হতাশাজনক অবস্থাও তাঁদের ছিল না। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ হলেও ঋকবেদের যুগে নারীর স্বতন্ত্র সত্তা ছিল, একারণে বিবাহসূক্তে নববধূকে বিদথ বা সমিতিতে গিয়ে নিজের কথা বলতে বলা হয়েছে (দ্র. ঋ. ১০/৮৫/২৬,২৭)। তবে শারীরিক দুর্বলতার কারণে নারীকে নিজের নিরাপত্তার জন্য পুরুষের ওপর নির্ভর করতেই হত আর তাই নারী ঋষিদের কবিতাও আকীর্ণ হয়েছে বীর স্বামী ও বীর পুত্রের প্রার্থনায়। তবে এই দৈনন্দিন জীবনের চাওয়াপাওয়ার অনেক ওপরে আরেক জীবনের সন্ধানও দিয়েছেন ঋকবেদেরই কন্যা বাক্ আম্ভৃণী তাঁর আশ্চর্য কবিতায়, যেখানে তিনি নিজের মধ্যে দেখছেন বিশ্বভুবনের উৎস, অনুভব করছেন এই জগৎকে আঁকড়ে নিজের নিরন্তর বয়ে চলাকে—

অহমেব বাতইব প্রবাম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা।
পরো দিবা পর এনা পৃথব্যৈতাবতী মহিনা সং বভূব।
(ঋ. ১০/১২৫/৭)

বুকের ভিতর আঁকড়ে ধরে বিশ্বভুবন
স্রষ্টা আমি চলেছি বয়ে হাওয়ার মতন।
ছাড়িয়ে আকাশ ছাড়িয়ে বিশাল এ-পিথিমি
দাঁড়িয়ে আছি কি মহিমায় বিপুল আমি।

(অনুবাদ : গৌরী ধর্মপাল,
পুরোনোতুন বেদের কবিতা, পৃ. ৬৬)

শিল্পী : শুভাশিস সাহা

বিজ্ঞানের ইতিহাস কি নিষিদ্ধ হওয়া উচিত?

মানসপ্রতিম দাস

বিষয়টার উল্লেখ শুনলে আজও অনেকে ভুরু কুঁচকে তাকান, তাঁদের মতে দুটো এমন আপাত সম্পর্কশূন্য ক্ষেত্রকে জুড়ে দেওয়ার 'অহেতুক' প্রয়াস সময় নষ্টের শামিল। অনেকে তাচ্ছিল্য করে বলেন, 'হ্যাঁ, ইতিহাসের গল্প একটু-আধটু জানলে মন্দ কী!' অনেকে আবার নিজের ছাত্র-ছাত্রীদের সাবধান করে দিয়ে বলেন যে এসব কাজে মাথা দিয়ে গবেষণার ক্ষতি যেন না করে তারা। বলছি বিজ্ঞানের ইতিহাসের কথা। এই যে প্রতিক্রিয়াগুলোর কথা বললাম সেগুলো সবই বিজ্ঞানের গণ্ডির মধ্যে থেকে আসে। অস্বীকার করে লাভ নেই যে আজও বিজ্ঞানের ইতিহাসকে উপযুক্ত গুরুত্ব দিতে চান না বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা। অথচ এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে থেকেই বেরিয়ে এসেছেন বেলজিয়ামের গণিতজ্ঞ জর্জ সার্টন যিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকা পৌঁছে বিজ্ঞানের ইতিহাসকে করে নিলেন তাঁর সারা জীবনের সাধনার ক্ষেত্র তাঁর হাতে তৈরি হয়েছে আজকের বিজ্ঞান-ইতিহাসচর্চার ভিত। এই নাক-উঁচু প্রতিষ্ঠানেরই প্রতিনিধি ছিলেন জীবরসায়নবিদ যোসেফ নীডহ্যাম যিনি চিনের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিচর্চার প্রাচীন ইতিহাসকে মর্যাদা দিয়ে গ্রন্থিত করেন। এমন আরো বেশ কয়েক জনের নাম করা যায় যাঁরা প্রথা মেনে বিজ্ঞানের গবেষক হওয়ার পরেও ইতিহাসকে মর্যাদা দিয়েছেন, বহু পরিশ্রমে রচনা করেছেন মানুষের বিজ্ঞানচর্চার নানা যুগের প্রামাণ্য ইতিহাস। কিন্তু গোঁড়া মনোভাব সহজে পালটায় না। ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত ঝোঁকের কারণে যেটাকে একবার 'ব্রাত্য' বলে ধরে নেওয়া হয়েছে তাকে স্বাগত জানানোর সাহস বা উদ্যোগ খুঁজে পান না কেউই। ফলে বিজ্ঞানের ইতিহাস তার প্রাপ্য সম্মান পায় না।

উপরের অনুচ্ছেদ যদি বিলাপ মনে হয় তবে বলে রাখা ভালো যে এই বিলোপের বয়স অনেক। অচেনা প্রায় কিছুই নেই এর মধ্যে। বর্তমান প্রবন্ধে এই আক্ষেপ-পর্ব ছেড়ে বেরিয়ে এসে অনেক বেশি বিপজ্জনক প্রশ্ন রাখার চেষ্টা হবে। সে প্রশ্ন কিছু পরিমাণে যদি বিজ্ঞানের সরলরৈখিক অগ্রগতির ধারণাকে চ্যালেঞ্জ জানায় তবে তাই জানাক। প্রশ্নে যাওয়ার আগে দেখা যাক যে যেখানে যেখানে বিজ্ঞানের ইতিহাস প্রবেশাধিকার পেয়েছে সেখানে সেখানে তার কাছে প্রত্যাশা কী। এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে ইতিহাস রচনার মাধ্যমে বিজ্ঞানের 'প্রগতি'-র ধারণাকেই আরো পুষ্ট করবে বিজ্ঞানের ইতিহাস, এটাই কাম্য। বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠান বলতে চায় যে বিজ্ঞানীরা সবসময় সবকিছুকে প্রশ্ন করেন, বিনা পরীক্ষানিরীক্ষায় কোনো চালু দাবিকে মেনে নেন না, গ্যালিলিও-নিউটন-কেপলার তাঁদের পরীক্ষা বা গণনায় এমন ঠিকঠাক তথ্য পেয়েছেন যে সহজেই প্রমাণ হয়ে যায় তাঁদের তত্ত্ব ইত্যাদি। কিন্তু ইতিহাস একটা গোষ্ঠীর দাবি মেনে সংকীর্ণ একটা গণ্ডির মধ্যে ঘোরাঘুরি করতে যাবেই-বা কেন! তার কি স্বাধীন অস্তিত্ব থাকতে নেই? স্বাধীন ইতিহাসচর্চা প্রতিষ্ঠানের বহু দাবিকেই চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে। এই যে শুধু অগ্রগতির পথে ছুটে চলা বিজ্ঞানের ধারণা, এটাকে বিশ্লেষণ করতেই বেরিয়ে আসে এমন ফাঁকফোকর যা স্বস্তি দেয় না আত্মগর্বী বিজ্ঞানীকে।

টমাস কুনের বক্তব্য

'সন্দেহ' ব্যাপারটাকে বিজ্ঞানের কাঠামোর মূলগত একটা বিষয় বলে প্রচার করেন কাণ্ডারিরা। বলা হয়, এই সন্দেহ করার অভ্যাসই পারে চালু তত্ত্বের আধিপত্য মুছে দিয়ে একেবারে নতুন, কার্যকরী তত্ত্বকে নিয়ে আসতে। এভাবেই সফল হতে পারেন একজন বিজ্ঞানী। কিন্তু সত্যিই কি তাই? একটু অনুসন্ধানী চোখ নিয়ে চারিদিকে তাকালেই দেখা যাবে যে অধিকাংশ বিজ্ঞানী প্রতিষ্ঠিত নিয়মকানুন মেনে ধরাবাঁধা পথে গবেষণা করেন অধিকাংশ সময়। প্রথার বাইরে বেরোনোর জন্য বিজ্ঞানীর কাছে কোনো সাহস যেমন নেই তেমনি ইনসেন্টিভও নেই। বিজ্ঞানের ইতিহাসকার টমাস কুনের বক্তব্য হল, বিজ্ঞান শিক্ষার লক্ষ্য কখনোই সন্দিহান মন তৈরি করা নয়। ইংরেজিতে যাঁদের বলে 'স্কেপটিক্স' সেইরকম মনোভাবের গবেষক তৈরি হওয়া যুগে যুগে চালু থাকা বিজ্ঞান শিক্ষার পদ্ধতিতে প্রায় অসম্ভব। এই

শিক্ষা আসলে চায় সেইসব ছেলে-মেয়েকে আরো পারদর্শী করে তুলতে যারা ধাঁধা বা পাজ্‌ল সমাধান করতে খুব দক্ষ। লক্ষ্য এটাই যে এইসব ছাত্র-ছাত্রীরা প্রশিক্ষণ পেয়ে চালু ব্যবস্থার নিয়মের মধ্যে গবেষণাপত্র লিখে সাফল্য পাবে। কুন এটাকেই বলেছেন 'নর্মাল সায়েন্স' অর্থাৎ বিজ্ঞানচর্চার স্বাভাবিক ধারা। বিজ্ঞানে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ধারণাকেও তাচ্ছিল্য করেছেন কুন। তাঁর মতে এখানে দুটো তত্ত্বের মধ্যে চুলচেরা বিচার সম্ভব নয় কারণ প্রতিদ্বন্দ্বী তত্ত্বগুলো একেবারে আলাদা ধাঁচে গড়া। ইংরেজি 'প্যারাডাইম' শব্দ দিয়ে এই ধাঁচকে সূচিত করা হয় সাধারণভাবে। প্রত্যেকটা প্যারাডাইমে তত্ত্ব যেমন আলাদা, সমস্যা সমাধানের রীতি বা সমাধান বেরিয়ে এলে সেটাকে চিনে নেওয়ার নির্দেশনামাও আলাদা। ফলে দুটোর মধ্যে সেই অর্থে বিতর্ক হবে কী করে! প্রকল্প বা হাইপোথেসিস তৈরি করে তথ্যের সাহায্যে সেটার সত্যতা যাচাই করার নিরন্তর প্রয়াস, তার মধ্যে থেকে নতুন তত্ত্বকে গ্রহণ করা বা পুরোনোকে বর্জন করা— এসবও প্রচারমাত্র। আসলে বিকল্প একটা তত্ত্ব যদি এমন হয় যে সেটা পুরোনো তত্ত্বের জায়গা নিতে পারে তাহলেই একটা তত্ত্বকে বাতিল করার আগ্রহ দেখা যায় সংশ্লিষ্ট মহলে।

একরোখা গ্যালিলিও

নিকোলাস কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক মহাবিশ্বের ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করেন গ্যালিলিও। এই সাফল্যকে উচ্চগ্রামে যেভাবে প্রচার করা হয়েছে যুগে যুগে তাতে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। ১৯৩০-এর দশকে আলেকজান্ডার কয়্যার দাবি করেন যে গ্যালিলিওর অবদান আসলে টেলিস্কোপের মধ্যে দিয়ে আকাশ পর্যবেক্ষণেই সীমাবদ্ধ। এই যন্ত্র ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহে তাঁর কুশলতা ছিল অতুলনীয়। কিন্তু বাস্তবে তিনি কোনো নতুন তত্ত্ব দেননি। আবার, যতটা তিনি এই যন্ত্রের সাহায্যে দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন তার থেকে অনেক বেশি বিশ্বাস করতেন যে মানুষকে বার বার বলতে হবে যে কোপার্নিকাসের ধারণাই সঠিক। কথার জাল বিস্তার করে সূর্যকেন্দ্রিক জগতের ধারণায় বিশ্বাসী করানোটাই হচ্ছে আসল কাজ, এটাই ছিল গ্যালিলিওর ভাবনা। এ যেন প্লেটোর ভাবনারই প্রতিধ্বনি! মানুষের আইডিয়ার প্রতিফলন ঘটে বস্তুজগতের চলাচলের মধ্যে অর্থাৎ আইডিয়াটাই বড়ো! এই ভাবনার শরিক হওয়ায় গ্যালিলিওকে প্লেটোনিস্ট আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

প্রকাশের পর এই ধারণা সবার কাছে গ্রহণীয় হয়নি। বরং বেশ কড়া সমালোচনার মুখে পড়ে আলেকজান্ডার কয়্যারের এই ব্যাখ্যা। কিন্তু এই নতুন শতাব্দীতে কেন্টাকির জেফারসন কমিউনিটি কলেজের পদার্থবিজ্ঞানী ক্রিস্টোফার গ্র্যানির মতো মানুষদের গবেষণায় উঠে এসেছে যে গ্যালিলিও এমন কোনো নিশ্চিত তথ্য পাননি যা দিয়ে কোপার্নিকাসের ধারণাকে সবার সামনে সমর্থন করা যায়। বরং পৃথিবীকেন্দ্রিক ধারণাই অনেক সংগত মনে হয়েছিল সেসময়ে। তবু সূর্যের কেন্দ্রে থাকার ব্যাপারটা নিয়ে গ্যালিলিও সরব হয়ে রইলেন আজীবন! নিখাদ, বস্তুনিষ্ঠ প্রমাণের উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানের তরতর করে এগিয়ে যাওয়ার যে নিটোল কাহিনি ছোটোবেলা থেকে শুনে আসি আমরা তা ভীষণভাবে মার খায় এহেন অনুসন্ধানে। তাই কেউ কেউ প্রশ্ন করেছেন, বিজ্ঞানের প্রচারিত ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে যে বিদ্যাচর্চা তাকে কি প্রশ্রয় দেওয়া উচিত? শিক্ষাঙ্গণে তার অবাধ চর্চা কি হতে দেওয়া সমীচীন? আসলে এই প্রশ্নটা বিজ্ঞানের ইতিহাসকাররাই করেছেন, ঘুরিয়ে এমন ইতিহাসের অভ্যন্তরীণ শক্তি জাহির করতে।

নিউটন তথ্য জাল করেছেন

মার্কিন পণ্ডিত রিচার্ড ওয়েস্টফল ১৯৮০ সালে আইজ্যাক নিউটনের প্রামাণ্য এবং সবথেকে নির্ভরযোগ্য জীবনী প্রকাশ করেন। বইয়ের নাম দেন— *নেভার অ্যাট রেস্ট*। নিউটনকে ইউরোপীয় ইতিহাসের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বলে বর্ণনা করেও তিনি এই ইংরেজ বিজ্ঞানীর কোনো ত্রুটি ধরতে বাকি রাখেননি। সাফল্য অর্জনে ভীষণভাবে উন্মুখ নিউটনকে তিনি পাগলাটে, প্রায়শই রসবোধশূন্য এবং প্রতিশোধপরায়ণ একজন মানুষ হিসাবে তুলে ধরেন। বিজ্ঞানের ধারণায় বিপ্লব আনা নিউটনের বই *প্রিন্সিপিয়া* বিশ্লেষণ করে ওয়েস্টফল বলেন যে নিজেকে নিখুঁত প্রমাণ করার চেষ্টায় নিউটন সুকৌশলে তথ্য জাল করেন। তাঁর তত্ত্বের সঙ্গে খাপ খেয়ে যায় যেগুলো, পর্যবেক্ষণ থেকে পাওয়া এমন তথ্যকেই কেবল বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করেন নিউটন। যেসব তথ্য নিয়ে তাঁর অসুবিধে হত সেগুলো বাদ দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করতেন না তিনি। বই থেকে এলোমেলো অনেক উদাহরণ হয়তো দেওয়া যায় কিন্তু শব্দের গতিবেগ নিয়ে কাজটা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। বায়ুর মধ্যে দিয়ে শব্দের চলাচল নিয়ে পরিমাপ করতে গিয়ে তাত্ত্বিক দিকে নিউটনের কোনো ভুল হয়নি। শব্দকে স্থিতিস্থাপক বায়ু মাধ্যমের কম্পনের ফসল বলে ধরে নেন তিনি। শব্দের এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় পাড়ি দেওয়ার সময় বায়ু মাধ্যমের স্থিতিস্থাপকতা আর ঘনত্বের অনুপাতকে সমূহ গুরুত্ব দেন নিউটন। এভাবেই গতির পরিমাপ পাওয়া যাবে বলে জানান তিনি। এতে কোনোরকম অসংগতি ছিল না। কিন্তু দুটোর অনুপাত থেকে যখন তিনি শব্দের গতি মাপলেন তখন দেখলেন যে কুড়ি শতাংশের গরমিল হচ্ছে। তখন পর্যবেক্ষণ থেকে পাওয়া তথ্য আর তত্ত্বের মধ্যে গরমিলকে সামাল দিতে দু-দুটো গোঁজ দিলেন আইজ্যাক নিউটন। দুটোই কিন্তু ছিল কাল্পনিক!

প্রথমত তিনি ধরে নিলেন যে বায়ুর কণার মধ্যেকার ফাঁকা অঞ্চল দিয়ে যাওয়ার সময় শব্দের গতিবেগ থাকে একটা সীমার মধ্যে। কিন্তু যেই কোনো বায়ুর কণা সামনে পড়ে গেল অমনি শব্দ অসীম গতিতে বেরিয়ে যায় তার মধ্যে দিয়ে। তাই কণাগুলো ঠিক যতটা আয়তন দখল করে থাকে তার উপর ভিত্তি করে একটা গোঁজ ফ্যাক্টর ঢুকিয়ে দেন নিউটন। আর একটা গোঁজ ছিল বায়ু আর বাষ্পের মিশ্রণ নিয়ে। নিউটন বলেন যে আমাদের চারিদিকে শুধু যে বায়ু ঘিরে রয়েছে তা নয়। তার সঙ্গে মিশে রয়েছে বাষ্প যা শব্দের চলাচলে বাধা দেয়। এর ফলে শব্দ আরো দ্রুতবেগে চলতে থাকে। তাই তিনি সংশোধন হিসাবে আর একটা গোঁজ ঢোকালেন। এই দুটো গোঁজ ব্যবহার করার ফলে তাঁর বন্ধু উইলিয়াম ডারহামের মাপা শব্দের গতির সঙ্গে একেবারে ঠিকঠাক মিলে গেল তত্ত্ব থেকে পাওয়া গতি। পুরোপুরি ১১৪২ ফিট প্রতি সেকেন্ডে! *প্রিন্সিপিয়া*-র এই অংশটাকে সবথেকে গোলমেলে বলে আখ্যা দিয়েছেন রিচার্ড ওয়েস্টফল। এই দুটো গোঁজ ব্যবহার করার আগে কোনোরকম বাস্তব পরীক্ষা করেননি নিউটন! স্রেফ কল্পনার ভিত্তিতে এগুলোকে ঢুকিয়ে নিজের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাকে সফল বলে দেখাতে চেয়েছিলেন নিউটন।

এই বিষয়টা ছাড়া আরো বেশ কয়েকটা ক্ষেত্রে গোঁজ ব্যবহার করেন নিউটন। চাঁদের উপরে কতটা মহাকর্ষ বল কাজ করছে, নদীতে জোয়ারের উচ্চতা কত হবে বা নিরক্ষরেখায় পৃথিবীর স্ফীত হয়ে থাকার পরিমাণ— এইসব ক্ষেত্রে মূল পদার্থবিজ্ঞানটা ধরে ফেললেও তাঁর কাছে উপযুক্ত তথ্য ছিল না যেগুলো পর্যবেক্ষণ থেকে পাওয়া গিয়েছে। আঙ্কিক ভিতটা তখনও তৈরি করে উঠতে পারেননি নিউটন। তাই হয় তিনি গোঁজ ঢোকালেন আর নয়তো তাঁর তত্ত্বের সঙ্গে যে তথ্য খাপ খায় শুধু এগুলোকেই নিলেন বেছে। ওয়েস্টফল ছাড়াও যাঁরা নিউটনের এই গোঁজামিলের প্রবণতা লক্ষ করেছেন তাঁরা একটা ব্যাপারে খুব নিশ্চিত। সেটা হল, ভুলক্রমে নিউটন করেননি এগুলো। এত বেশি বার এমন গোঁজ ঢুকেছে তাঁর বইতে যে ভুল বুঝে তিনি এটা করে ফেলেছেন, এমন ধারণাটা কোনোভাবেই তৈরি হতে পারে না!

প্রশ্ন উঠতে পারে যে এত মারাত্মক গোঁজামিল ধরা পড়ল না কেন? তারও একটা সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন বিজ্ঞানের ইতিহাসকাররা। আজকের দিনের অনেক বইয়ের মতোই নিউটনের *প্রিন্সিপিয়া* যতটা সম্মানের ছিল ততটা পড়া হত না। ফলে নজরের আড়ালেই থেকে যায় ভুলগুলো। বর্তমান পদার্থবিজ্ঞানের একটা বড়ো অংশ নিউটনের দেওয়া তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার ফল হলেও *প্রিন্সিপিয়া*-তে যেভাবে লেখা আছে বিষয়গুলো সেভাবে নিউটনীয় পদার্থবিজ্ঞান লেখা থাকে না পাঠ্যবইতে। এর থেকেও *প্রিন্সিপিয়া*-র সুনামে আঁচড় না পড়ার বড়ো কারণ হল এই যে বইয়ের বিষয়বস্তু প্রায় পুরোটাই নিউটনের অনুসারীরা পুনর্বিন্যাস করে ছাপান। ভাষাও বদলে দেন লেনার্ড অয়লারের মতো সুইস গণিতজ্ঞ বা ল্যাপলাসের মতো ফরাসি বিশেষজ্ঞরা। এঁদের কাছে নিউটন অবিসংবাদী নায়ক কিন্তু তাঁর পরিবেশনকে অবিকৃতভাবে মানুষের কাছে পৌঁছোতে দেওয়া উচিত নয়। তাই নিউটনের ভাষ্য পালটে নিউটনকে উপস্থাপনের এত আয়োজন!

তত্ত্বের প্রয়োজনে তথ্য

শুরুতে যে আলোচনা রাখা হয়েছে সেটারই পুনরাবৃত্তি করা যাক। সাম্প্রতিক অতীতে বেশ কিছু বিজ্ঞান ইতিহাসকার এই ব্যাপারটা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন যে বিজ্ঞানীদের অনেকেই বস্তুনিষ্ঠ পথে এগোন না। তাঁদের কাছে পরীক্ষালব্ধ তথ্যের মূল্য থাকলেও সেটা গৌণ। নিজেদের মতবাদের দার্শনিক কাঠামোটাই তাঁদের কাছে সবথেকে মূল্যবান। এঁরা বলতে চান, দর্শন নিয়ে বাদানুবাদের মধ্যে দিয়েই পরিবর্তন এসেছে বিজ্ঞানে। এইসব ইতিহাসকারদের জন্য মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক স্টিফেন জে ব্রাশের পরামর্শ হল, আরো বেশি উদ্যোগী হয়ে বৈজ্ঞানিক পরিবর্তনের এই সামাজিক-মানসিক-দার্শনিক উপাদানের নথি তৈরি করতে হবে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির যে সরলরৈখিক ধারণাকে এত দিন বার বার সামনে আনা হয়েছে, বিজ্ঞানের ধ্বজায় যে বস্তুনিষ্ঠার রেখাচিত্র প্রকট করে আঁকা রয়েছে তা যে বহু ক্ষেত্রে বাস্তব অনুসারী নয়, তা সামনে আনতে হবে ক্রমাগত। এতে কোন বিজ্ঞানী বা গবেষণাগারের প্রশাসক ক্ষুণ্ণ হলেন তাতে ইতিহাসের কিছু আসে যায় না। তাঁদের কেউ কেউ যদি সত্যানুসন্ধানে ভীত হয়ে বিজ্ঞানের ইতিহাসকে নির্বাসন দিতে চান তবে তাঁদের অজ্ঞতাই প্রমাণিত হবে আরো বেশি করে।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও দর্শনের অধ্যাপক ইস্রায়েল শেফার বিজ্ঞানের জগতে বস্তুনিষ্ঠার উলটো দিকে হাঁটার বিপজ্জনক প্রবণতা লক্ষ করেছেন বার বার। তিনি খুব স্পষ্টভাবে বলছেন, তত্ত্ব এখন তথ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, বরং তত্ত্বের প্রয়োজনেই তৈরি করা হচ্ছে তথ্য। প্রতিদ্বন্দ্বী তত্ত্বগুলোকে কোনো এক নিরপেক্ষ আদালতে বিচার করে রায় দেওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এমন আলোচনা যখন করা হয় তখন 'বিজ্ঞান কি আজ বিপন্ন?' গোছের শিরোনাম দিয়ে উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা চলে। কিন্তু ইতিহাসকারের কাজ তাৎক্ষণিক শিহরন সৃষ্টিতে সীমাবদ্ধ নয়। মানুষের কল্যাণের দাবি করা বিজ্ঞানের পথ চলার খুঁটিনাটি গ্রন্থিত করাই তার লক্ষ্য, নির্বাসিত হওয়ার ঝুঁকি সত্ত্বেও।

মস্তিষ্কের আকার-প্রকার

তৃষিতানন্দ রায়

মস্তিষ্ক বা ব্রেনের শতকরা ৮০ ভাগ হচ্ছে সেরিব্রাল কর্টেক্স (Cerebral cortex) বা মস্তিষ্কের উপরিভাগ। ডান বা বাম দুই অর্ধ গোলাকৃতির আকারে থাকে। এই দুই গোলার্ধজুড়ে ১০০ বিলিয়নের উপর স্নায়ুকোষ ও সঙ্গে অন্যান্য সহযোগী কোষ। অন্য যেকোনো বৃহৎ স্তন্যপায়ী প্রাণী যেমন হাতি বা তিমির স্নায়ুকোষের থেকেও অনেক বেশি। এই অতিরিক্ত স্নায়ুকোষের জন্যই মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি স্মৃতি ধারণা আর পরিস্থিতি অনুযায়ী যথাযথ কার্যাবলির প্রয়োগ 'cognitive flexibility' প্রাণীজগতের অন্যান্যদের অনেক উপরে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে কর বিনিয়ান ব্রডম্যান নামে জার্মান স্নায়ুবিজ্ঞানীর (১৮৬৮-১৯১৮) যুগান্তকারী গবেষণার মাধ্যমে জানা যায় যে স্নায়ুরোগের গঠন বা কার্যাবলি অন্যান্যদের থেকে অনেকাংশে উন্নত। মানব মস্তিষ্কের সামনের এক বিশেষ অংশ থাকে যাকে বলা হয় Neocortex। প্রাণীজগতের অন্য কারও নেই। এক-একটি Cerebral hemisphere-কে প্রধান চার ভাগে— ফ্রন্টাল (Frontal), প্যারায়েটাল (Parietal), টেম্পোরাল (temporal) ও অক্সিপিট্যাল (Occipital) যা যথাক্রমে সামনে, মস্তিষ্কের দুই পাশে ও পিছনের দিকে থাকে। ব্রডম্যান এর পরেও দুই গোলার্ধকে ৫২টি নির্দিষ্ট অঞ্চলে ভাগ করেন যাদের আলাদা আলাদা কাজ। চিকিৎসা বিজ্ঞানে এর কোনো বিকল্প নেই। উদাহরণ হিসাবে মস্তিষ্কের বাম গোলার্ধের বা ৪নং এরিয়া শরীরের ডান দিকের হাত পা ও অন্যান্য অংশের সঞ্চালন করায়, ওই দিকেরই ৪৪ বা ৪৫নং এরিয়া কথা বলায় সাহায্য করে, ১৭নং এরিয়া দৃষ্টিশক্তি উৎপন্ন করে ইত্যাদি ইত্যাদি। আধুনিককালে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতি বিশেষভাবে স্নায়ু-বিজ্ঞানে CT, MRI, PET, SPECT ইত্যাদি পরীক্ষার মাধ্যমে ব্রাডমানের উপরিউক্ত অঞ্চলগুলির দোষত্রুটি নির্ণীত হয়। আবার এটাও জানা যায় যে, এমনকী ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র স্নায়ু-কোষও বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্নের মাধ্যমে কাজ করে। সেই প্রবাহিত বিদ্যুৎতরঙ্গের মাধ্যমেই আমাদের ভাবনা, চিন্তা, চেতনা, শান্তি, অশান্তি, প্রশান্তি বিচার, বিশ্লেষণ, স্মৃতি-বিস্মৃতি সবকিছুই মস্তিষ্ক নামক কারখানা থেকেই উৎপাদিত হয়। সাধারণ কাজের বিচ্যুতি হলেই তা অসুখ এবং পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে সেই অসুখগুলি ব্রাডম্যানের কোন এরিয়া বা অঞ্চলকে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে তা নির্ণয় করা হয়। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসাবে 'মৃগী' রোগের উদাহরণ দেওয়া যায় যা অতি প্রাচীন রোগ এবং ব্রেনের হেন অংশ নেই যা মৃগী রোগে আক্রান্ত হয় না। খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ বছরে হিপোক্রিটিস যাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক বলা হয়ে থাকে তিনি তাঁর The Sacred Disease বইতে মৃগী নিছকই এক রোগ বলে উল্লেখ করেন। ভূত-প্রেত, ডাইনি বা ঈশ্বরের কোনো লীলা নয়। মৃগী বা এপিলেপ্সি (Epilepsy) ব্রেনের এক অসুখ। আরো অনেক আগে মেসোপটেমিয়াতে তৎকালীন প্রাচীন আসিরিয়া সাম্রাজ্যের ইতিহাসেও মৃগী রোগের উল্লেখ পাওয়া যায় যা ব্রিটিশ মিউজিয়ামে এখনও রাখা আছে। আমাদের চরক-সংহিতাকেও 'আপস্মা' বা মৃগী রোগের কথা লেখা আছে। অথচ আজও একবিংশ শতাব্দীতে এমনকী উন্নত দেশ বলে যারা চিহ্নিত সব জায়গাতেই মৃগী রোগকে ঘিরে কুসংস্কার, ভৌতিক পারলৌকিক থেকে আধ্যাত্মিক, অতীন্দ্রিয় বা সমাধিপ্রাপ্তি যার মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগকারী ইত্যাদি হিসাবে ধরা হয়। আমাদের মতো দেশে গ্রামে-গঞ্জে প্রায়শই ঠাকুরের ভর ওঠা আর তাকে ঘিরে হাজারো গরিব গ্রামবাসীর জড়ো হওয়া পয়সাকড়ির লেনদেন চলে।

অথচ আজদের দিনে অনেকেই জানেন ব্রেনের স্নায়ুকোষের স্বাভাবিক ছন্দের বিঘ্ন ঘটার জন্যই মৃগী বা এপিলেপ্সির লক্ষণ দেখা যায় যা EEG বা Electroencephalography যন্ত্রের সাহায্যে নির্ণয় করা যায়। না হলেও অভিজ্ঞ চিকিৎসক ঠিকই ডায়াগনোসিস করতে পারবেন।

এক ধরনের মৃগী রোগ সাধারণ মানুষ যারা চিকিৎসক নন তাঁরাও বলে দিতে পারেন। জনসমক্ষে কোনো এক ব্যক্তি যদি হঠাৎ পড়ে যায়, সারা শরীরে খিঁচুনি হতে থাকে, চোখ উলটে যায়, জিভ কেটে— মুখ দিয়ে রক্ত বের হয় আবার ১-২

মিনিটের মধ্যে জ্ঞান ফিরে পান— এ তো আমরা অনেকেই জানি এটা মৃগী রোগ। এটা এক বিশেষ ধরনের যাকে বলা হয় সম্পূর্ণ বা generalised মৃগী যাতে মস্তিষ্কের দুই দিকই অস্বাভাবিক হয়, এই ধরন ছাড়াও আরো অন্যান্য ধরনের মৃগী বা এপিলেপ্সি রোগ হয় যা ধরতে পারা অনেকসময়ই খুব সহজ নয়। এই বিভিন্ন ধরনের মৃগী রোগীই অনেক বেশি কিন্তু তা সাধারণ মানুষের জ্ঞাত থাকার কথা নয়, সরল করে বলতে হলে এই ধরনের মৃগী রোগকে partial বা আংশিক মৃগী বলে চিহ্নিত করা হয়। ব্রেনের যে-অংশে অস্বাভাবিক কাজকর্ম হয় রোগের লক্ষণ সেই রকমই হয়। অনেকসময় মানুষের হুঁশ থাকে, অনেকসময় নয়। হুঁশ না-থাকলেও রোগীর কিছু কিছু জ্ঞান থাকতে পারে বা বিকৃত ভাবের উদয় হতে পারে। শেষোক্ত ধরনকে বলা হয় টেম্পোরাল লোব এপিলেপ্সি যা আমাদের কানের পিছনে মস্তিষ্কের যে-অংশ তারই অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র অঞ্চল থেকে অস্বাভাবিক মস্তিষ্ক-ছন্দের কারণে উৎপত্তি হয়। উদাহরণ হিসাবে hallucination বা অলীক কিছুর অস্তিত্বে বিশ্বাসী যেমন কানে কিছু শোনা যেমন দৈববাণী, চোখে কিছু দেখা যেমন মূর্তিকে জীবন্ত ভেবে তার সঙ্গে কথা বলতে থাকা বা অতি অন্ধকারে হঠাৎ করে অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য তারপরে মূর্ছা যাওয়া বা না-যাওয়া সবই হতে পারে।

Deja-vu Phenomenon অর্থাৎ সম্পূর্ণ অচেনা মানুষকে, অজানা পরিবেশকে অত্যন্ত পরিচিত মনে করা। ক্ষণেকের জন্য অতিরিক্ত ভয়, অবসাদ বা অস্বাভাবিক উচ্ছলতা। এরকম অসংখ্য উদাহরণ আছে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে অতীত কাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিকে আমরা জানি যাদের মৃগী রোগ ছিল বা আছে। কেউ কেউ সন্দেহের ঊর্ধ্বে নন। অতীতে এই অসুখ সম্বন্ধে এতটা সচেতনতা তো ছিল না, জ্ঞান ছিল না, পরীক্ষানিরীক্ষাও ছিল না। তবে একটা কথা আজও সত্য মৃগী রোগীর বর্ণনাই ও চিকিৎসকের অভিজ্ঞতা অসুখ নির্ণয়ে সবথেকে সাহায্যকারী। বিখ্যাত রাশিয়ান উপন্যাসিক ফিয়োদোর ডস্টয়ভস্কি তিনি যখন মৃগী আক্রান্ত হতেন তখন অনির্বচনীয় এক ধরনের সুখ অনুভব করতেন। একথা তিনি নিজেই বলতে পারতেন ।

এই ধরনের সুখানুভূতির সময়ে অনেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করতেন। যেমন সেন্ট পলসের নিজের বর্ণনায় যতটুকু পাই তিনি একবার বলছেন দামাস্কাস যাওয়ার পথে মরুভূমি দিয়ে সঙ্গীসাথিসহ হেঁটে চলেছেন তখনও তিনি সেন্ট হননি। হঠাৎ চোখের সামনে তীব্র আলো অনুভব করলেন, কানে দৈববাণী শুনতে থাকেন আর তারপরে যা তার সঙ্গীরা বলেছেন পল দুই হাঁটুর উপর বসে পড়েন এবং জ্ঞান হারান। তখন তিনি খ্রিস্টবিরোধী ছিলেন। এই ঘটনার পরে ওঁর মধ্যে ধর্মচেতনার আমূল পরিবর্তন ঘটে ও তিনি রোম সাম্রাজ্যে খ্রিষ্টানধর্ম প্রচারে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। পরবর্তীকালে 'সেন্ট' মর্যাদায় ভূষিত হন। এই প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক উদাহরণ প্রমাণাদিসহ পাই ২০১৬ সালের এক রিপোর্টে। জেরুসালেমের 'হাদাশা হিব্রু হাসপাতালে' ৪৬ বছর বয়সি এক ব্যক্তি মৃগী রোগের সন্দেহে পরীক্ষা করাতে আসেন, তার EEG পরীক্ষা চলাকালীন তিনি হঠাৎ উচ্চকণ্ঠে প্রার্থনা করা শুরু করে দিলেন এবং সোজা বেডের থেকে উঠে সারা হাসপাতাল ঘুরতে ঘুরতে শুরু করে দিলেন। প্রত্যেক রোগীর কাছে গিয়ে বলতে থাকেন 'ঈশ্বর তাকে পাঠিয়েছেন রোগীদের জন্য' ইত্যাদি। তার মানে তার তখন অসুখ শুরু হয়েছে। ECG পরীক্ষায় ধরা পড়ল তার মস্তিষ্কের সামনের দিকে (Prefrontal Cortex) ব্রেন ওয়েভে অস্বাভাবিকতা এসেছে। এরকম হাতেগরম প্রমাণ পাওয়া কিন্তু খুব সহজ নয়। রোগের লক্ষণ না পাওয়া গেলেও কীভাবে Epilepsy রোগের ডায়াগনোসিস হয় তা আগেই বলেছি।

১৫০০ শতাব্দীতে জোয়ান অফ আর্কের ঘটনা আমরা অনেকেই কম-বেশি জানি। লেখাপড়া, গানবাজনা, শিল্প সংস্কৃতি সবেতেই অসাধারণ এই মহিলা নিজেই জানিয়েছেন মাত্র ৬ বছর বয়সেই তার চোখের সামনে ভেসে উঠত সেন্ট ক্যাথরিন, সেন্ট মার্গারেট ও অনেকে। তিনি আদেশ পেতেই (দৈববাণী) যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার। একশো বছরের সেই যুদ্ধে ফ্রান্সকে ব্রিটিশের অধীনতা থেকে মুক্ত করেন জোয়ান অফ আর্ক মাত্র ১৬ বছর বয়সে। প্রশ্ন ওঠে ওই বয়সের এক মেয়ে শিক্ষিতা, দৃষ্টিসম্পন্ন যুদ্ধের কোনো ট্রেনিং না থাকা সত্ত্বেও যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন কোন দৈবশক্তির ফলে? Neurotheology বা স্নায়ুবিদ্যা ও ধর্ম এখন এখন বহুলচর্চিত বিষয়।

এবারে আসি আমাদের ঠাকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রসঙ্গে। সর্বমানের অন্যতম ধর্মপ্রাণ অতীন্দ্রিয়বাদী (spiritual) ব্যক্তিত্ব হলেন উনি, হুগলি জেলার কামারপুকুর গ্রামে ১৮৩৬ সালে জন্ম। বাল্যকালে নাম ছিল গদাধর চট্টোপাধ্যায়। প্রথাগত লেখাপড়ায় তাঁর খুব একটা মন ছিল না। অনেক বেশি মনোযোগ ছিল মাটির প্রতিমা গড়ায় ও নানা রংবেরঙের পুতুল— বেশিরভাগই ঠাকুর। তা হলেও ১২ বছর বয়স পর্যন্ত সংস্কৃতচর্চা করেছিলেন। ছোটোবেলাতেই মায়ের কাছে, সাধুসন্তদের কাছ থেকে পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য নানান ধর্মগ্রন্থের কথা মন দিয়ে শুনতেন। এই ছোটোবেলাতেই মাঝে মাঝে তাঁর মধ্যে এক ধরনের উচ্ছ্বাস বা ভক্তি বা পরমানন্দের উদ্ভব হত যা আবার অল্পক্ষণের মধ্যে চলেও যেত। পরে এই অবস্থানের উল্লেখ নানানভাবে করা হয়েছে।

এরমধ্যে মাত্র ৮ বছর বয়সে বাবা শ্রী ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়

গত হলেন ও দাদা রামকুমার কলকাতায় চলে আসেন জীবিকার সন্ধানে। তিনি সংস্কৃত স্কুল বা টোলে পড়াতেন ও সামাজিক পূজাপার্বণে পুরোহিতের কাজ করতেন। এই সময় থেকেই দেশে বালক গদাধরকেই বাড়িতে পুজোআর্চায় মন দিতে হল। এর অনেক পরে ১৮৫৫ সালে রানি রাসমণি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরে রামকুমার প্রধান পুরোহিত হিসাবে যোগ দেন। তখনই গদাধরের দক্ষিণেশ্বরে আগমন দাদার সহযোগী হিসাবে। এক বছর পরেই দাদা গত হলে গদাধরই প্রধান পুরোহিত হন। তখন তাঁর ভক্তি ঐকান্তিকতা দেখে রানি রাসমণির জামাই মথুর বিশ্বাস গদাধরের নামকরণ করেন রামকৃষ্ণ। রামকৃষ্ণের বয়স তখন ২৩ ও সারদামণির বয়স ৫ বছর তখন তাঁদের বিবাহ হয়। কিন্তু রামকৃষ্ণ সারদামণি প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরেই একত্রে থাকতে শুরু করেন বলে জানা যায় এবং ক্রমে ক্রমে 'মা সারদা' নামে পরিচিতি লাভ করেন। তখন তিনি রামকৃষ্ণের আদর্শে সম্পূর্ণ নিয়োজিত।

অতি প্রাণচঞ্চল সরল রামকৃষ্ণ অতি সাধারণ চলতি কথায় জটিল গূঢ় সমস্যার সমাধান করতে পারতেন। পরবর্তীকালে তা নানা জনের রামকৃষ্ণের উপর লেখায় প্রকাশিত। এ-এক অতি ভিন্ন দর্শন। প্রাণ খুলে সব ধরনের লোকের সঙ্গে মিশতেও পারতেন, বন্ধুত্ব স্থাপন করতেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতি এক তীব্র আকর্ষণ ছিল। মা কালীর পুরোহিত হিসাবে তাঁকে শাক্ত বলা হয়ে থাকে। কিন্তু তিনি কোনো বিশেষ ধর্মের বাঁধনে নিজেকে বেঁধে রাখেননি। বিভিন্ন ধর্মগুরুর কাছে পাঠ নিয়েছেন ও পরবর্তীকালে সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা বলেছেন, এমনকী তাঁর প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ যখন রামকৃষ্ণের কাছে 'নির্বিকল্প সমাধি' বা মেডিটেশনের সর্বোচ্চ পর্বের জন্য গুরুদেবের সাহায্য চান, তিনি বিবেকানন্দকে নিবৃত্ত করেন ও বৈরাগ্য অবলম্বন করে স্বামীজিকে সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করতে বলেন। তদনুসারে রামকৃষ্ণ গত হলে বিবেকানন্দ ও আরো কয়েক জন স্বামীজি মিলে বরানগরে রামকৃষ্ণ আশ্রমের সূচনা করেন যা এখন দেশ স্থান কালের সীমানা ছাড়িয়ে অহর্নিশি মানব সেবায় নিয়োজিত। বিবেকানন্দের মেডিটেশন অবশ্য অব্যাহত থেকেছে। মেডিটেশনেরও স্নায়ুভিত্তি আছে অবশ্যই। কিন্তু তা অন্যস্তরের। পরে এ নিয়ে আলোচনা হতে পারে।

এখন যে কথা বলে শেষ করতে চাই রামকৃষ্ণের দর্শনকে ধর্মকে, অদ্বৈতবাদকে যদি সমাজের প্রতি স্তরে আরো আরো ছড়িয়ে দেওয়ার দিকে মন দেওয়া হত তাঁর মূর্ছা যাওয়ার ঘটনা, হ্যালুসিনেশন, কালী মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ ইত্যাদির নানা বিবরণকে দিয়ে রামকৃষ্ণের প্রাজ্ঞতাকে অলৌকিকতায় ঢেকে দেওয়া হল ও রামকৃষ্ণকে অবতাররূপে প্রতিষ্ঠা করা হল। ভাবুন তো ১৮৮৩ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন কাশীশ্বর মিত্রের বাড়িতে পিয়ানো বাজিয়ে গান শোনাতেন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব প্রচারিত হচ্ছেন তখন এইভাবে যে দেবতার সঙ্গে তাঁর একান্ত যোগাযোগ আছে— কথা হয়— সুখদুঃখের বিনিময় হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। দুই মনীষীর মধ্যে কত পার্থক্য। একজন মানুষ আর একজন দেবতা।

ব্যান্ডবাদক হবেন না অথবা আরএসএস কীভাবে বাড়ছে?

ইমানুল হক

ঘটনা-১

ঢাকা কমলাপুর স্টেশন। অপেক্ষা করছে এক যুবক। এক তরুণের জন্য। তরুণটি আসছে এই প্রথম ঢাকা শহরে চাকরির পরীক্ষা দিতে। সে কিছুই চেনে না, জানে না। তরুণ এসে দেখলেন নির্দিষ্ট জায়গায় একজন অপেক্ষমান। তাকে নিয়ে গেল। থাকার ব্যবস্থা করল। পরদিন পরীক্ষার কেন্দ্রে পৌঁছে দিল। দুপুরে তরুণ দেখল টিফিন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যুবকটি।

রাজনীতি সমাজ কিছুই আলোচনা হল না। কিন্তু তারপর বন্ধুত্ব, কৃতজ্ঞতা, ভালোবাসা এবং অন্যরকম আলোচনায় তরুণটি ধীরে ধীরে জামাতের সমর্থক হয়ে গেল।

একই ঘটনা ঘটে কলকাতায়, দিল্লি, নাগপুরে। জামাতের বদলে অপেক্ষমান যুবকটির সংগঠনের নাম রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ। ২০০৮-এ সংবাদসংস্থা জানিয়েছিল, নাগপুরে সংকল্প ভবন নামে একটি প্রশিক্ষণকেন্দ্র আছে আরএসএস-এর। আইএএস, আইপিএস, আইএফএস, আইআরএস-এ লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের প্রশিক্ষণ দেয় সাক্ষাৎকারের জন্য। প্রশিক্ষক দেন দেশের প্রাক্তন আমলাকুল।

আগে দেশের সর্বোচ্চ আমলাতন্ত্রের একটা বড়ো অংশ ছিল বামপন্থী ঘরানার। তাঁরা কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় বামপন্থী আদর্শে অনুপ্রাণিত হতেন। কিছু জনের তো রীতিমতো সক্রিয় রাজনীতি করার অভিজ্ঞতা ছিল।

এখন উলটোরথের পালা

এখন আমলা এমনকী সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের পর্যন্ত বিজেপি-র শিবিরে দেখা যাচ্ছে। বোফর্স নিয়ে ক্যাগ রিপোর্ট পেশ করে হইচই ফেলা চতুর্বেদী বিজেপি-র সাংসদ হন। অমিত শাহ ও নরেন্দ্র মোদীকে গুজরাত গণহত্যায় ক্লিনচিট দেওয়া ব্যক্তি রাজ্যপাল হয়ে যান।

সবচেয়ে যা আতঙ্কের, দেশের প্রাক্তন সেনাপ্রধান ভি কে সিং পর্যন্ত বিজেপি সরকারের মন্ত্রী। এঁর বিরুদ্ধেই অভিযোগ উঠেছিল বয়স ভাঁড়ানোর এবং আগ্রা থেকে দিল্লির উদ্দেশ্যে ট্যাঙ্ক পাঠানো। লক্ষ্য সেনা অভ্যুত্থান। যে অভ্যুত্থানের ভয় পেয়েছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। ১৯৭৫-এ জরুরি অবস্থা ঘোষণার পিছনে এটাও নাকি একটা কারণ, বলে মনে করতেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত, জয়প্রকাশ নারায়ণ সেসময় সেনা বিদ্রোহেরও ডাক দিয়েছিলেন।

জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে কংগ্রেসের প্রগতিশীল অংশ যেভাবে গণতন্ত্রের একটা অনুশীলন চালিয়েছিলেন, তাতে সেনাবাহিনীর ভূমিকা নির্বাচিত সরকারকে মেনে চলার। বিজেপি সে পথে হাঁটতে চায় বলে মনে হয় না। বর্তমান সেনাপ্রধান যেভাবে কথা বলেন, মনে হয়, তিনি রাজনৈতিক নেতা। একজন সরকারি আমলা নন।

২

এই ঘটনা যে ঘটছে, তার সূত্রপাত ১৯২৫-এ আরএসএস প্রতিষ্ঠার পর থেকেই। দুঃখের বিষয় কমিউনিস্ট পার্টির জন্মও প্রায় একই সময়ে; কিন্তু কমিউনিস্টরা আরএসএস-এর মতো সুযোগ গ্রহণে অসমর্থ হয়েছে। আরএসএস বা তার সহযোগীরা সুযোগ পেলেই সরকারে গেছে। কিন্তু সিপিএম তা করেনি। ১৯৯৬-এ জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে সরকার হলে দেশে কংগ্রেসবিরোধী ভোট বিজেপি-তে যেত না। গান্ধীহত্যার পর আরএসএস নিষিদ্ধ হলেও তাদের সহযোগী হিন্দু মহাসভার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নেহেরু মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়েছেন। ১৯৪৯-এ এর সুযোগও নিয়েছে আরএসএস। ১৯৮৯ পরবর্তী সময়ে রামমন্দিরকে কেন্দ্র করে যে সংঘ ও তার রাজনৈতিক দল বিজেপি ক্রমাগত শক্তি বৃদ্ধি করে চলল, তার মূলে তো অযোধ্যার রামমন্দির রাজনীতি। ১৯৪৯-এ রামলালা যখন রাতের অন্ধকারে ফেলে দিয়ে গেল কিছু সংঘ ষড়যন্ত্রী, জওহরলালের নির্দেশ সত্ত্বেও তা সরাননি ফৈজাবাদ জেলার তৎকালীন জেলাশাসক রাও। (অযোধ্যা ছিল ফৈজাবাদ জেলার অধীনে)। এই জেলাশাসকের স্ত্রী পরে জনসংঘের সাংসদ হন।

জেলাশাসক নিজেও পরে নির্বাচনে দাঁড়িয়ে জেতেন। জেলাশাসকের স্ত্রী শকুন্তলা দেবী সংসদে দাঁড়িয়ে হিন্দু মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার ও ডিভোর্স পাওয়ার অধিকারের তীব্র বিরোধিতা করেন।

৩

ভারত স্বাধীন হওয়ার পর একদল ব্রিটিশভক্ত ধনী ভিড়ে গেল কংগ্রেসে। অন্যদল আরএসএস এবং জনসংঘের সঙ্গে থেকে গেল। ৫৬৮ জন করদ রাজ্যের রাজা রাজ্যপাট হারালেন নেহেরুর গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে। এদের অধিকাংশই হলেন আরএসএস-এর রাজনৈতিক শাখা জনসংঘের পৃষ্ঠপোষক। স্বতন্ত্র দলও হল এদের আশ্রয়। পরে রাজন্যভাতা বিলোপে এঁরা চরম ক্ষিপ্ত হলেন। ইন্দিরার আমলে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ ও খনি জাতীয়করণে এই ধনী সম্প্রদায় চরম ক্ষতিগ্রস্ত হলেন।

ইন্দিরার স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতা এদের সুবিধা করে দিল। জয়প্রকাশ নারায়ণ সর্বাত্মক আন্দোলনের ডাক দিলেন। বামপন্থীদের মধ্যে সিপিআই তখন ইন্দিরাভক্ত। সিপিআই(এম) ইন্দিরার চরম বিরোধী।

জয়প্রকাশ নারায়ণের আন্দোলনে যোগ দেওয়া ঠিক হবে কিনা এ নিয়ে সিপিআই(এম)-এ জোর দ্বন্দ্ব। পার্টির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক, সর্বস্বত্যাগী লড়াকু নেতা পি সুন্দরাইয়ার মত ছিল: ইন্দিরা আধা-ফ্যাসিবাদী। আর জনসংঘ স্বতন্ত্র দল সম্পূর্ণ ফ্যাসিবাদী। আধা ফ্যাসিবাদী ইন্দিরাকে রুখতে সম্পূর্ণ ফ্যাসিবাদীদের হাত ধরা ভুল বার্তা দেবে। ইন্দিরা দেশে অত্যাচারী। কিন্তু তাঁর 'প্লে বিটুইন টু ক্যাম্পস' নীতি সত্ত্বেও বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা বামপন্থীদের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। ফিদেল কাস্ত্রো, ইয়াসের আরাফত, ব্রেজনেভ— সবার সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক।

বিজেপি আজ যেভাবে বিচার ব্যবস্থাকে কবজা করার চেষ্টা করছে, তা ইন্দিরারও সামর্থ্যের বাইরে ছিল। এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ে উদ্‌বিগ্ন ইন্দিরা জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে দিলেন।

এইসময়, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে, একদা বামপন্থী সিদ্ধার্থ রায়ের সরকার যেভাবে অত্যাচার নামিয়ে এনেছিল, ১১০০-র বেশি কর্মী খুন, বহু কর্মী গৃহছাড়া, কেন্দ্রীয় বাহিনী অত্যাচার চালাচ্ছে— পশ্চিমবঙ্গের সিপিএম জয়প্রকাশের আন্দোলনে যোগ দিল। তার প্রতিবাদে পি সুন্দরাইয়া 'কেন আমি সাধারণ সম্পাদক পদ এবং পলিটব্যুরো থেকে পদত্যাগ করছি' চিঠি লিখে পার্টির সাধারণ সম্পাদক পদ ও পলিটব্যুরোর সদস্যপদ ছেড়ে দিলেন।

৪

১৯৭৭-এ ইতিহাস। হিন্দু মহাসভা, জনসংঘ, স্বতন্ত্র দল, আদি কংগ্রেস তথা সিন্ডিকেটপন্থীর দল এবং সিপিআই(এম), আরএসপি, ফরওয়ার্ড ব্লক মিলে যৌথভাবে ভোট লড়ল। জনতা দলের সরকার হল। সরকারের দুই গুরুত্বপূর্ণ পদে গেলেন বাজপেয়ী এবং লালকৃষ্ণ আদবানি। একজন বিদেশমন্ত্রী। অন্যজন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী।

আমার মনে পড়ে, আমি তখন ১১ বছরের ছেলে। বাড়িতে 'সত্যযুগ' আসে। সংবাদপত্র পড়ে আমার চোখে হিরো তখন আদবানি, জর্জ ফার্নান্ডেজ এবং পাঁড় আরএসএস নেতা নানাজি দেশমুখ। আরএসএস যে এত ক্ষতিকারক, পার্টি তা বোঝায়নি। অন্তত এ রাজ্যে। পরে ১৯৭৯-এ জুলাই সংকট। আরএসএস-এর সদস্যরা সরকারে থাকবে, না থাকবে না— এই নিয়ে দ্বন্দ্ব। অনেকেই তখন মনে করেছিলেন, মোরারজি সরকার না ফেললেই ভাল হত।

৫

রাজনীতিহীন রাজনীতি বিপদ ডাকে। ১৯৮৪ থেকে ১৯৮৯ কংগ্রেসবিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে। বোফর্স নিয়ে দেশজুড়ে হইচই। গ্যাট, ডাঙ্কেল, মডেল স্কুল, জাতীয় শিক্ষানীতি নিয়ে টগবগ করে ফুটছে দেশ। সম্পূর্ণ ফ্যাসিবাদী বিজেপি এবং বামপন্থীরা হলেন ভি পি সিং সরকারের দুটি পায়া। ভি পি সিং বিজেপি-র পাল থেকে হাওয়া কেড়ে নিতে আনলেন সামাজিক ন্যায়বিচারের রাজনীতি। মণ্ডল কমিশনের রায় কার্যকর করা হল। সংরক্ষণের সুযোগ বাড়ল তপশিলি জাতি, উপজাতিদের। সংরক্ষণবিরোধী আন্দোলনে প্রধান মুখ তখন বিজেপি। তাদের সংগঠন এবিভিপি সামনে। আর দলের শীর্ষ নেতারা মণ্ডল ঠেকাতে নামলেন কমণ্ডলু নিয়ে। রাজীব গান্ধী মুসলিম মহিলা বিল এনে সর্বনাশ করেছিলেন, তারপর হিন্দু মৌলবাদীদের তুষ্ট করতে খুলে দিলেন বাবরি মসজিদের তালা। রামমন্দির ইস্যু ছাপিয়ে গেল সংরক্ষণ বিরোধিতার কথাকে। বামপন্থীদের দায় ছিল জাতিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে স্বর তীব্র করার। করলেন না। অর্থনৈতিক সংরক্ষণের তত্ত্ব এল। বিজেপি যে দলিতদের বিরোধী, তারা যে সংরক্ষণ চায় না— সেই কথাটা ধামাচাপা পড়ে থাকে— কারণ, বিজেপিবিরোধী দলগুলিও চালায় তথাকথিত উচ্চবর্ণ মানসিকতার নেতারা। তাঁরা আসলে এসসি/এসটি/ওবিসি সংরক্ষণ মন থেকে চান না।

৬

'উচ্চ'বর্ণ এবং 'নিম্ন'বর্ণ শব্দটা যতদিন থাকবে, ততদিন আরএসএস থাকবে। বিজেপি যে তীব্র দলিতবিরোধী এই কথাটা

পশ্চিমবঙ্গে সেভাবে বলা হচ্ছে না। তারা এই সংবিধান বাতিল করতে চায়। কারণ সেখানে ধর্মনিরপেক্ষ শব্দ আছে, তপশিলি জাতি-উপজাতিদের সংরক্ষণের কথা আছে।

কিন্তু সে-কথা অনেকেই বলতে চান না। তার বড়ো কারণ, অনেকেই এই জাতিভিত্তিক সংরক্ষণ চান না। শ্রেণিশোষণের সঙ্গে জাতিগত ও ধর্মীয় শোষণ ভারতীয় সমাজের এক চরম বাস্তবতা। এটা মানার মতো বুকের পাটা, খুব কম বড়ো নেতার আছে। অনেকেরই মনোভাব, বিজেপি তাদের কথা বলে দিচ্ছে।

৭

বিজেপি সংরক্ষণের বিরোধিতা করে, অস্পৃশ্যতাকে লালন ও পালন করে, তাই উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন বিজেপি ক্ষমতায় এলে দুধ, গঙ্গাজল ও গোবর দিয়ে শোধন করা হয়। তা প্রচারে আসে না। আনা হয় না।

দেশে এবং রাজ্যে সংখ্যালঘু তোষণ চলেছে— বিশ্বাস করেন না এমন লোক খুবই কম। যদিও এ-রাজ্যে সিদ্ধার্থশংকর রায়ের আমলে সরকারি কর্মচারী ছিল ৮ শতাংশ, জ্যোতি বসুর আমলে ২.৫ শতাংশ, বুদ্ধ জমানায় ২.৩ শতাংশ এবং বর্তমান জমানায় ১.৬৫ শতাংশ। দিনের পর দিন সরকারি কর্মচারীতে সংখ্যালঘু মুখ কমছে। অথচ সংখ্যালঘুদের মধ্যে শিক্ষিতের হার বাড়ছে।

ইমামভাতা, এবং মমতার ইসলামি সম্ভাষণ ও গায়ে মাঝেমধ্যে হিজাব দেওয়ার জন্য তাঁর 'মমতাজ' নামকরণ করেন বহু বামপন্থীও; কিন্তু সংখ্যালঘুরা কী পেয়েছেন, তার হিসেব বলেন না। ৫৫ লাখ কোটি টাকার ওয়াকফ সম্পত্তি মেরে গত ৭২ বছরে কারা বড়োলোক হল, এবং হচ্ছে— কে তুলবে সে কথা? এত কিছুতে সিবিআই চাওয়া হয়, ওয়াকফ কেলেঙ্কারিতে নয় কেন? ওয়াকফের টাকা পেলে তো মুসলমানরা প্রায় সবাই লাখ লাখ টাকার মালিক হয়ে যেতেন। কলকাতার বহু গুরুত্বপূর্ণ ভবন, ওয়াকফ সম্পত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাকে বাজারমূল্যে রূপান্তরিত করা হবে না কেন?

কে বলবে?

অথচ এ রাজ্যে আরএসএস বাড়ছে তিনটি তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে।

এক: মুসলমানরা খুব বেড়ে যাচ্ছে।

দুই: মুসলমানদের তোষণ চলছে।

তিন: মুসলমানদের অনুপ্রবেশ বাড়ছে।

হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে যাবে ২০৫০-এর মধ্যেই।

কারোর হিম্মত নেই, এই তথ্যগুলি মিথ্যা বলে লেখার।

১৯৫১-এ এ-রাজ্যের জনসংখ্যার ২৫ শতাংশ ছিল মুসলিম। ২ কোটি ১০ লাখের মধ্যে ৫৩ লাখ ছিল মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত। ১৯৪১-এর জনগণনা অনুযায়ী কলকাতার মুসলিম জনসংখ্যা ৪৯.১৪ শতাংশ। এখন মাত্র ১৪ শতাংশ। তোষণ হলে এই ৩৫ শতাংশ জনসংখ্যা কমে? বড়বাজার, পার্কস্ট্রিট, ধর্মতলার রাজ্যের বড়ো ব্যাবসা ছিল মুসলিম দখলে— তা গেল কেন?

এক কোটি নয়, ১০০০ (এক হাজার) জন মুসলমান অনুপ্রবেশকারীর লিখিত তালিকা দিন কেউ। এবং একজনও অনুপ্রবেশকারী সরকারি কর্মচারীর? চ্যালেঞ্জ করছি। খোলাখুলি।

৭০০ বছরের তথাকথিত 'মুসলিম' শাসন, ১৯০ বছরের 'খ্রিস্টান' শাসন, ৬০ বছরের কংগ্রেস শাসনে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হল না, বিজেপি-র চার বছরে হিন্দুরা বিপন্ন হয়ে গেল?

আসলে হিন্দু নয়, বিজেপি বিপন্ন।

তা বলতে হবে, সজোরে।

৮

বলতে খারাপ লাগলেও সত্য— অতীতে বামপন্থীরা যেভাবে মানুষের মন জয় করেছিল, আরএসএস ও তার সহযোগীরা তার কতকগুলি পদ্ধতি নিয়েছে। মানুষের ডাক্তার দেখানো দরকার, আরএসএস কর্মী আছে। পিছিয়ে রাখা এলাকায় স্কুল নেই, আরএসএস-এর সরস্বতী বিদ্যামন্দির, শিশুবিকাশ মন্দির আছে। বিশেষ করে আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে ও পাহাড়ে দ্রুত জনসংযোগ বাড়াচ্ছে সংঘ। গুজরাত, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ওড়িশায় বনবাসী পরিষদ সংঘ ও বিজেপি-র মতাদর্শ প্রচার করছে। তবে শুধু বক্তৃতা নয়, তাদের আপদে-বিপদে পাশে থেকে। প্রকৃতিপূজারী আদিবাসীদের মনুবাদের বিরোধী হওয়ার কথা। কিন্তু কোনো বিকল্প মতাদর্শ, তত্ত্ব বা পাশে থাকা মানুষের অভাবে সংঘ প্রচারকরা আদিবাসীদের ভরসা। ত্রিপুরায় দশরথ দেববর্মারা ত্রিপুরী জনজাতির মধ্যে পড়ে থেকে প্রভাব বাড়িয়েছিলেন পার্টির। কিন্তু এখন তাঁরা বা তাঁদের মতো মানুষ কোথায়? শুধু বক্তৃতায় কাজ হয় না। নেতারা এলাকায় থাকেন না। শহরে থাকেন, আসেন। এসি গাড়ি থেকে নামেন বক্তৃতা করে চলে যান। কাদের ভরসা করবে মানুষ? যাকে বিপদের সময় পাশে পাবে, তাকে। একই ঘটনা ঘটছে পশ্চিমবঙ্গেও। জঙ্গলমহলে একদিকে মাওবাদীদের সঙ্গে পরোক্ষ সমঝোতা অন্যদিকে পাশে থাকা— বিজেপি-র প্রভাব বাড়াচ্ছে। টাকা ছড়াচ্ছে সন্দেহ নেই, কিন্তু শুধু টাকায় সব হচ্ছে না। পাশে থাকাও একটা বড়ো কারণ। আজকাল আরএসএস মানে হাফ প্যান্ট পরে কুচকাওয়াজ নয়, বিভিন্ন এলাকায় সশস্ত্র প্রশিক্ষণ, দাঙ্গা বা ঝামেলা বাধিয়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে মানুষকে আত্মরক্ষার

নামে পিস্তল কিনতে পরোক্ষে বাধ্য করছে। বাদুড়িয়া-বসিরহাটে এই ঘটনা ঘটেছে। পুরুলিয়া, আসানসোল, রানিগঞ্জ, ভদ্রেশ্বর, উলুবেড়িয়া, খড়্গপুর এলাকায় সংঘ এখন রীতিমতো শক্তিশালী; সীমান্ত এলাকায় তো ছিলই।

৮

এর বিপরীতে বাড়ছে জামাত। টুপি দাড়ি বোরখা বাড়ছে। সংঘ শেখাচ্ছে উত্তরভারতীয় সংস্কৃতি। বহু এলাকায় এখন নিরামিষ খাদ্য। শপিং মলে আমিষ মেলে না। কলকাতার মৌলালির পাশের এলাকার হোটেলেও আমিষ মিলছে না। অন্যদিকে হজে যাওয়া বাড়ছে। বাড়ছে ধর্মীয় জলসা। গণেশ পূজা, শনি মন্দিরের মতো মসজিদও বাড়ছে। ওয়াইসির 'মিম' মহারাষ্ট্র, বিহার, উত্তরপ্রদেশ নির্বাচনে আলাদা প্রার্থী দিয়ে সংখ্যালঘু ভোট কেটেছে। পশ্চিমবঙ্গেও আগামীতে তা ঘটতে চলেছে। এতে বিজেপি-র পোয়াবারো হবে। এর মধ্যেই এক পিরবাবার সন্তানকে বিজেপি অর্থ জুগিয়েছে সংবাদপত্র প্রকাশে। দলিতদের মধ্যেও বিক্ষোভ যাতে বেশি দূর না যায় তার জন্য সংঘ এ-রাজ্যে 'সংবিধান বাঁচাও' আন্দোলনের নেতৃত্বকে সাহায্য করেছে। যে কারণে এ রাজ্যে দলিতরাও সেভাবে বিজেপিবিরোধী নয়। মুসলিমদের একাংশের মধ্যেও মনোভাব— তৃণমূল ঠেকাতে প্রয়োজনে বিজেপি-র পাশে দাঁড়াও। বাম সমর্থকদের একটা বড়ো অংশ এখন বিজেপি-র স্বেচ্ছা সমর্থক। এই সমর্থনের বীজ বহুদিন আগে পোঁতা। ১৯৯৯-এ কার্গিল যুদ্ধের সময় রাজ্য সিপিএম-এর চাঁদা তোলা দিয়ে এর শুরু। কালে কালে বেড়েছে। এখন প্রকাশ্যে এমন অনেক কথা বলা হয়, যা অতীতে কল্পনাও করা যেত না। বিজেপি তৃণমূলের চেয়ে ভালো যাঁরা মনে করেন, তাঁদের ত্রিপুরার দিকে তাকানো দরকার। পশ্চিমবঙ্গে ৩৪ শতাংশ আসনে নির্বাচন হয়নি। ত্রিপুরায় ৯৬ শতাংশ আসন দখল করেছে বিজেপি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার দিন রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের সঙ্গে কী আচরণ করেছিল বিজেপি— মনে রাখবেন। তৃণমূল যদি খারাপ হয়, তবে বিজেপি ভয়ংকরতম। শুধু তৃণমূলের দোষ ধরা, তৃণমূলের দুর্নীতির কথা বলা মানে বিজেপি-র প্রচারকে পরিণত হওয়া।

নীচের তলায় তৃণমূলের অত্যাচার থেকে বাঁচতে বামপন্থীরা বিজেপি-র সঙ্গে জোট বেঁধেছে। হ্যাঁ। বাস্তব, বিজেপি এজেন্ট দিতে পারেনি। কিন্তু ভোট পেয়েছে। এর ৯০ শতাংশ ভোট বামপন্থীদের ভোট।

তৃণমূলের ভোটও যাচ্ছে। কিন্তু এখনও কম। তৃণমূলের নেতাদের সঙ্গে বিজেপি-র নেতাদের একটা অলিখিত সমঝোতা— বিজেপি-কে কম মারো। সিপিএম বা বামফ্রন্টীরা বেশি মার খাচ্ছেন। তার ফলে বামেদের বিজেপি-তে একটু বেশি ঝোঁকা।

১০

তৃণমূল এবং সিপিএম— দু-পক্ষকেই এ বাস্তবতা বুঝতে হবে— সিপিএম থাকলে তৃণমূল থাকবে। তৃণমূল থাকলে সিপিএম। সোমেন মিত্র ও লক্ষ্মী দে-র মধ্যে যে পরোক্ষ সমঝোতা ছিল। বিদ্যাসাগর ও শিয়ালদহের বিধানসভা নির্বাচনের সেই ফর্মুলা প্রয়োজনে নিতে হবে। ওপরে কুস্তি, তলায় দোস্তি। বিজেপি-র সঙ্গে দোস্তির চেয়ে তৃণমূলের সঙ্গে অল্প গোপন দোস্তি ভালো।

গাল দেবেন। দিন। কিন্তু লুপ্তপ্রায় হওয়ার চেয়ে বেঁচে থাকা জরুরি।

আবার বলছি— বিজেপি এলে সিপিএম তৃণমূল কেউ থাকবে না। টেট-সারদা-নারদ দেখুন, কিন্তু রাফায়েল, ব্যাপম কেলেঙ্কারিও যেন প্রচারে থাকে।

নারদের ৮০ লাখ টাকা এবং সারদার ১ হাজার কোটির চেয়ে বিজেপি-র ১ লাখ ৩৬ হাজার কোটি টাকার কেলেঙ্কারি অনেক বেশি ক্ষতিকারক।

বিজেপি ফ্যাসিবাদী। সম্পূর্ণ ফ্যাসিবাদী।

ফ্যাসিবাদ ঠেকাতে প্রয়োজনে বৃহত্তর জোট গঠন জরুরি।

লড়াই থাকবে। থাকবে সমালোচনাও। আপাতত ফ্যাসিবাদ ঠেকাও। না করলে, ইতিহাস ক্ষমা করবে না।

১১

আরএসএস-এর হাতে আছে দেশের নামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আর্থিক সংস্থা, হাসপাতাল। যেমন বাংলাদেশের জামাত বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক, হাসপাতাল চালায়। বহুজনের জীবনযাপন, অর্থনীতি ওদের ওপর নির্ভরশীল। কেরালার সিপিএম পার্টি কেবল রোজগারের ব্যবস্থা করতে পেরেছে আইটি সংস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে চাঁদা ও লেভি ছাড়া আয় নেই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মারফত যেভাবে মতাদর্শ ছড়ানো যায়, আর কোথাও কি সম্ভব?

১২

বিজেপি-আরএসএস-কে রোখা কি সম্ভব? হ্যাঁ, সম্ভব। খুবই সম্ভব। কেরালা পারছে কী করে? উত্তরপ্রদেশ, বিহার, এমনকী গুজরাত রাজস্থান মধ্যপ্রদেশ পারছে কী করে?

বিজেপি-র হিন্দুত্ব আর হিন্দুধর্ম এক নয়। ভিন্ন। বিজেপি হিন্দুধর্মের কলঙ্ক। ওরা মনুবাদী। বিভাজন, বৈষম্য, অস্পৃশ্যতা,

জাতিভেদ টিকিয়ে রাখতে চায়— তা বলতে হবে। 'রামায়ণ' অনুশীলন করতে হবে। রাম দলিতের শিক্ষার বিরোধী— মানুষকে জানাতে হবে। শম্বুক হত্যার কথা বলতে হবে। মুসলিম প্রশ্নে মিথ্যা প্রচারের জবাব দিতে হবে। তার জন্য ধর্মনিরপেক্ষ মন ও মানসিকতা অর্জন করতে হবে। সূক্ষ্ম, সুপ্ত সাম্প্রদায়িক হয়ে তা করা অসম্ভব।

আর এই সবের চেয়ে অনেক বেশি করে বলতে হবে বর্তমান অর্থনীতি ও রাজনীতির কথা। ওরা শুধু অতীতের কথা বলে।

বর্তমানটা কী?

বেকারি, দারিদ্র্য, কর্মসংস্থানহীনতা, চরম দুর্নীতি, মুদ্রাস্ফীতি, মূল্যবৃদ্ধি, টাকার দাম, পেট্রোল, ডিজেলের দামের কথা বার বার বলতে হবে।

আর অতীত?

বিজেপি নেতাদের অতীতের প্রতিশ্রুতিময় বক্তৃতা ও তাঁদের নির্বাচনী ইস্তেহারের কথা তুললেই দেখবেন— আরএসএস এবং বিজেপি হাওয়া।

পুনশ্চ: সিপিএম-তৃণমূল দোস্তি প্রকাশ্য হলে বিজেপি-র পোয়াবারো হবে। সংসদে বামপন্থীদের দরকার। কিন্তু এ-রাজ্য থেকে সাংসদ পাওয়া বড়ো কঠিন। মহ. সেলিম লড়ছেন। কিন্তু সমর্থকরা? এর পাশাপাশি চাই আমডাঙার মতো প্রতিরোধ। এবং তৃণমূলের বুদ্ধিমান হওয়া। সিপিএম-কে কম অত্যাচার করা। কাজ করতে সুযোগ দেওয়া।

আবারও বলছি— তৃণমূল থাকলে সিপিএম থাকবে। সিপিএম ভালো থাকলে তৃণমূল। বিজেপি এলে দুজনেই ঘোর বিপদে। দোহাই, বিজেপি-র ব্যান্ডবাদক হবেন না।

শিল্পী : শুভাশিস সাহা

LIFE BEGINS AT 60!

JAGRITI DHAM

KOLKATA'S MOST COMPREHENSIVE HOME FOR SENIOR LIVING

SAFETY ☂ ACTIVITY ☂ COMMUNITY ☂ SPIRITUALITY

Yoga & meditation

Wellness spa

Indoor games

Privilege access to IBIZA Club

24 x 7 Medical care

Mandir

ROOMS

- Furnished and fully-serviced AC rooms
- TV, balcony, attached toilet and pantry
- Housekeeping and maintenance on call
- Wi-fi, Intercom

SENIOR-FRIENDLY ARCHITECTURE

- Wheel chair and walker-enabled spaces and ramps
- Spacious lifts to accommodate stretchers
- Specially designed bathrooms with wheel chair-accessible showers

SECURITY

- 24 hours manned gate with intercom
- Electronic surveillance, CCTV
- Power back-up

HEALTHCARE

- 24 x 7 ambulance, attendant, emergency healthcare
- Visiting doctors, specialists-on-call
- Emergency button in every room and frequently occupied areas
- Tie-ups with the city's best nursing homes and hospitals

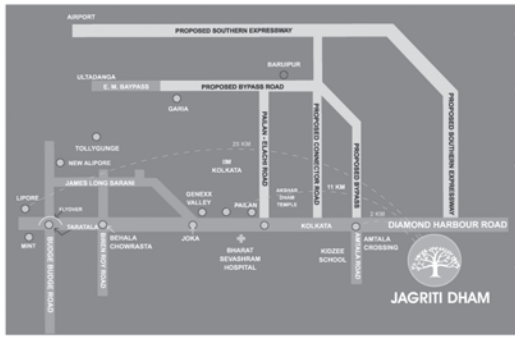

- Inside Merlin Greens complex
- Adjacent to Ibiza on Diamond Harbour Road
- Near Bharat Sevasram Hospital and Swaminarayan Dham Temple
- 5 kms from Nature Cure and Yoga Research Institute

+91 88 200 22022 | Merlin Greens, IBIZA Club, Diamond Harbour Road, Pin 743 503
contact@jagritidham.com | www.jagritidham.com

ঠাকুমার ঝুলি

প্রণব বিশ্বাস

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন গোটা জীবনে এমন কোনো দিনের কথা তিনি মনে করতে পারেন না যেদিন তিনি সূর্যোদয় দেখেননি। আর আমার এমনি দুর্ভাগ্য যে হাতের কর গুণেই বলে দিতে পারি কদিন সূর্যের উদয় দেখেছি। শৈশবে মায়ের তাড়না ছিল সেতো এখন দূর অতীতের কথা। তারপর সযত্নে যত অভ্যাস করেছি রাতজাগানি হতে ততই ভোর দূরে সরে গিয়েছে জীবন থেকে। এখন আফশোস হয় কিন্তু অভ্যাস তো আর পাল্টানোর নয়।

বাসা পাল্টে নতুন বাসায় এসেছি। প্রথম রাত্তিরটা স্বভাবতই একটু অস্বস্তির, চোখের পাতা আর জোড়ে না, 'ভয় আছে শেষ রাতে ঘুম আসে আঁখিপাতে'। সত্যি রাত যত ফুরিয়ে আসে চোখের পাতা ততই জড়িয়ে আসে, ঘুম ক্রমশ ঘন হয়। যখন ঘুমের কোনো ঠিকানা খুঁজে পাচ্ছিলাম না তখন মনে মনে একটা আশার জাল বুনছিলাম, নতুন বাসায় প্রথম রাত্তিরের শেষ আর নতুন দিনের উন্মেষটা দেখব প্রাণভরে। কিন্তু ভাগ্য বলে যদি কিছু থাকে তবে তার অবস্থান ইচ্ছের বিপ্রতীপে। কখন রাত শেষ হয়েছে আর ভোর কখন হল সবই আমার অজানিত রয়ে গেল। কিন্তু ভোরের রেশ থাকতে থাকতেই আচমকা কাঁচের জানলায় দুটি টোকা পরপর। হুড়মুড়িয়ে উঠে জোর তদন্ত চালিয়েও টোকা রহস্যের সমাধান হল না। অগত্যা আবার বিছানার আশ্রয়ে। একটু পরেই সুকণ্ঠের উচ্চারণে দুটি মাত্র শব্দ 'ঠাকুরমা আসছি'। সকাল যখন গড়িয়ে বেলার দিকে তখন অন্য আরেক কণ্ঠে একই উচ্চারণ 'ঠাকুরমা আসছি'।

ঠাকুরমা শব্দটা বড়ো আহ্লাদের। আমি নিজে ঠাকুরদা-ঠাকুরমা কাউকেই দেখিনি। তাঁদের অস্পষ্ট আভাস পর্যন্ত আমার স্মৃতিতে নেই। কথায় কথায় ঠাকুরদা ঠাকুরমার কথা যেটুকু শুনেছি তাতে আবছা কোনো মূর্তির কল্পনাও অসম্ভব। খণ্ডচিত্রে অস্পষ্ট কিছু রেখা মাত্র। দাদু-দিদিমার স্নেহ ও দুর্লভ রয়ে গেল এ জীবনে। কিন্তু অতি শৈশবে শীতের এক সন্ধ্যায় শিলং থেকে দাদুর মৃত্যুসংবাদ এসেছিল টেলিগ্রামে। অন্যকিছু নয় মায়ের আকুল কান্নার একটা স্মৃতি কী করে যেন মনের গভীর সংগোপনে রয়ে গিয়েছিল, ইদানীং প্রায় তা মনে পড়ে। আর আমার দিদিমার মৃত্যু তো হয়েছিল মায়েরই শৈশবে। সুতরাং সে স্নেহেরও কোনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমার নেই। যেটুকু যা সঞ্চয় তা চোখে দেখে আর বই পড়ে। আমার বন্ধুদের অনেকেরই ঠাকুরদা-ঠাকুরমা, দাদু-দিদা ছিলেন, তাঁদের অনেকের অকৃপণ স্নেহে সিক্ত হয়েছে শৈশব-বাল্য। পাড়াতুতো দাদু-দিদা, ঠাকুরদা ঠাকুরমারাও তখন খুবই জীবন্ত ছিলেন। একটু ভুল হল হয়তো ঠাকুরদা ততটা নয় যতটা ঠাকুরমা। হিন্দু বাঙালিদের পারিবারিক সম্পর্কে বাবার বাবাকে ঠাকুরদা আর মাকে ঠাকুরমা আর মায়ের বাবা-মাকে ডাকা হত দাদু-দিদা বা দিদিমা বলে। বালক বয়েসের প্রিয় বইয়ের নামও তো ঠাকুরমার ঝুলি। বুদ্ধভুতুম, ডালিমকুমার, সাতভাই চম্পা, নীলকম আর লালকমলের গল্প শুনতে শুনতে আমার বড়ো হওয়া। 'ঝুলির ভেতর চাঁদের নাচন্ ভরে' এনেছে। ঠাকুরমা'র কোলটি জুড়ে কেরে বসেছে'?

যুগের হাওয়ায় নাকি কোনো এক মন্ত্রবলে আমাদের সাবেক সম্পর্কগুলো সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। ইশকুলের দিদিমণিরা সবাই এখন আন্টি, জ্যেঠতুতো, খুড়তুতো, মামাতো, পিসতুতো, মাসতুতো ভাইবোনেরা নিতান্তই 'কাজিন', আর উর্দ্ধতন পুরুষে সবাই দাদু-দিদা। ঠাকুরদা-ঠাকুরমারা অন্তর্হিত অনেকদিন। ভাষাতাত্ত্বিক বলবেন নানা কারণে শব্দের মৃত্যু হয়। প্রযুক্তির কারণে, বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপনায়, শাসনযন্ত্রের রদবদলে, পারিবারিক অভ্যেসের বদলেও শব্দের মৃত্যু আর নতুন শব্দের জন্ম আর প্রচলন হয়। Grand-father আর Grand-son-এর সহজ-চিন্তাহীন বঙ্গীকরণেই কি এখন সবাই দাদু আর নাতি কোথাও কোনো ভেদরেখা নেই। পৌত্র বা দৌহিত্র, বাবার বাবা না মায়ের বাবা জানার প্রয়োজন বুঝি ফুরোল।

যে-কথা বলছিলাম সেই সাত সকালের টোকার অস্বস্তি আর 'ঠাকুরমা আসছি'-র মাধুর্যে ভরে রইল আমার পরবর্তী সকালগুলো। অনেকদিনের চেষ্টায় জানতে পারলাম জানলায় টোকা দিয়ে যায় মাঝারি চেহারার একটা শাদা পাখি। তাকে খেতে দিয়ে দেখেছি সে নির্লোভ, ছোলা, ডাল, চাল, মুড়ি কোনো কিছুর দিকেই সে ফিরে তাকায় না। অথচ রোজ সকালে সে কাঁচের

জানলায় ঠোঁট ঠুকে শব্দ করে যায়। কোন বার্তা তার তা গত তিন-চার বছরেও বোঝা হয়নি। পাখির হেয়ালি বোঝা সত্যি দুঃসাধ্য। আলিপুর পার্ক রোডের এক বাড়িতে একসময় বেশ ঘন ঘনই যেতে হত। বিকেল যখন গড়িয়ে সন্ধ্যার দিকে যাচ্ছে, অন্ধকার নামেনি এমন সময় বড়ো গাছের উঁচুডাল থেকে কোনো এক নাম না জানা পাখি মিষ্টি সুরে ডাকত। গাছটা পেরিয়ে যাচ্ছি এমন সময় শোনা যেত সে ডাক, ফিরে যেই গাছের নীচে এসে দাঁড়িয়ে ইতি উতি তাকে খুঁজতে থাকি তখনি সে নিঃশব্দ আবার যেই চলতে শুরু করেছি অমনি পেছন থেকে মিঠে সুরের ডাক। কিন্তু নিরন্তর চেষ্টাতেও তার চেহারা কোনোদিন দেখতে পাইনি, অথচ গাছের সীমানা পেরোলেই শুনেছি সেই ডাক। একে হেয়ালি ছাড়া আর কিই বা বলা যায়। কিন্তু যারা রোজ সকালে ঠাকুরমাকে জানান দিয়ে ঘর ছাড়ে আবার কাজের শেষে ঘরে ফিরে ঠাকুরমাকেই জানান দেয়, তাদের চাক্ষুষ একবার দেখার সাধ জাগে মনে। আর দেখতে ইচ্ছে যায় সেই ঠাকুরমাকেও; মনে মনে কল্পনায় দেখতে পাই দরজায় দাঁড়িয়ে অভয়মুদ্রায় তিনি দুর্গা দুর্গা বলছেন। দেখা আর হয় না কিছুই। একদিন দেখলুম সেই সুরেলা উচ্চারণের পরে পরেই স্কুলপোষাকে একটি মেয়ে দ্রুত সাইকেলে চলে যাচ্ছে। নতুন পাড়া, অন্তরঙ্গ পরিচয় তেমন কারো সঙ্গে নেই যে জিজ্ঞাসা করে প্রশ্নের উত্তর খুঁজব। এরই মধ্যে এল এক পনেরোই আগস্ট। সন্ধেটা জমজমাট আড্ডায়-গানে বেশ ভালোই কেটেছিল। রাত দশটা নাগাদ একটি অ্যাম্বুলেন্স এসে দাঁড়াল জানালার সামনে কেউ কি অসুস্থ হয়ে পড়লেন গুরুতর, উদ্বিগ্ন মনে ভাবতে থাকি। অল্পদিনের ব্যবধানে এ-পাড়ায় অন্তত তিনজনের প্রয়াণ ঘটেছে। না কেউ হাসপাতালমুখী হবে না, অসুস্থ কেউ একজন হাসপাতাল থিকে ফিরে এলেন বোধ হয় বাড়িতে, অ্যাম্বুলেন্স ফিরে গেল। একটু পরেই সেখানে এসে দাঁড়াল শববাহী এক যান। পায়ে পায়ে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াই, প্রতিবেশীরা অনেকেই ইতিমধ্যে এসে দাঁড়িয়েছেন রাস্তায়। একটু আগে যাঁকে নিয়ে আসা হয়েছিল তাঁকেই এবার শ্মশানযাত্রা করতে হচ্ছে। সেই রাত্তিরে আধো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে জানলাম যারা ঠাকুরমাকে বলে ইশকুলে বা কাজে যায় তাদেরই মা আজ শেষবারের মতো নিজের ঘর সংসার, প্রাণাধিক দুই কন্যা আর সবকিছু ছেড়ে চলে যাচ্ছেন নিতান্তই অকালে। অল্প বয়সে স্বামীকে হারিয়ে মেয়েদের বড়ো করেছেন। বাবার জায়গায় আঠেরো পুরতে বড়ো মেয়ের চাকরি জুটেছে। এবার মাও চললেন। বাড়ির বড়ো হিসেবে ওরা ঠাকুরমাকেই আসা যাওয়ার খবর জনিয়ে যায়— কানে তখনো ভাসতে থাকে 'ঠাকুরমা আসছি'। একটু পরে অত্যন্ত সপ্রতিভ ভঙ্গীতে দুইবোন উঠে বসে শববাহী গাড়িতে। সেই তাদের প্রথম দেখি মৃত্যুর বিষণ্ণতার মধ্যে। ইচ্ছে হয়েছিল মাথায় হাত রেখে সান্ত্বনাবাক্য উচ্চারণ করি। যে শোকের কোনো সান্ত্বনা হয় না সেখানে শব্দের উচ্চারণ নিতান্তই বাড়াবাড়ি তাই নীরবেই দাঁড়িয়ে থাকি এক কোণ ঘেঁষে। সেই রাতের আধো অন্ধকারে মৃত্যুর প্রেক্ষাপটে দুইবোনকে আমার প্রথম দেখা। এখন রাস্তায়, কখনো বাড়িতে নানা কাজের ব্যস্ততায় ওদের দেখতে পাই। শুনতে পাই 'ঠাকুরমা আসছি' রোজ, প্রতিদিন একবার, দুবার কখনো অনেকবার। কিন্তু ঠাকুরমাকে দেখা হয়নি আজও। তামাদি হয়ে যাওয়া এক ডাককে আশ্রয় করে দুটি অল্পবয়েসি মেয়ে অত্যন্ত সম্ভ্রমের জীবন যাপন করছে দেখলে মন পরিপূর্ণ আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠে।

অন্য এক ঠাকুরমাকে দেখেছি অনেকদিন ধরে। নিম্নবিত্ত বললেও হয়তো বেশি বলা হয়। আধময়লা শাদা কাপড়ে ঢাকা শরীরের সম্বল বলতে অস্থি আর চামড়া। ছোটোখাটো চেহারা, কিন্তু ব্যক্তিত্বময়ী-অন্যধারার ব্যক্তিত্ব। অক্ষরজ্ঞান নেই কিন্তু সর্ব অর্থেই শিক্ষিত— মনে মননে আর আচরণে। বহু ওঠা পড়ায় ধ্বস্ত জীবনের শেষ দেড় দশক কেটেছে তিন পৌত্রীকে মানুষ করার কাজে। নিজের লেখাপড়া হয়নি, ছেলেকে ও পারেননি লেখাপড়ায় মনের মতো করতে। বাড়িতেই প্লাস্টিকের প্যাকেট বানিয়ে রোজগারের ব্যবস্থা করেছেন ছেলের জন্য। ছেলের তিন মেয়েকে অন্তত পক্ষে বি.এ. পর্যন্ত পড়ানো তার পণ। নিজের ইশকুলে পড়া হয়নি বলে পাড়ার ছোটো ইশকুলকে সাফসুতরো রাখা থেকে প্রয়োজন অপ্রয়োজনের সব কাজে তিনি একপায়ে খাঁড়া। দুই জমজ পৌত্রী আর অল্প পরে আসা অন্যজনকে ইশকুলে ভর্তি করা, ইশকুলে দিয়ে আসা-নিয়ে আসা, টিচারদের সঙ্গে কথা বলে লেখাপড়ার খবরাখবর নেওয়া আর পড়ার খরচ জোগানো সব দায়িত্ব তাঁর। প্রাথমিকের পর মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক— দূরের ইশকুল। বিরামহীন ঠাকুরমা সারাক্ষণ লেগে নাত্‌নিদের সঙ্গে। না পড়ে উপায় নেই; ঠাকুরমার কড়া নজরে সারাক্ষণ বন্দি তিন বোন। ঠিকমতো পাশ দিলে, ইশকুলের দিদিমণিদের মুখে সামান্য প্রশংসা বাক্য শুনতে পেলে আবার প্রশ্রয় সীমা ছাড়ায়। এরমধ্যে উচ্চমাধ্যমিকে ভর্তি হতে না হতে একজন বিয়ে করে বসল। ঠাকুরমার অনমনীয় জেদ বিয়ে কর আর যাই কর পড়াটা শেষ করতেই হবে। নাতনিকে নিয়ে ঠাকুরমা আবার ইশকুলে। দক্ষিণ শহরতলীর নামী ইশকুলের কড়া বড়দি বিয়ে হয়ে যাওয়া মেয়েকে ইশকুলে রাখতে কোনোমতেই রাজি নন। অনেক অনুনয়ে, চোখের জলেও যখন বড়দির মন গলল না তখন তাঁকে আইনের পথ খঁজুতে হল। একে তাকে জিজ্ঞাসা করে পথ খুঁজে খুঁজে তিনি পৌঁছে গেলেন উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে। আইন জানা হল কিন্তু কর্তৃপক্ষ এও জানিয়ে দিলেন আইনগত বাধা নেই কোনো কিন্তু ইশকুলে রাখা-না-রাখার ব্যাপারটা নিতান্তই ইশকুলের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষ। আবার বড়দির কাছে যাওয়া আবার অনুরোধ, আবার প্রত্যাখ্যাত হওয়া, অনমনীয় বড়দির রূঢ়ভাষণ

আর নাতনির নতুন করে পড়তে না চাওয়ার জেদ কোনোকিছুই তাঁকে দমাতে পারল না। এক সকাল থেকে ঠাকুরমা নিখোঁজ, বেলা বয়ে যায় ফেরার নাম নেই। খোঁজাখুঁজি শুরু, কিন্তু হদিশ মেলে না। বেলা সাড়ে বারোটা-একটার সময় কঙ্কালসার মানুষটি ঘেমে নেয়ে কিন্তু প্রসন্ন মুখে বাড়ি ফিরে এলেন। কারো কাছে শুনেছিলেন এক বিখ্যাত গায়কের কথা। সেই সকালে সাততাড়াতাড়ি উঠে সটান চলে গিয়েছিলেন তাঁর কাছে। বাড়ির পথ খুঁজতে হয়রানি কিছু কম হয়নি। তারপর সেই গায়ককে তাঁর একমাত্র ইচ্ছের কথা বলে তাঁকে রাজি করিয়েছিলেন স্কুলে একটি ফোন করতে। সেই ফোনে কাজ হয়েছিল। গায়কের বাড়ি থেকে তিনি পৌঁছেছিলেন সেই ইশকুলে। রাগী বড়দিদি সেদিন নাকি হেসে বলেছিলেন সত্যি এমন ঠাকুরমা থাকলে কত মেয়েই না উতরে যেত। সেই নাতনি উচ্চমাধ্যমিকে ফল খারাপ করেনি, বি.এ.-ও পাশ করেছিল এমনকি জুটিয়ে নিয়েছিল একটি চাকরিও। স্বপ্ন ছিল একটি স্কুটি কেনার। ছোটো নাতনি যখন বি.এ.-র দোর গোড়ায় ঠাকুরমা তখন অসুস্থ-অশক্ত, দু-দুবার বাঙুর হাসপাতাল ঘুরে এসেছেন, কিন্তু নাতনির পড়া নিয়ে নজরদারি শেষ নেই। টেস্টে পাশ নম্বর না পাওয়া বা পার্সেন্টিজ সংক্রান্ত কোনো অসুবিধে বা মাইনে বাকি পড়া কোনো একটা কারণে কলেজ কর্তৃপক্ষ মেয়েটিকে ফরমপূরণ করতে দেননি। চোখে জল নিয়ে ফিরে এল হবু পরীক্ষার্থিনী। পরের দিনই ঠাকুরমা অশক্ত শরীরে বাস ধরে কোনোমতে হাজির হলেন ওই কলেজে। সারাদিন বসে থেকে বিকেলে দেখা পেলেন অধ্যক্ষার। সব শুনে তিনি বৃদ্ধার আকুল আর্জি মঞ্জুর না করে থাকতে পারেননি, জল-মিষ্টি খাইয়ে তাঁকে লোক দিয়ে বাসে পর্যন্ত তুলে দিয়েছিলেন। বাস রাস্তা থেকে বাড়ির পথ পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরে নাতনিকে খরবরটুকু দিয়ে সেই যে তিনি শয্যা নিলেন সেই হল তাঁর শেষ শয্যা। ছোটো পৌত্রী ঠাকুরমার প্রাণহীন শরীর ছুঁয়ে কথা দিয়েছিল পরীক্ষা সে দেবে আর পাশও করবে। করেওছিল। এক ঠাকুরমার আশ্রয়ে প্রশয়ে আর নিবীড় পর্যবেক্ষণে বেড়ে ওঠা তিন মেয়ে শৈশবের সব মালিন্য ঝেড়ে ফেলে এখন শহরের তিনদিকে সংসার করছে আর কাজও করছে জীবিকার জন্যে। ঠাকুরমা সুখের মুখ দেখেননি কখনো কিন্তু প্রাণপ্রিয়া তিনি পৌত্রীকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন, প্রতিবেশী ছেলে মেয়েদেরও নিরন্তর উৎসাহ জুগিয়েছেন লেখাপড়ায়। শিক্ষা প্রসারের ইতিহাসের বিস্তারে এই নামগোত্রহীন যোদ্ধার কোথাও কোনো উল্লেখ থাকবে না জানি আর এও জানি এমন মানুষেরা আছেন বলেই সমাজ-সংসার-সংস্কৃতি আর প্রবহমান জীবন এখনো একেবারে ভেঙে গুড়িয়ে যায়নি।

সলিল চৌধুরীর গানে, বিষ্ণু দে'র কবিতায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উচ্চারণে ঠাকুরমার ঝুলি কত না রূপে-রূপান্তরে বর্ণময় হয়ে আছে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় বিপ্লবী বন্দিনী ইলা মিত্র অনায়াসে হয়ে ওঠেন পারুলবোন। শুয়ে শুয়ে দিন গুনছে যে পারুল বোন সাতটি ভাই তাকে পাহারা দেয়। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যখন বলেন—

নীলকমল আর লাল কমল/খুঁজছে তাদের সত্যিকারের মা/লুকিয়ে যিনি মানুষ খাবেন না/সত্যিকারের মা।' তখন বিষ্ণু দে-কে বলতে শুনি

> এ দিকে ওড়ে লালকমলের নীলকমরের হাতে / ভায়ের মিলে প্রাণের লাল নিশান। / তাদের কথা হাওয়ায়, কৃষাণ কাস্তে বানায় ইস্পাতে / কামারশালে মজুর ধরে গান।।

আর অন্যত্র তিনি বলেন,—

> চম্পা! তোমার মায়ার অন্ত নেই, / কত না পারুল-রাঙানো রাজকুমার / কত সমুদ্র কত নদী হয় পার! / বিরাট বাংলাদেশের কত না ছেলে /অবহেলে সয় সকল যন্ত্রণাই— / চম্পা কখন জাগবে নয়ন মেলে।

এবারে বলি অন্য এক ঠাকুমার ঝুলির কথা। নতুন এক রূপকথা।

> এ-দুয়োরে যায় : দূর দূর!
> ও-দুয়োরে যায় : ছেই ছেই!
>
> সুয়োরানী লো সুয়োরানী তোর
> রাজ্যে দিল হানা
> পাথরচাপা কপাল যার নেই
> ঘুটে কুড়ুনির ছানা
>
> ঘেন্নায় মরি, ছি!
>
> মন্ত্রী বলল, দেখছি
> কোটাল বলল, দেখছি
>
> ঢোল ভগরে পড়ে কাঠি
> রক্তে হয় রাঙা মাটি
>
> কাড়ে না কেউ রা
> ভালো মানুষের ছা
>
> সাতটি চাঁপা সাতটি গাছে
> পারুল বোন রইল কাছে
>
> দণ্ডকে যায় ধর্মরাজার
> কলের ভুলি
> এই গল্পে ভর্তি করে
> ঠাকুরমার ঝুলি।।

নব্যযুগের এই 'ঠাকুরমার ঝুলি'তে জলঘোলা হয়েছিল বিস্তর। সে সব কতা এখন নিরুক্ত থাক। যাঁর স্নেহের ঋণ

কোনদিনই শোধ হবার নয় সেই প্রয়াত অশোক মিত্রর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে এবারে আমি শঙ্খ ঘোষের শরণাপন্ন হব।

> এক বছরের জন্য তখন শান্তিনিকেতনে আছি, ১৯৭৮ সাল। আমার যেখানে বসবাস তার ঠিক সামনেই থাকেন প্রবোধচন্দ্র সেন, সেই প্রবোধ চন্দ্র যিনি 'পদাতিক' বইয়ের ছন্দ ব্যবহার দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন আর প্রকাশের অল্প পরেই 'পরিচয়' পত্রিকায় দীর্ঘ ব্যাখ্যান করেছিলেন সে-ছন্দের বিশিষ্টতার। একদিন সকালবেলা ডেকে বললেন সেই প্রবোধচন্দ্র : 'এই কবিতাটা পড়েছ? পড়ো, পড়ে দেখো—' বলে এগিয়ে দিলেন একটি পত্রিকা। আমি পড়ে যাই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এই নতুন কবিতা:
>
> এ-দুয়োরে যায় : দূর দূর!
> ও-দুয়োরে যায় : ছেই ছেই!...

কবিতার নাম ঠাকুরমার ঝুলি। পড়া শেষ হলে তিনি বলেন: 'সুভাষকে বলো আমার কথা: তার সোনার দোয়াত কলম হোক। এসব কথা এমন করে সুভাষ ছাড়া আর কে বলবে। ইতিহাসে তো কোথাও এদের দুঃখের কথা লেখা থাকবে না।'

প্রবোধচন্দ্রের এইরকম মনে হচ্ছিল। কিন্তু কলকাতায় তাঁর পুরোনো পাঠকেরা, তাঁর 'পদাতিক'-কালীন মুগ্ধ পাঠকেরা, ছি ছি ধ্বনিতে ভরে উঠেছেন তখন। কেননা, এ তো সরাসরি বামফ্রন্টকে আক্রমণ করে লেখা কবিতা। এ তো বিশুদ্ধ ষড়যন্ত্র। রাগী গলায় প্রশ্ন শুনছি কাছে-দূরে : 'এসব কী লিখছে সুভাষ মুখুজ্জে? ভেবেছে কী লোকটা?'

কবিতাটি পড়ে আজ এর পিছনকার দুঃসহ ছবিটা সবাই ধরতে পারবেন কি না জানি না। দেশ ভাগ হবার পর ছিন্নমূলের স্রোতে যখন ভাসছিল এই বাংলা, পথে পথে পা রাখবার আর জায়গা নেই যখন, ট্রামে-বাসে যখন শুনতে হচ্ছে 'এই রিফিউজিগুলো এসে দেশটাকে ধ্বংস করে দিল', নতুন বসতির খোঁজে তখন তাদের বড়ো একটা অংশকে পাঠানো হচ্ছিল দণ্ডকবনের দিকে। নামটা ভালো নয়, পরিত্যাগের আর বনবাসের অনুষঙ্গ জড়ানো, আর তাছাড়া কেনই বা বাংলা ছেড়ে বাঙালি যাবে বসবাসের অযোগ্য অজানা ওই দূরের দেশে? দেশও কি বলা যায় তাকে? পড়ে থাকা অফলা জমি শুধু। সেদিনকার বামপন্থী নেতাদের তাকে আন্দোলনে আন্দোলনে ভরে উঠল শহর, চাই প্রতিরোধ, রুখতেই হবে এই অন্যায় নিষ্ক্রমণ।

রোখা অবশ্য যায়নি শেষ পর্যন্ত।

আজ যখন সেই বামপন্থীরাই আছেন শাসকের শাসনে, আজ তাহলে বোধহয় ফিরে পাওয়া যাবে আপন দেশ। ফ্রন্টেরই অন্যতম শরিকদের প্রেরণায় দণ্ডকপ্রবাসীরা হাজারে হাজারে এবার ফিরে আসছেন সেই আপন দেশের খোঁজে, সুন্দরবনের মরিচঝাঁপি অঞ্চলে বসত হচ্ছে তাদের। কিন্তু কী করে তা হবে? এ তো চক্রান্ত। মনে হলো অনেকের। নতুন গড়ে ওঠা সরকারকে বিপন্ন করবার মতলব ছাড়া কিছুই আর নেই এর মধ্যে। নতুন সরকার এত এত মানুষের দায় নেবে কেমন করে এই মুহূর্তে? মন্ত্রী বলল, দেখছি। কোটাল বলল, দেখছি। বলপ্রয়োগে উৎখাত হল নতুন সব ছাউনি। ধ্বংসে-রক্তে ভরে গেল অঞ্চল। পুড়ল-মরল অনেক। আরও যারা আসছিল, শক্তিমত্ততায় তাদের আটকানো হলো কলকাতার দিকে পৌঁছোবার আগেই, যেমন ধরা যাক বর্ধমান স্টেশনের প্লাটফর্মে।

এ নিয়ে যদি কষ্টের বোধ হয় কারো, এদের সঙ্গে যদি একাত্মতাবোধ করে কেউ, তবে সে যে চক্রান্তকারী তাতে আর সন্দেহ কী? আর তেমন-কোনো চক্রান্তকারী হয়ে যাবার ভয়ে 'কাড়ে না কেউ রা/ভালোমানুষের ছাঁ'। খুব সহজভাবেই তখন দণ্ডকে যায় ধর্মরাজার কলের ডুলি। আর এই নিয়ে আমাদের নতুন ঠাকুরমার ঝুলি, এই আমাদের নতুন দিনের রূপকথা। কবিতাটি পড়ে সুরজিৎ বসুর মতো কেউ-বা লিখেছিলেন (২৯।৮।৭৮): 'যদি ভেবে থাকেন ''ঠাকুরমার ঝুলি'' লিখে আমাদের লজ্জা দেবেন তাহলে ভুল করছেন।' তার কারণ নিশ্চয়ই এই যে এতে কারো কিছু যায়-আসে না, আর সেইজন্যেই 'কাড়ে না কেউ রা'। তবে এ ছাড়াও, আরও এক সমস্যা হল: 'অনেকেই দণ্ডক, কলের তুলি এসব বোঝেনি। চেনা কবি গল্পকার অধ্যাপকদের পড়ানোর ফলাফল শুনলে আপনি কবিতা লেখা ছেড়ে দেবেন, তাই বলছি না।'

সুরজিতের এই কথাটি কি সুভাষ মুখোপাধ্যায় মনে রেখেছিলেন, অনেকদিন পরে যখন আত্মধিক্কারে তিনি লিখছিলেন, 'পেরেছিস কি তুলতে জলে/একটুখানি স্রোতও? /একটুও চিড় ধরেছে শৃঙ্খলে?'

না, হয়তো তা ধরেনি। কিন্তু তবুও রসে বশে 'অজাত শত্রু বোবা' হয়েও থাকতে চাননি তিনি, দরকার মতো তাঁকে করতেই হয়েছে সমালোচনা, তুলতেই হয়েছে রাজনীতির কথা, বলতেই হয়েছে ক্ষমতার বিরুদ্ধে, গদি আর গদিয়ানদের বিরুদ্ধে, আর সেইজন্যে শুনতেও হয়েছে অবিরাম : 'ভেবেছে কী। এসব কী লিখছে এখন সুভাষ মুখুজ্জে!'

কী যে লিখছিলেন, তা কিন্তু ঠিকমতো পড়েওনি অনেকে। আর পড়লেও 'দেয়ালের লিখন' এই যে 'কানকাটাদের রাজ্যে। /ঠোঁট-কাটারা যাই বলুক না/আনে না কেউ গ্রাহ্যে।।' [শঙ্খ ঘোষ, প্রতিক্রিয়া, দিবারাত্রির কাব্য, জানুয়ারি-জুন ২০০৪]

আমাদের পারিবারিক বৃত্তে ঠাকুরদা-ঠাকুরমারা আবার ফিরে আসুন। আমাদের সন্ততিরা সবাই স্বপ্নে বাঁচুক। তাছাড়া স্বয়ং আইনস্টাইনই তো আমাদের শুনিয়েছিলেন রূপকথা পাঠে বুদ্ধিবৃদ্ধির সম্ভাবনার কথা।

নির্যাতিতের আদ্যক্ষর

শাক্যজিৎ ভট্টাচার্য

বইটি প্রকাশিত হবার পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হল ২০১৮ সালেই। অথচ আশ্চর্যজনকভাবে বাংলার কোনো পত্রপত্রিকাতে তা নিয়ে কোনো আলোচনা চোখে পড়েনি। যদিও দরকার ছিল। শুধুমাত্র পুনঃপাঠের প্রয়োজনীয়তাই নয়। মার্কসীয় পরিমণ্ডলে শোষিতের ভাষ্য কেমনভাবে নির্মাণ হবে তা বোঝবার জন্য এই বইটার থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এখনও পর্যন্ত আর কিছুই নেই। ১৯৬৮ সালে প্রথম প্রকাশের পর থেকে বিক্রি হয়েছে আট লাখের কাছাকাছি। শিক্ষাক্ষেত্রে, বিশেষত শিক্ষাদান কেমনভাবে করা যেতে পারে সেই বিষয়ের ক্রিটিকাল পেডাগজি নামক এক নতুন বিভাগের জন্ম দিয়েছে বইটি। কিন্তু শুধু শিক্ষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই নয়, নিপীড়িত মানুষের সার্বিক মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে এই ক্লাসিকটি মার্কসের ক্যাপিটাল অথবা ভলতেয়ারের গ্রন্থের মতোই সুদূরপ্রসারী প্রভাবসম্পন্ন। শুধু তাই নয়, লাতিন আমেরিকার অধুনা রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চর্যায় সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ আলেখ্য হিসেবে এই গ্রন্থটিকে লাতিন বামপন্থা বোঝবার একটি সূচনামুখ হিসেবে ধরে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু তবুও, পরিতাপের বিষয় যে পাউলো ফ্রেইরে লিখিত ‘পেডাগজি অফ দ্য অপ্রেসড’-এর পঞ্চাশ বছর পূর্তি নিয়ে আমাদের তেমন আলোচনা হয় না, যতই আমরা বাঙালিরা মার্কসচিন্তক জাতি হিসেবে আত্মশ্লাঘায় ভুগি না কেন!

পাউলো ফ্রেইরে ১৯২১ সালে ব্রাজিলের রেসিফ শহরে একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩০-এর গ্রেট ডিপ্রেশন ব্রাজিলকেও ধ্বস্ত করেছিল। ফ্রেইরে বলেছিলেন যে শিশুবয়েসেই তিনি চোখের সামনে দারিদ্র্য এবং ক্ষুধা কী বস্তু সেটা বুঝেছিলেন। আরেকটা ব্যাপার বলেছিলেন, প্রবল দারিদ্র্যের মধ্যে তিনি পড়া ভুলে যেতেন। তাঁর মনে হয়েছিল যে খালি পেট তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রভাব ফেলছে। এই ঘটনার থেকেই সারাজীবন তাঁকে যে প্রশ্নটা তাড়িয়ে বেড়িয়েছিল, শোষিত গরিব মানুষের শিক্ষার বিষয়টা কী হবে? সেটা কি চিরাচরিত বিদ্যালয় পদ্ধতির মধ্যেই ঘটবে, নাকি তার জন্য প্রয়োজন আলাদা কোনো ব্যবস্থার? সেই প্রশ্নের সন্ধানে যুবক বয়েসে তিনি মুখ ফেরালেন মার্কসবাদের দিকে। শুধু মার্কসই নয়, সার্ত্র, এরিক ফ্রম, হার্বার্ট মারকিউজ, ফ্রাঞ্জ ফ্যানন এবং ল্যুই আলথুসের থেকে ফ্রেইরে তাঁর দর্শনের সারবস্তু আহরণ করেছিলেন। সাও পাওলো শহরের শিক্ষাসচিব থাকবার সময়ে তাঁর প্রবর্তিত শোষিত মানুষের শিক্ষাতত্ত্ব ব্যাপকভাবে প্রচার পায়। ফ্রেইরে কাজ করতে শুরু করেন পথশিশু, কারখানার নিরক্ষর শ্রমিক এবং বস্তিবাসীদের নিয়ে। ইউনেস্কোর আন্তর্জাতিক জুরি বোর্ডের সদস্য হয়েছিলেন ফ্রেইরে। হার্ভার্ডে পড়িয়েছেন কিছুকাল। চিলিতে কৃষিসংস্কার বিষয়ে ইউনেস্কোর দূত হয়ে কাজ করেছেন। মূলত চিলিতে নির্বাসিত অবস্থাতেই দিন কাটাচ্ছিলেন কারণ ব্রাজিলের সামরিক শাসকেরা তাঁকে দেশছাড়া করেছিল। চিলি এবং বলিভিয়াতে ব্যাপক সাফল্য পায় তাঁর প্রবর্তিত শিক্ষাপদ্ধতি। মার্কসবাদী হওয়া সত্ত্বেও ফ্রেইরে ছিলেন ক্যাথলিক মতাদর্শের অনুগামী। পরবর্তীকালের খ্রিস্টীয় বিদ্রোহচেতনা এবং সাম্যবাদী আদর্শের মেলবন্ধন হিসেবে যে লিবারেশন থিওলজি লাতিন আমেরিকার প্রতিরোধের একটি মূল সূচক হিসেবে কাজ করেছিল, ফ্রেইরে ছিলেন তার একজন তত্ত্বকার। জেনেভায় অফিস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড কাউন্সিল অফ চার্চেস-এর উপদেষ্টা ছিলেন তিনি। ‘পেডাগজি অফ দ্য অপ্রেসড’-কেও লিবারেশন থিওলজির দৃষ্টিকোণ থেকে পাঠ করা সম্ভব। তবে ফ্রেইরে বইতে উল্লেখ করেছিলেন যে তাঁর অবস্থানকে গোঁড়া ক্রিশ্চিয়ান এবং গোঁড়া মার্কসবাদী, দুই পক্ষই সমালোচনা করতে পারেন।

পাওলো ফ্রেইরে-র শিক্ষাচিন্তার মূল কথা হল— প্রতিটি মানুষ এক একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন সত্তা যিনি পৃথিবীকে পরিবর্তন করতে পারেন এবং নতুন করে গড়তে পারেন। মানুষের চেতনা রূপ পায় আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি আর তার নিজস্ব পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে। বিশ্লেষণী চেতনা মানুষকে ভাবনা থেকে কাজে অগ্রসর হতে শেখায়। শোষকের আরোপিত নৈঃশব্দ্যের সংস্কৃতি নিপীড়ন জারি রাখতে সাহায্য করে এবং মিথ্যা কিছু ভাবনার মধ্যে আটকে রাখে। সেই

নৈঃশব্দ্য ভাঙতে পারে একমাত্র শিক্ষা। সেই দিক থেকে শিক্ষাদান একটি নাশকতামূলক কাজ। জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যই হল শিক্ষার্থীর (সেই সঙ্গে শিক্ষকেরও) চেতনায়নের মাধ্যমে বাস্তব জীবনে মুক্তি অর্জনের পথ করে নেওয়া। সমগ্র শিক্ষাপ্রক্রিয়াকে তাই নিজের বিবেকের এক আভ্যন্তরীণ অংশ হিসেবে (ফ্রেইরে Conscientize শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন) মেলাতে হবে। 'পেডাগজি অফ দ্য অপ্রেসড' চারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। বর্তমান নিবন্ধ শুধু প্রথম পরিচ্ছেদটি নিয়ে মার্কসবাদের আলোকে একটা নিবিড় পাঠের চেষ্টা করছে।

প্রথম পরিচ্ছেদটি বেছে নেবার কারণ এই অংশটি মানুষের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ টেক্সট। শিক্ষাব্যবস্থা আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকলেও, এই অংশটিকে সাধারণীকৃত করে সার্বিক শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথামালা হিসেবে পাঠ করা যায়। প্রথম পরিচ্ছেদ মূলত আলোচনা করেছে শোষিতের স্বাধীনতা কোন পথে আসবে সেই নিয়ে। পাঠ শুরু হয়েছে মানুষের মানবিকীকরণ এবং অমানবিকীকরণের (humanization এবং dehumanization) প্রশ্ন দিয়ে, যেখানে এই দুইটি ঐতিহাসিক বাস্তবতা হিসেবে স্বীকৃত। ফ্রেইরের বক্তব্য হল, ঐতিহাসিকভাবে শোষণের প্রধানতম হাতিয়ার হল মানুষের অমানবিকীকরণ। পাঠকের মনে পড়বে, ১৮৪৪ সালে প্যারিস পাণ্ডুলিপিতে মার্কস কতকটা একই কথা বলেছিলেন। মানুষের বিচ্ছিন্নতাকে পুঁজিবাদী সমাজ একটি বাস্তবতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে, এবং এর মধ্যে দিয়ে তার সম্পূর্ণ মানবিক সত্তাকে খণ্ডীকরণের মাধ্যমে মানুষের অমানবিকীকরণ ঘটছে। কিন্তু ফ্রেইরের মতে, এই অমানবিকীকরণ ঐতিহাসিক সত্য হলেও ইতিহাসের স্তর নয়। মানে, একে অনিবার্য হিসেবে ভাবা একটি অনৈতিহাসিক প্রক্রিয়া, যেটা শ্রমের মুক্তি এবং মানবিকীকরণের ধারণার বিপরীতে দাঁড়ায়। এখানে ফ্রেইরে ইতিহাসকে মানব-ইচ্ছা নিরপেক্ষ অজ্ঞেয় স্রোতের ধারণা থেকে বিযুক্ত এনে তাকে সাবজেক্টিভিটির সঙ্গে সংযুক্ত করলেন। যান্ত্রিক মার্কসবাদীরা এতে অসন্তুষ্ট হতে পারেন। কিন্তু তাঁদের মনে রাখা দরকার যে মার্কস নিজেও বহু লেখায় ইতিহাসের এরকম যান্ত্রিক ব্যাখ্যার বিরোধিতা করে গিয়েছেন। মানুষের চিন্তা, তার মুক্তির বাসনা এবং সংগ্রাম যে ইতিহাসের প্রতিটা স্তরে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবের কাজ করে থাকে, সেটাকে অস্বীকার করলে দুর্জ্ঞেয়বাদীদের খপ্পরে পড়বার প্রবল সম্ভাবনা থেকে যায়।

কীভাবে আসে এই অমানবিকীকরণের অধ্যায়টি? শোষণের মধ্যে নিহিত থাকে বস্তুতান্ত্রিক অধিকারের প্রশ্ন। সেটা জমি হতে পারে, কারখানার মুনাফা হতে পারে, শিক্ষা হতে পারে, অথবা হতে পারে নারীদেহ। দখল করতে করতে শোষকের চেতনায় মানবিক সত্তাও পণ্যায়িত হয়ে যেতে থাকে। সেটা অমানবিকীকরণের প্রথম ধাপ। ক্রমাগত সমস্ত বস্তু এবং চেতনাকে পণ্যায়িত করবার মাধ্যমে আসে দ্বিতীয় পর্যায়, যখন শোষক দখলদারিকে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হিসেবে মনে করতে শুরু করে। যদি পণ্যায়নই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয়, তাহলে অবধারিতভাবেই শোষকের সামনে শোষিতও একপ্রকার পণ্যই। ফ্রেইরের ভাষায়:

> যদি শোষিতের মানবিকীকরণ একটি অন্তর্ঘাতমূলক প্রক্রিয়া হয়, তাহলে তাদের মুক্তিও সেটাই। সেই কারণে তাদের প্রতিনিয়ত নিয়ন্ত্রণে রাখাটা জরুরি হয়ে ওঠে। আর যত বেশি নিয়ন্ত্রণ করা হয়, শোষিত তত বেশি পরিণত হয় জড় 'পদার্থে'। প্রতিটি বস্তু এবং ব্যক্তি, যার সংস্পর্শেই শোষক আসে তাকেই জড় পদার্থে রূপান্তরিত করবার, তাকে অধিকার করবার এই শোষক-চেতনা প্রশ্নাতীতভাবে ধর্ষকামী ঝোঁকের জন্ম দেয়।... নির্যাতকের চেতনার একটি বৈশিষ্ট্যই হল এই ধর্ষকাম।[১]

প্যারিস পাণ্ডুলিপিতে নর-নারীর সম্পর্কের প্রশ্নে কার্ল মার্কস একটি যুগান্তকারী উক্তি করেছিলেন যাকে মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। ফ্রেইরে যখন দখলের প্রশ্নটিকে সামনে এনে অমানবিকীকরণকে ব্যবচ্ছেদ করেন, মার্কসের উক্তিটি বেশি করে জীবন্ত হয়ে ওঠে।

> ব্যক্তিগত সম্পত্তি আমাদের এতই নির্বোধ এবং একদেশদর্শী বানিয়ে দিয়েছে যে আমাদের চোখে একটি বস্তু তখনই নিজস্ব হয় যখন আমরা তাকে অধিকার করি। যখন পুঁজি হিসেবে তা আমাদের জন্য উপস্থিত থাকে, অথবা যখন তাকে খাওয়া, পান করা, পরিধান করা ইত্যাদি হয়ে থাকে। সংক্ষেপে, যখন তাকে ব্যবহার করা হয়। অথচ ব্যক্তিগত সম্পত্তি এই বিভিন্ন ধরনের অধিকারকে জীবনধারণের প্রণালী হিসেবে ধারণা করে, যে জীবন আসলে ব্যক্তিগত সম্পত্তির জীবনীশক্তি— শ্রম ও পুঁজিসৃষ্টি।[২]

অর্থাৎ, পুঁজিবাদ আসলে মানুষের ইন্দ্রিয়ানুভূতিগুলিকে অবনমন করিয়ে স্থূল 'দখলের' ঘেরাটোপে বেঁধে ফেলেছে। সেই কারণে যেকোনো বস্তুকে দখল না করলে, ভোগ না করলে তার গুণাবলী পূর্ণরূপে অনুভূত হয় না। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় মানুষের চোখে অন্য মানুষ প্রতিভাত হয় তার ব্যবহারিক মূল্য দ্বারা। মানে, কারখানার মালিক শ্রমিকের চোখে প্রতিভাত হন তাঁর 'মানুষ' পরিচয়ের মাধ্যমে নয়, অর্থদাতা হিসেবে। স্ত্রী অথবা প্রেমিকা আসলে যৌন চাহিদা পূরণের লক্ষ্য কিংবা মানসিক জোরের জায়গা। পরিণত সন্তান বাবা-মায়ের কাছে খাদ্য বস্ত্র চিকিৎসা জোগানের মাধ্যম। অর্থাৎ

সর্বক্ষেত্রেই মানুষ সত্তাটির অবমূল্যায়ন ঘটে গিয়ে প্রাধান্য পাচ্ছে তার উপযোগিতার সত্তাটি। বিচ্ছিন্নতার একটি বড়ো উৎস এখানেই। এই যে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অবমূল্যায়ন ঘটে গিয়ে শুধুমাত্র স্থূল দখলের চৌহদ্দিতেই আটকে যাওয়া, মার্কস এটাকে 'পরম দারিদ্র্য' হিসেবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। এই 'পরম দারিদ্র্য'-ই একদিন ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়াতে হয়ে উঠবে স্বর্ণপ্রসবিনী, যেদিন পুঁজিবাদী সমাজ বিলুপ্ত হয়ে মানুষ তার পরিপূর্ণ সম্ভাবনাকে খুঁজে পাবে। ফ্রেইরে এই 'পরম দারিদ্র'-র মধ্যেই শোষণের প্রথম পাঠ খুঁজে পেয়েছেন। একথা বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না যে প্যারিস পাণ্ডুলিপির আলোতে 'পেডাগজি অফ দ্য অপ্রেসড'-কে পাঠ করলে তাকে মার্কসবাদের স্বভূমিতে আরো দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করা সম্ভব।

শোষণের মধ্যে যে অমানবিকীকরণ, সেটা শুধুই শোষিতকে নয়, প্রভাবিত করে শোষককেও। এই প্রক্রিয়াতে শোষক নিজেও তার মানবিক সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আস্তে আস্তে। তাই শোষিতের অনিবার্য দায়িত্ব হল এই শোষণপ্রক্রিয়া থেকে তার শোষককেও মুক্ত করা। কারণ শোষণের যে ক্ষমতা, অর্থাৎ নির্যাতনের ক্ষমতা, সেটা তাকে মুক্তির চাবিকাঠি দেয় না। সেই চাবিকাঠি থাকে নির্যাতিত-র হাতেই। এখানেই ফ্রেইরে এক অসামান্য গুরুত্বপূর্ণ উক্তি করলেন যেটা ক্ষমতার আলোচনায় একটি নির্ণায়ক হিসেবে গণ্য করা হয়।

> শোষিতের দায়িত্ব হল এটা নিশ্চিত করা যে হৃত মানবসত্তা ফিরে পাবার সংগ্রামে সে যেন কোনোমতেই শোষকের শোষক হিসেবে রূপান্তরিত না হয়। তার কাজ দুইপক্ষেরই হৃত মানবিকতাকে প্রতিষ্ঠা করা।[৩]

ক্ষমতার চিরাচরিত মার্কসীয় বিশ্লেষণে যখন সর্বহারার একনায়কত্বের তত্ত্বটিকে কাটাছেঁড়া করা হয়, সেটাকে বস্তুবাদের প্রধান দ্বন্দ্বের আলোকে দেখা হয়ে থাকে। পুঁজিপতি ও সর্বহারার দ্বন্দ্বটি একটি বৈরী সম্পর্ক, এবং সর্বহারার বিজয় সূচিত হতে পারে একমাত্র পুঁজিপতিকে শ্রেণি হিসেবে ধ্বংস করবার মাধ্যমেই। কিন্তু তাহলে কি সর্বহারা নতুন শোষক শ্রেণি হিসেবে আবির্ভূত হবার সম্ভাবনা নস্যাৎ হয়ে যায়? বিভিন্ন দেশে সমাজতন্ত্র স্থাপনের পর বহু আলোকোজ্জ্বল অভিজ্ঞতার পাশাপাশি যেটা ঘটেছে, সর্বহারার নামে পার্টির একনায়কতন্ত্র স্থাপিত হয়েছে। ধীরে ধীরে কমিউনিস্ট পার্টি হয়ে উঠেছে একটা নতুন শ্রেণি, যার সঙ্গে পূর্বের শোষকের বিভেদরেখা চরিত্রগতভাবে মুছে গিয়েছে। তার কারণ কী এটাই নয় যে শোষণমুক্তির সংগ্রাম আসলে শোষিতের মুক্তির একপাক্ষিক সংগ্রাম হিসেবেই থেকে গেছে এবং তারাই নতুন শোষক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে পরবর্তীকালে? এই প্রশ্নের উত্তর খুব সহজ নয়, এবং সম্ভবত মার্কস বা লেনিনের পক্ষেও এর সমাধান দেওয়া সম্ভব ছিল না। ফ্রেইরের মধ্যে খ্রিস্টীয় ক্যাথলিক চেতনার অন্তঃশীলিয় প্রভাব সারাজীবন বয়ে গিয়েছে, যার প্রভাবে তিনি ব্যক্তিমানুষের সত্তা এবং স্বাধীনতার প্রশ্নটিকে এভাবে দেখতে পেরেছিলেন।

এই প্রসঙ্গেই ফ্রেইরের বক্তব্য, শোষণমুক্তির সংগ্রামের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রায়শই দেখা যায় যে শোষিত জয়ী হয়েছে এবং ফিরে এসেছে শোষকরূপে। শোষণ আছে অপরিবর্তিত। লাতিন দেশগুলির, বিশেষত হাইতির বিপ্লব বিষয়ে ফ্রেইরে অবহিত ছিলেন। হাইতির দাস ও কৃষ্ণাঙ্গদের বিদ্রোহের প্রধান নেতা, ত্যুসো লভারচা ক্ষমতায় গিয়ে সেই একই পদ্ধতিতে অবদমন চালিয়েছিলেন। অথবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিপ্লবী ইতিহাস, যার গণনায়কেরা দুই শতাব্দীর ব্যবধানে আবির্ভূত হয়েছিলেন নতুন নির্যাতক হিসেবে। খুব তাৎপর্যপূর্ণভাবে ফ্রেইরে মন্তব্য করেছেন, 'প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিপ্লবে অংশ নেওয়া অনেক শোষিতই পুরোনো ব্যবস্থার প্রভাবে এই বিপ্লবকে নিজেদের কুক্ষিগত বিপ্লবে রূপান্তরিত করে নেন।"[৪]

কিন্তু কেন এটা হয়? ফ্রেইরের মতে, শোষণের প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকতে নির্যাতিত নিজেকে নির্যাতকের সঙ্গে একাত্ম করতে চায়। সে শোষককে এই প্রক্রিয়ার বাইরে দেখতে অক্ষম, কারণ তার কাছে এই পরিস্থিতি পুরোটাই অপরিবর্তনীয়। তাহলে নিজের যন্ত্রণামুক্তির উপায় কী? একমাত্র তখনই, যদি সে ক্ষমতার স্তরবিভাগে উচ্চস্থানে চলে যায়। অর্থাৎ, শোষক হয়ে যায়। সে নিজের শোষিত অবস্থান সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় সচেতন, কিন্তু শোষকের বিরুদ্ধে বৈরী অবস্থানে থাকা এবং শোষণপ্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে বৈরী অবস্থানে থাকা, এই দুটি অভিন্ন নয়। ফলত যেটা হয়, বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে থাকা নির্যাতককে ধ্বংস করে সে নির্যাতনের চাবুক নিজের হাতে তুলে নেয়।

বইতে ফ্রেইরে একটি সত্যি ঘটনা উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর এক সমাজতাত্ত্বিক বন্ধুর কাছ থেকে তিনি শুনেছিলেন যে লাতিন আমেরিকার একটি দেশের সশস্ত্র কৃষকেরা একটি খামার দখল করেছিল। জমিদারকে বন্দি করবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই জমিদার ছিলেন নিরস্ত্র। কিন্তু একজন রাইফেলধারী কৃষকও তাঁর কাছে এগোতে সাহস করল না। জমিদারের উপস্থিতি তো ভয়াবহ ব্যাপার ছিলই, আবার এটাও হতে পারে যে দীর্ঘদিনের অভ্যেসের বিপরীতে গিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে মাথা তোলবার জন্য বিদ্রোহীদের মনের মধ্যে একপ্রকার অপরাধবোধও কাজ করেছিল। ফ্রেইরে তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গিতে মন্তব্য করেছিলেন, 'প্রভু ছিলেন বিদ্রোহীদের "অভ্যন্তরে"।'[৫] এই যে একাত্ম বোধ করা, এখান থেকেই বিপরীত মেরুতে নির্যাতকের সঙ্গে স্থান পালটাপালটি করে নেবার প্রবণতা আসে।

একে ফ্রেইরে অভিহিত করেছেন 'স্বাধীনতার প্রতি ভয়' অভিধায়। দীর্ঘদিন ধরে শোষণের ফলশ্রুতিস্বরূপ শোষিত তার মনের মধ্যে শোষকের প্রতিচ্ছবি এবং তার বেঁধে দেওয়া নিয়মাবলীকে চূড়ান্ত ভাবতে শুরু করে। তাই পূর্ণ স্বাধীনতার দিকে সে এগোতে পারে না। কারণ পূর্ণাঙ্গ মুক্তির মানে হল চলতি ব্যবস্থাকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে নতুন ব্যবস্থা। তার মানে এটা নয় যে শোষিত নিজের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত নয়। কিন্তু অবহিত থাকলেও, সে বদলাতে চায় শুধুমাত্র নিজের অবস্থাটুকুই, পরিপূর্ণ অবস্থাটা নয়। সে নিজের শোষিত হওয়াকে বদলাতে চায়, কিন্তু শোষণকে নির্মূল করতে ভয় পায়। কারণ তার মনের ভেতর এই শোষণব্যবস্থাটুকুই তার অস্তিত্বের শর্ত বলে সে জেনে এসেছে এতকাল। আর ঠিক সেই কারণেই, প্রকৃত মুক্তি হল, ফ্রেইরের ভাষায়, 'শিশুর জন্ম দেবার মতোই যন্ত্রণাময় অভিজ্ঞতা'।[৬] অদ্ভুতভাবে আবারও ফিরে আসেন মার্কস, 'প্রতিটি নতুন সমাজের গর্ভে যখন পুরোনো সমাজ জন্মগ্রহণ করে, শক্তি তখন ধাত্রী হিসেবে কাজ করে'।[৭] মার্কস কথাটা বলেছিলেন সমাজবিপ্লবের প্রেক্ষিতে। আর ফ্রেইরে বলছেন সম্ভবত আরো ব্যাপক অর্থে, শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রেক্ষিতে। দ্বিতীয়টির মধ্যে শ্রেণি ছাড়াও লিঙ্গ, ধর্ম, জাতি, বর্ণ ইত্যাদি বিভিন্ন বর্গকে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া সম্ভব।

সম্ভবত ফ্রেইরে সচেতন ছিলেন যে ধ্রুপদি মার্কসবাদীদের একাংশ তাঁকে সাবজেক্টিভিজমের দায়ে অভিযুক্ত করতে পারেন। তাই মুক্তির জন্য শোষিতের সংগ্রামের আলোচনায় একটা বড়ো অংশ তিনি ব্যয় করেছেন সাবজেক্টিভিজম বনাম সাবজেক্টিভিটি, এই দ্বন্দ্ব নিরূপণে। এবং এখানেই তাঁর পথ মার্কসবাদের যান্ত্রিক প্রয়োগের থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছে। ফ্রেইরের দর্শনের একটা বড়ো অংশ জুড়ে আছে মানুষের চেতনা, স্বাধীন ইচ্ছে এবং মুক্তির আকাঙ্ক্ষার প্রশ্ন। কিন্তু ইতিহাসকে সেটা কতখানি প্রভাবিত করতে পারে? যান্ত্রিক মার্কসবাদীরা মার্কসের আপ্তবাক্য আওড়াবেন 'মানুষই ইতিহাস রচনা করে, কিন্তু সে নিজের খেয়ালখুশি মতো সেটা করতে পারে না'।[৮] সত্যিই তাই। কিন্তু মার্কস সম্ভবত অত গোদা ভাষায় চেতনা এবং বস্তুর মধ্যে পার্থক্য দাগিয়ে যাননি। তিনি ভালো করেই জানতেন যে এদের পারস্পরিক সম্পর্ক অনেক বেশি জটিল ও সূক্ষ্ম। তাই প্যারিস পাণ্ডুলিপিতে তাঁকে পাতার পর পাতা ব্যয় করতে হয়েছে ব্যক্তিমানুষের সংকট বিষয়ক আলোচনায়। বার বার বলতে হয়েছে যে সমাজতন্ত্রে পৌঁছোবার লড়াই আসলে মানুষকে মানুষের অসীমতায় পৌঁছে দেবার লড়াই। সেই লড়াই কি ব্যক্তির ইচ্ছানিরপেক্ষভাবে সমাজ-বিবর্তনের নিজস্ব গতিতে হওয়া সম্ভব? এই দুর্জ্ঞেয়বাদী ব্যাখ্যার বিপরীতে মার্কস এবং এঙ্গেলস বরাবর অবস্থান করেছেন। ১৮৯০ সালে জোসেফ ব্লককে লেখা চিঠিতে এঙ্গেলস মন্তব্য করেছিলেন যে যাঁরা ভাবেন অর্থনৈতিক চালিকাশক্তিগুলিই সমাজ-পরিবর্তনের এক এবং একমাত্র সহায়ক এবং মানবচেতনার সেখানে কোনো স্থান নেই, তাঁরা মার্কসবাদকে একটা অবোধ্য, যান্ত্রিক এবং হাস্যকর তত্ত্বে পর্যবসিত করেন।[৯] সাবজেক্টিভিটির স্থান মার্কসবাদের ইতিহাসে যথেষ্ট বেশি। চেতনা এবং বস্তু, পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত করে, এবং একটা পর্যায়ে গিয়ে দুইয়েরই গুণগত পরিবর্তন ঘটে। মার্কসবাদ যেটাকে বর্জন করে তা হল সাবজেক্টিভিজম। অর্থাৎ, মানবচেতনাই সমাজবদলের একমাত্র হাতিয়ার, এমন তত্ত্বকে। ফ্রেইরে সেই একই রাস্তায় হেঁটেছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি:

> জগৎ ও ইতিহাস বদল করবার প্রক্রিয়াকে সাবজেক্টিভিটির গুরুত্বকে অস্বীকার করা ছেলেমানুষি এবং একরৈখিক হয়ে যায়। এটা করতে গেলে জনহীন পৃথিবী নামক একটি অসম্ভব ধারণাকে গ্রহণ করতে হয়। এরকম অবজেক্টিভিস্ট অবস্থান সাবজেক্টিভিস্ট অবস্থানের মতোই অভিনব— পৃথিবীহীন জনগণ। মানুষ এবং পৃথিবী একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাঁচে না। বরং একে অপরের সঙ্গে নিয়ত মিথস্ক্রিয়া চালিয়ে যায়।[১০]

কাজেই, শোষণের বিরুদ্ধে মুক্তির সংগ্রাম সাবজেক্টিভ এবং অবজেক্টিভের মধ্যে একটি দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের মাধ্যমে চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে। শোষিত মানুষ তার বাস্তবতাকে বস্তুগতভাবে ব্যাখ্যা করবে, এবং তার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবে সচেতনতার সঙ্গে। নিজের বাস্তবতাকে বোঝার প্রক্রিয়াতে চেতনার স্থান বিরাট। কিন্তু শুধুমাত্র চেতনা দিয়েই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। তার জন্য দরকার সক্রিয় সংগ্রাম, যেটা সমাজব্যবস্থার বস্তুগত বদলের অন্যতম হাতিয়ার।

সেই সংগ্রামের এক অন্যতম হাতিয়ার হল নিরন্তর কথোপকথন। কারণ শব্দ ও কার্য একে অপরের সঙ্গে বস্তু ও চেতনার মতোই নিরন্তর মিথস্ক্রিয়া চালিয়ে যায়। ফ্রেইরে বার বার এই কথোপকথনের জায়গাতে ফিরে যাচ্ছেন। তাঁর কাছে শিক্ষাদান যেহেতু নাশকতামূলক বৈপ্লবিক কাজ, তাই এই ভাববিনিময়ের প্র্যাকটিসকে তিনি বার বার তুলনা করছেন বিপ্লবী পার্টির সঙ্গে। এটার মানে শুধু অন্তঃসারশূন্য স্লোগান নয়। আপ্তবাক্যও নয়। এই চিরাচরিত শিক্ষাদানের প্রক্রিয়াগুলি শাসকশ্রেণির দ্বারা প্রবর্তিত। তার বদলে আনতে হবে চিন্তাভাবনা বিনিময়, তর্কবিতর্ক এবং পারস্পরিক আলোচনার একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। ফ্রেইরে গিওর্গি লুকাসকে উদ্ধৃত করে বলছেন যে বিপ্লবী পার্টির যেমন কাজ হল জনগণকে তাদের কার্যাবলী বিশ্লেষণ করা, ঠিক তেমনই শোষিতের শিক্ষা তখনই

কার্যকরী হয় যখন তার করা কাজকে বস্তুগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে আবার ফিরে দেখা যেতে পারে[১১] কিন্তু বিশ্লেষণের মাধ্যমে রূপান্তরের প্রক্রিয়াটি শোষিতের 'জন্য' করা হবে না। করা হবে শোষিতের 'সঙ্গে'। এখানেই ফ্রেইরে পার্টি এবং সর্বহারার সম্পর্কের একটা সমান্তরাল টানলেন। পার্টি যেমন শ্রেণির উচ্চে অবস্থিত কোনো অস্তিত্ব নয়, বরং তার অবস্থান শ্রেণির মধ্যেই, ঠিক তেমনই যে বিপ্লবী শক্তি শোষিতকে রূপান্তরিত করবে, সে সেটা করবে শোষিতের মধ্যে থেকে। ক্ষমতার হায়ারার্কি ভাঙবার শুরু এখান থেকেই, এবং এটাই শোষিতের আদ্যাক্ষরের সূচনাবিন্দু। এবং সূচনা থেকে যাত্রা সম্ভব শোষিতের এই জ্ঞানে যে সে শুধুই দুর্ভাগা অথবা নির্যাতিত নয়। বরং এই অবস্থা বদলের চাবিকাঠি রয়েছে একমাত্র তারই হাতে। এটা ধ্রুপদি মার্কসবাদেরও একদম গোড়ার কথা। মার্কসের আগে যে সমস্ত সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী দার্শনিকেরা এসেছেন, সকলেই সর্বহারাকে দেখেছেন সহানুভূতির দৃষ্টি দিয়ে। নিপীড়িতের দীর্ঘশ্বাসটুকুই দেখেছেন তাঁরা। মার্কস সর্বপ্রথম সর্বহারা শ্রেণির মধ্যে আবিষ্কার করেছেন পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ধ্বংসের শক্তিকে। তাই সর্বহারা শুধুমাত্র নির্যাতিত নয়, সে একটি বিপ্লবী শ্রেণিও বটে। ফ্রেইরে মার্কসবাদকে শোষণমুক্তির সংগ্রামের ব্যাখ্যায় ভিন্ন আঙ্গিকে পুনর্স্থাপনা করেছেন বলা যায়। হয়তো আরো সাধারণীকৃতভাবে, শুধুমাত্র শ্রেণির মধ্যে আবদ্ধ না থেকে।

একদম শেষ অনুচ্ছেদে এসে ফ্রেইরে এই আলোচনাকে শিক্ষাব্যবস্থার প্রেক্ষিতে নিয়ে আসলেন। তাঁর কাছে শিক্ষক এবং ছাত্রের আদর্শ সম্পর্ক হল বিপ্লবী পার্টি এবং জনগণের মধ্যে সম্পর্কের মতো। পার্টি জনগণকে শুধু শিক্ষাই দেবে না, একইসঙ্গে জনগণের কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে নিজেকে রূপান্তরিত করবে। ঠিক একইভাবে শিক্ষাদানের পদ্ধতিতে শুধুই ছাত্র নয়, রূপান্তরিত হবেন শিক্ষকও। সেটাই পেডাগজি। এই প্রক্রিয়াতে বাস্তবকে শুধুমাত্র বোঝাই হবে না, বিশ্লেষণই করা হবে না, বর্তমান বাস্তবতাকে পুনর্স্থাপিত করা হবে শোষণহীনতার বাস্তবতা দ্বারা। সেটাই আসল কাজ। ফ্রেইরে অসংখ্যবার এটাই বলে গিয়েছেন যে নিজের বাস্তবতাকে জানাটা শোষিতের অন্তিম লক্ষ্য নয়, অন্তিম লক্ষ্য হল তাকে বস্তুগতভাবে বদলাবার জন্য সংগ্রাম। শেষ বাক্যে এসেও তাই অনিবার্যভাবেই আবার জীবন্ত হয়ে ওঠেন কার্ল মার্কস— 'দার্শনিকেরা পৃথিবীকে বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন এতদিন। আসল কাজ তাকে পরিবর্তিত করা'।[১২]

তথ্যসূত্র

১. Paulo Freire, *Pedagogy of the Oppressed, 30th Anniversary Edition,* Tr. Myra Bergman Ramos, Continuum, London, 2000, p. 59.

২. Karl Marx, *The Economic and Philosophical Manuscripts*, (Edited by) Eric Fromm, Continuum, New York, [1844] 2004, p. 107.

৩. Paulo Freire, *Pedagogy of the Oppressed, 30th Anniversary Edition,* Tr. Myra Bergman Ramos, Continuum, London, 2000, p. 44.

৪. Ibid, p. 46

৫. Ibid, p. 64

৬. Ibid, p. 49

৭. Karl Marx, *Capital,* Volume 1, Chapter 31, Penguin, New York, [1867] 1990

৮. Karl Marx, *The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte,* Chapter 1, 1852

৯. Friedrich Engels, *Letter to Joseph Bloch in Königsberg,* London, September 21, 1890

১০. Paulo Freire, *Pedagogy of the Oppressed, 30th Anniversary Edition,* Tr. Myra Bergman Ramos, Continuum, London, 2000, p. 50.

১১. Ibid, p. 53

১২. Karl Marx, *Theses on Feuerbach,* thesis 11 1845.

অর্থনীতির ধাপ্পাবাজি

শুভনীল চৌধুরী

বিশ্বখ্যাত অর্থনীতিবিদ, জোসেফ শুমপিটার, ১৯৫২ সালে একটি বই লিখেছিলেন দশ জন সেরা অর্থনীতিবিদকে নিয়ে। বইটির নাম 'Ten Great Economists – From Marx to Keynes'। ভারতের অর্থব্যবস্থার বর্তমান দশা এবং দেশের অর্থমন্ত্রী এবং শাসকদল তার যেই ব্যাখ্যা জনগণের সামনে পেশ করছে, তা দেখে মনে হয়, শুমপিটার সাহেব বেঁচে থাকলে দশ নয়, এগারো জন সেরা অর্থনীতিবিদকে বাছতেন। একাদশতম স্থান যৌথভাবে অলংকৃত করতেন অরুণ জেটলি এবং বিজেপি-র 'আইটি সেল'। কেন এই কথা বলছি? ভারতের অর্থব্যবস্থার সাম্প্রতিক দুটি জ্বলন্ত সমস্যা এবং তা নিয়ে বিজেপি-র নেতাদের বক্তব্য তুলে ধরলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

টাকার অবমূল্যায়ন

২০১৪ সালের আগে একটা সময় ছিল যখন টাকার তুলনায় ডলারের দাম বাড়লে বিজেপি ও মোদী কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানাতেন। ব্যঙ্গ করে বলতেন যে শীঘ্রই ডলারের দাম মনমোহন সিংহের বয়স ছাড়িয়ে যাবে। কিন্তু আসল ছবিটি কী? ২০১৪ সালের ২৬ মে মোদী যেদিন ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পদে শপথ গ্রহণ করলেন, সেদিন ডলারের দাম ছিল ৫৮.৫৮ টাকা, বর্তমানে (১৮ই সেপ্টেম্বর ২০১৮) তা বেড়ে হয়েছে ৭২.৩৮ টাকা। ডলারের নিরিখে টাকার এই বিপুল পতনের কোনো নজির ভারতের ইতিহাসে নেই। যারা শক্তিশালী দেশ গড়ার কথা বলে, যাঁরা বিরোধী শিবিরে থাকাকালীন টাকার অবমূল্যায়ন নিয়ে গলা ফাটিয়েছেন, তাঁদের আমলে ডলারের নিরিখে টাকার মান অতীতের সমস্ত রেকর্ড ম্লান করে দিলেও, তাঁদের কোনো লজ্জা নেই। বরং দেশের অর্থমন্ত্রী নজিরবিহীন অর্থনৈতিক তত্ত্ব হাজির করছেন টাকার এই বিপুল অবমূল্যায়নকে ব্যাখ্যা করতে।

কয়েক দিন আগে টাকার অবমূল্যায়ন নিয়ে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, আসলে টাকার অবমূল্যায়ন হচ্ছেই না। যেটা হচ্ছে তা হল এই যে ডলারের দাম বাড়ছে, এহেন বক্তব্য শুনে চোখ কচলাতে হলেও আপনার আমার কিছু করার নেই। দেশের অর্থমন্ত্রীর বাণী বলে কথা! কিন্তু আসলে যেরকম গণেশের শুঁড় প্লাস্টিক সার্জারির নিদর্শন বলে চালাতে চান প্রধানমন্ত্রী, যেমন গরুর চোনায় ঔষধের সন্ধান পান হিন্দুত্ববাদীরা, তেমনই জেটলি দেখছেন যে টাকার অবমূল্যায়ন ঘটেইনি, ডলারের দাম বেড়েছে।

কিন্তু অর্থমন্ত্রী যেটা বলছেন তার আদতে কোনো মানে নেই। টাকার অবমূল্যায়ন ঘটা মানেই টাকার নিরিখে ডলারের দাম বাড়া। তাই টাকার অবমূল্যায়ন হচ্ছে না, ডলারের দাম বাড়ছে— এহেন কথা শিশুপাঠ্য বইয়েও জায়গা পাবে না। কিন্তু জেটলি অত বোকা নন। তাই তিনি আরো একটি কথা জনগণের সামনে হাজির করেছেন। তিনি বলেছেন যে টাকার নিরিখে শুধুমাত্র ডলারের দাম বাড়ছে, বাকি পাউন্ড বা ইউরোর মতন মুদ্রার দাম বাড়ছে না। সমস্যা একটাই— কথাটি ডাহা মিথ্যা।

বিগত বেশ কিছু মাস ধরে টাকার দাম পাউন্ড বা ইউরোর মতন মুদ্রার নিরিখে লাগাতার কমছে। যেমন, ১৫ জুন ২০১৮ সালে এক পাউন্ডের দাম ছিল ৯০ টাকার আশেপাশে, বর্তমানে (১৮ই সেপ্টেম্বর) যা বেড়ে হয়েছে ৯৫ টাকার বেশি। আবার একই সময়ে ইউরোর দাম ৭৮ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৮৪ টাকা। অর্থাৎ, অর্থমন্ত্রী যেই দাবি করছেন যে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মুদ্রার তুলনায় টাকার অবমূল্যায়ন হয়নি, তা সর্বৈব মিথ্যা। তথ্য বলছে যে উদীয়মান অর্থব্যবস্থাগুলির মধ্যে টাকার অবমূল্যায়ন সর্বাধিক ঘটেছে। কিন্তু সরকার তা মানতেও রাজি নয়, তাই কিছু করতেও রাজি নয়। এর মাশুল দিতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।

আন্তর্জাতিক বাজার থেকে ভারত যে-সমস্ত পণ্য আমদানি করে তার দাম ডলারের নিরিখে দিতে হয়। তাই টাকার অবমূল্যায়ন ঘটলে আমদানিকৃত সামগ্রীর দাম দেশের বাজারে বাড়তে বাধ্য। আবার একই অবমূল্যায়নের জন্য ভারত যেই

পণ্যগুলি রপ্তানি করে, তার দাম আন্তর্জাতিক বাজারে কমবে। কিন্তু রপ্তানি ঝট করে বাড়ে না। তাই টাকার অবমূল্যায়ন হলে তাৎক্ষণিকভাবে আমদানিকৃত সামগ্রীর দাম বাড়বে। ভারত যে-সমস্ত পণ্য আমদানি করে তার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হল পেট্রোপণ্য। টাকার অবমূল্যায়ন এবং আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বাড়ার জন্য দেশের বাজারে পেট্রোল-ডিজেলের দাম লাগাতার বাড়ছে। বর্তমানে, কলকাতা শহরে এক লিটার পেট্রোলের দাম ৮৪ টাকা ছাড়িয়ে গেছে, ডিজেলের দাম ৭৫ টাকা।

অন্যদিকে, ভারতের বাণিজ্যিক ঘাটতি বেড়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে এই ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ১৫৮০ কোটি ডলার যা মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ২.৪ শতাংশ। ২০১৭-১৮ সালের প্রথম ত্রৈমাসিকে এই ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১৫০০ কোটি ডলার। এই ঘাটতি পূরণ করার জন্য আন্তর্জাতিক পুঁজির বিনিয়োগ প্রয়োজন, যা ভারতে ডলারের জোগান বাড়াবে। কিন্তু তা হচ্ছে না। অনাবাসী ভারতীয়রা এখনও ভারতে ডলার পাঠাচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের কাছে ভারত আর খুব আকর্ষণীয় দেশ নয়। তাই ২০১৭-১৮ আর্থিক বর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে যেখানে ১২৫০ কোটি ডলার আর্থিক বিনিয়োগ (মূলত শেয়ার বাজারে যাকে FII বলা হয়) করেছিল বিনিয়োগকারীরা, সেখানে ২০১৮-১৯-র প্রথম ত্রৈমাসিকে মোট ৮১০ কোটি ডলার ভারত থেকে বেরিয়ে গেছে। ডলারের এই বাড়তি চাহিদা টাকার অবমূল্যায়ন ঘটার জন্য দায়ী। এই অবমূল্যায়ন ঠেকাতে ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে মাঠে নামতে হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রা ভাণ্ডারে গচ্ছিত ডলার বাজারে ছেড়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক টাকার অবমূল্যায়ন ঠেকাতে চেয়েছে। সুতরাং বৈদেশিক মুদ্রা ভাণ্ডারে গচ্ছিত ধনের পরিমাণ কমেছে, কিন্তু তাতেও টাকার অবমূল্যায়ন আটকানো যায়নি।

তেলের দাম

একদিকে বাড়তে থাকা ডলারের দাম, অন্যদিকে বাড়তে থাকা তেলের দাম। সাধারণ মানুষ অর্থনীতি বোঝেন না। কিন্তু তেলের দাম বাড়ার ফলে তাদের দৈনন্দিন জীবনে যে বিশাল আর্থিক বোঝা চাপছে, তা বুঝতে অর্থনীতির পণ্ডিত হওয়ার দরকার নেই। বাজারে গেলেই তা বোঝা যাচ্ছে।

কিন্তু আবারও আমাদের দেশের শাসকদল ও তার নেতারা মানুষকে বোকা বানানোর কাজে দিবারাত্রি মনোনিবেশ করে চলেছেন। বিজেপি-র তরফ থেকে বলা হচ্ছে যে তেলের দাম বাড়লেও সরকারের কিছু করার নেই, কারণ তা আন্তর্জাতিক বাজারে বাড়ছে। কথাটি যে ডাহা মিথ্যা কথা তা বলার আগে আরো একবার কথাটি নিয়ে ভাবুন। যখন টাকার অবমূল্যায়ন ঘটছে তখন অর্থমন্ত্রী বলছেন সব ঠিক হ্যায়, দেশের অর্থব্যবস্থা স্থিতিশীল, কোনো সমস্যা নেই। আবার দেশে যখন তেলের দাম বাড়ছে, তখন সরকার বলছে যে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বাড়ছে, আমাদের কিছুই করার নেই। মোদ্দা কথাটি এই যে মোদী সরকার জোরের সঙ্গে বলছে যে আর্থিক ক্ষেত্রে তাদের কোনো ভূমিকা নেই। যা হবে তা আন্তর্জাতিক বাজারের উপর নির্ভরশীল। মজা হল এই যে ভারতের ৩১ শতাংশ জনগণ মোদীকে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে থাকার জন্য ভোট দেননি। অর্থব্যবস্থায় গতি আসবে, আচ্ছে দিন আসবে, এই সমস্ত মিথ্যা কথায় বিশ্বাস করে তাঁরা ভোট দিয়েছিলেন। এখন দেখা যাচ্ছে যে সরকার আর কোনো ঢাকঢাক গুড়গুড় না করেই একের পর এক মিথ্যা কথা বলে চলেছেন।

আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বিগত কিছু মাসে বেড়েছে, একথা ঠিক। কিন্তু ২০১৪ সালে মোদী ক্ষমতায় আসার আগে তেলের দাম ঢের বেশি থাকলেও দাম এত বেশি ছিল না। এমনকী এখনও আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলি—বাংলাদেশ, পাকিস্তান বা শ্রীলঙ্কাতে তেলের দাম আমাদের দেশের তুলনায় অনেক কম। আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বাড়াই যদি পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির একমাত্র কারণ হয়, তবে আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলিতে দাম কম কেন এই প্রশ্নের উত্তর সরকারকে দিতে হবে।

আসলে সরকারের কাছে এর কোনো উত্তর নেই। কারণ তাদের ভুল নীতি, অকর্মণ্যতার জন্যই আমাদের দেশে পেট্রোপণ্যের দাম এহেন ভয়াবহ জায়গায় গিয়েছে। যখন আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম কম ছিল তখন সরকার লাগাতার তেলের উপর মাশুল বাড়িয়েছে। ২০১৩-১৪ সালে তেলের থেকে সংগৃহীত মোট শুল্কের পরিমাণ ছিল ৮৮০৬৫ কোটি টাকা, যা ২০১৭-১৮ সালে প্রায় তিন গুণ বেড়ে হয়েছে ২২৯০১৯ কোটি টাকা। ২০১৩-১৪ সালের মোট রাজস্বের ৭.৭ শতাংশ আসত তেলের শুল্ক থেকে যা ২০১৭-১৮ সালে বেড়ে হয়েছে ১১.৮ শতাংশ। একই সময়ে মোট রাজস্বে কর্পোরেট করের অনুপাত ৩৪.৭ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে ২৯ শতাংশ। অর্থাৎ, রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে সরকার কর্পোরেটদের উপরে চাপ কমিয়ে পেট্রোল-ডিজেলের মতন নিত্য-প্রয়োজনীয় পণ্যের উপর বোঝা বাড়িয়েছে, যা বহন করতে হচ্ছে দেশের সাধারণ মানুষকে।

ভুলে গেলে চলবে না, এই বিজেপি সরকার প্রচুর ঘটা করে সংসদে জিএসটি বিল লাগু করেছিল। বলা হয়েছিল যে এক দেশ, এক কর প্রথা শুরু করা হল। *আরেক রকম*-এর পাতায় আমরা বহুবার জিএসটি-র বিরুদ্ধে সরব হয়েছি। কিন্তু জিএসটি লাগু হওয়ার পরেও কেন পেট্রোল-ডিজেলকে তার আওতায়

আনা হবে না এই প্রশ্ন তোলা জরুরি। বাকি সমস্ত পণ্য যদি জিএসটি-র আওতায় আসে তবে পেট্রোপণ্যকেও তার আওতায় আনতে হবে। বর্তমানে জিএসটি-র সর্বোচ্চ হার ২৮ শতাংশ। এই হারেও যদি পেট্রোপণ্যের উপর কর ধার্য করা হয়, তবে হিসেব করে দেখা গেছে যে এক লিটার পেট্রোলের দাম হবে ৫৫ টাকার কাছাকাছি। জিএসটি ব্যবস্থার অনেক ত্রুটি আছে যা নিয়ে লড়াই চালাতে হবে। কিন্তু যেই কর ব্যবস্থা লাগু হয়ে গেছে তার আওতায় কেন পেট্রোপণ্যকে আনা হবে না, তার জবাব সরকারকে দিতে হবে। কেউ কেউ বলবেন যে পেট্রোপণ্যকে জিএসটি-র আওতায় আনলে সরকারের রাজস্ব আদায় কমবে। আমরা বলব, যদি তা হয়ও, সেই ঘাটতি পূরণ করার জন্য কর্পোরেটদের উপর বাড়তি কর চাপাতে হবে। বলাই বাহুল্য, জিএসটি-র আওতায় পেট্রোপণ্যকে আনতে হলে সমস্ত রাজ্য সরকারগুলিকেও এই দাবি তুলতে হবে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, রাজ্য সরকারগুলিও পেট্রোপণ্যকে জিএসটি-র আওতার বাইরে রেখে, তেলের উপর বিক্রয় কর চাপিয়ে রাজস্ব আয় করে। তাই তারাও এই দাবিতে মুখ খুলতে রাজি নয়।

নরেন্দ্র মোদীর বিজেপি-র অবশ্য তুলনা নেই। তাদের আইটি সেল, সম্প্রতি একটি রেখচিত্র টুইট করেছে যাতে তারা দেখাচ্ছে যে ইউপিএ আমলের তুলনায় নাকি পেট্রোলের দাম আদতে কমেছে। এহেন মিথ্যা প্রচার দেখে গোয়েবল্‌স-ও লজ্জিত হতেন। কিন্তু ক্ষমতার নেশায় মশগুল বিজেপি ও তার কর্মী-নেতাদের থামায় কে!

অপযুক্তির বিনাশ চাই

আসলে আরএসএস-বিজেপি-র মতন উগ্র দক্ষিণপন্থী সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলি অপযুক্তির উপরে নির্ভর করেই তাদের রাজনীতি করে। তারা বলে যে গো-মূত্র খেলে অসুখ সারে, হিন্দু মন্ত্র উচ্চারণ করলে গর্ভবতী নারী সুসন্তান পাবে, রামায়ণের পুষ্পক যান আসলে বর্তমানের এরোপ্লেন। এহেন কুযুক্তির সূত্র ধরেই বলা যায় যে টাকার দাম কমছে না ডলারের ডাম বাড়ছে, বা তেলের দাম বাড়লেও সরকারের কিছু করার নেই। জনবিরোধী বিজেপি সরকারকে গদিচ্যুত করা সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তির অবশ্য কর্তব্য। তার অনেক চর্চিত কারণ রয়েছে। কিন্তু অপযুক্তির বিরুদ্ধে এবং যুক্তির স্বার্থেও এই সরকার ও তাদের নেতাদের অবিলম্বে গদিচ্যুত করা জরুরি। নয়তো, তার্কিক ভারতীয়দের দেশ মূর্খদের দেশ হিসেবে পরিচিত হবে।

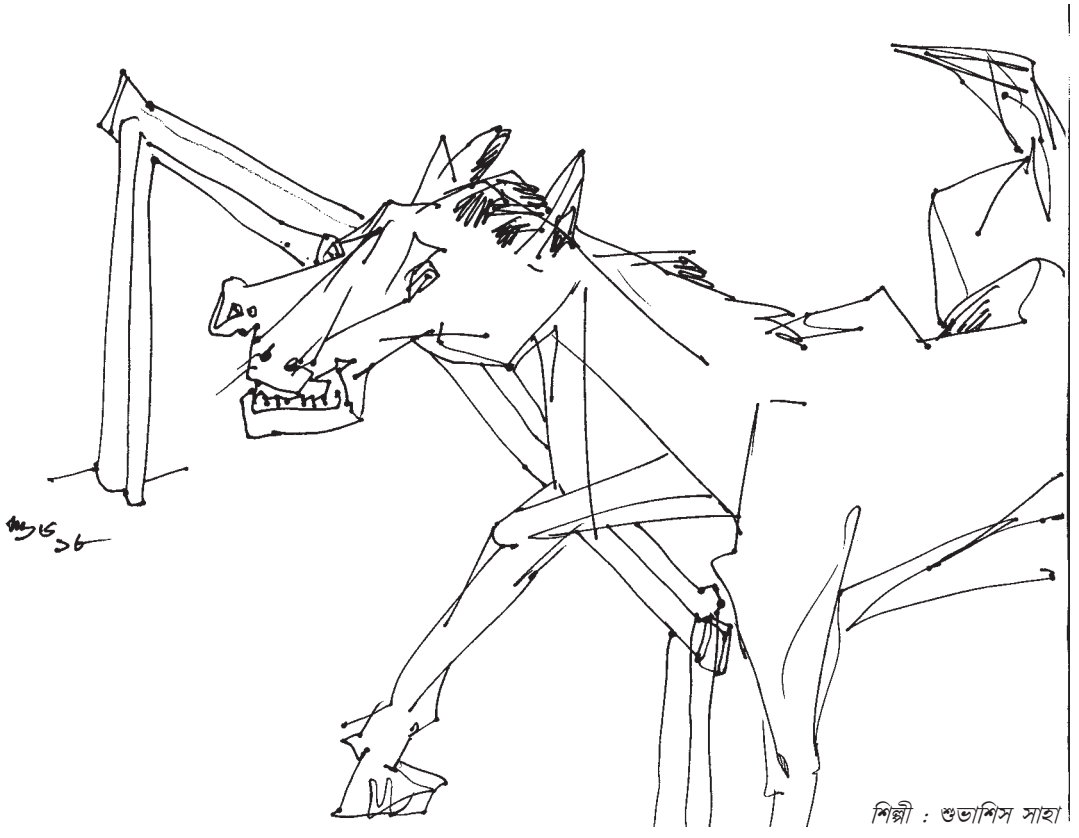

শিল্পী : শুভাশিস সাহা

অক্ষয়বটের দেশ

ভাদ্রদিনের অরচিত কথকতা

কালীকৃষ্ণ গুহ

'কবিতা, / তুমি কেমন আছ?' // 'যেমন থাকে ভালোবাসার মানুষ / অপমানে।'

—বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সম্প্রতি কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ৯৯তম জন্মদিনের একটি সভায় উপস্থাপিত হয়েছিলাম। বলার মতো কোনো গৌরব ছিল না সে-সভার। এ ছিল আন্তরিকতার বিরল একটি আয়োজন। তাঁর কিছু কবিতা সুরে বাঁধা হয়েছিল। তার কিছু গাওয়া হল। কিছু কথা বলা হল। কিছু কবিতা পড়া হল। বর্তমান লেখককেও কিছু কথা বলতে হল। তাঁকে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্মৃতিচারণ করা সম্ভব। তাঁর সঙ্গে যাঁদের মেশার সুযোগ হয়েছিল তাঁরা জানেন কীরকম মানুষ ছিলেন তিনি— কীরকম নিরহংকার নিষ্পাপ অমল মানুষ একজন। কিন্তু সবকিছু গোল করে দেখার মানুষ তিনি ছিলেন না। তাঁর ছিল ক্রোধ, যা রাষ্ট্রের অনাচারের বিরুদ্ধে উচ্চারিত হয়ে আকাশ স্পর্শ করতে চাইত। বহু কবিতা তিনি লিখেছেন যা ছিল 'প্রতিবাদের কবিতা' হিসেবে চিহ্নিত। এই পর্যায়ের কবিতা তিনি একসময় এত বেশি লিখেছেন যে তাঁর প্রকৃত কবি-পরিচয়, আমাদের বিবেচনায়, আচ্ছাদিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাঁর ভক্ত হয়েছিলাম, জীবনের শুরু থেকেই বলা যায়, অন্য কারণে। তিনি ছিলেন একজন বিশুদ্ধ প্রেমের কবি। বস্তুত ছোটো আকারের অনুভবনির্ভর বিমূর্ততাস্পর্শী কবিতা— যাকে 'বিশুদ্ধ কবিতা' বলতে ইচ্ছে হয়— তিনি অনেক লিখেছেন। এই অবস্থানে তাঁর সমতুল্য অন্য কাউকে ভাবতে অসুবিধা হয়। এই কথাটুকুই শুধু নিবেদন করেছিলাম। যাঁরা কবিতাকে 'শ্রেণিসংগ্রামের হাতিয়ার' ভাবতে ভালোবাসেন (তাঁদের সংখ্যা এখন কমে এসেছে অবশ্যই) তাঁরা বর্তমান লেখকের বক্তব্য পছন্দ করেননি বলেই সেদিন মনে হয়েছিল। এখানে তাঁর কয়েকটি ছোটো কবিতার উদাহরণ রাখছি আমাদের বলার কথাটা কিছুটা পরিষ্কার করার জন্য।

ভুবনেশ্বরী যখন শরীর থেকে
একে একে তার রূপের অলংকার
খুলে ফেলে, আর গভীর রাত্রি নামে
তিন ভুবনকে ঢেকে;
সে সময় আমি একলা দাঁড়িয়ে জলে
দেখি ভেসে যায় সৌরজগৎ, যায়
স্বর্গ-মর্ত-পাতাল নিরুদ্দেশে
দেখি আর ঘুম পায়।

—ভুবনেশ্বরী যখন

স্পর্শ করলে পুনর্জন্ম হতে পারে
কিন্তু মাঝখানে
বাতাসের শূন্যতা, চোখের জল ঝরে
যেন শীতের হলুদ পাতা।

—বন্ধুর হাত

জলে ভাসছে ওফেলিয়া
জলে ভাসছে লখিন্দর
গাজন যেন ডাকাতদের বিলে।

জলে ভাসছে ওফেলিয়া
জলে ভাসছে অবাক লখিন্দর
কন্যা তুমি কোথায় গিয়েছিলে?

—জলে ভাসছে

এরকম উদাহরণ অজস্র দেয়া যায়। এই কবিতাগুলির বক্তব্য খুঁজে পাওয়া কঠিন। বক্তব্য বা অর্থ খুঁজে না পেলে আমরা অনেক কবিতা বর্জন করি। কিন্তু এই সহজ কবিতাগুলি— আমাদের বিবেচনায় 'বিশুদ্ধ কবিতা' এইসব— ব্যাখ্যার অতীত বলেই 'বিশুদ্ধ', যা নিষ্কলুষ বোধের জগতে আলোড়ন তোলে। এই জাতীয় কবিতার ক্ষেত্রে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একজন ধূসর পূর্বসূরি ছিলেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য যাঁকে আমরা বিশেষ মনে রাখি না আজ। সময় যে সবকিছু ঢেকে দেবে, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। নতুন যুগের নতুন কণ্ঠস্বর শোনানোই সময়ের কাজ। সময় তা করে চলেছে! বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *প্রভাস*

কবিতাটি আমাদের মলিন মহাভারত-পাঠের পরিশিষ্ট হয়ে আছে।

আমরা যে-ধরনের কবিতাকে 'বিশুদ্ধ কবিতা' বলে চিনতে চাইছি আমাদের কালে, তার একটি উদাহরণ দেয়া যায় সমর সেনের থেকেও।

রজনীগন্ধার আড়ালে
কী যেন কাঁপে

পাহাড়ের স্তব্ধ গভীরতায়।
তুমি এখনো এলে না।
সন্ধ্যা নেমে এল, পশ্চিমের করুণ আকাশ,
গন্ধে-ভরা হাওয়া,
আর পাতার মর্মর-ধ্বনি।
—বিরহ

ভাবতে অবাক লাগছিল, সমর সেনের অতিনির্ধারিত শ্লেষকাতর নাগরিক বাচনে কীভাবে এরকম একটি নম্র অনুভূতির কবিতা জায়গা করে নিয়েছিল!

২

না, আমরা এখানে কবিতা আলোচনার জন্য বা কোনো কাব্যতত্ত্ব নিয়ে কথা বলার জন্য এই লেখাটি লিখতে চাইনি। আর 'বিশুদ্ধ কবিতা' শব্দবন্ধের মালার্মীয় অনুষঙ্গেও যেতে চাইনি। আমরা ভাবছিলাম বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-তুল্য কবির প্রাক্-শতবর্ষের জন্মদিনও কীভাবে নিঃশব্দে অতিবাহিত হয়ে যায়, সেই কথা।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়বে আরেকজন কবি অরবিন্দ গুহ-র কথা, যিনি ৯০ বছর বয়সে সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন। তাঁকে নিয়ে কোনো বড়ো রকমের স্মরণসভা হয়েছে বলে জানি না, যদিও তাঁর কন্যা এবং তাঁর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' কাব্যগ্রন্থের ছোটো এক প্রকাশক বাক্‌কথা-র উদ্যোগে একটি ঘরোয়া সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অরবিন্দ গুহ তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের সূত্রেই একসময় কবিসমাজে খ্যাতি পান। তাঁর শ্লেষ-বিদ্রূপ-মেধা মিশ্রিত প্রেমের কবিতাগুলি পার হয়ে এসে, বহু গবেষণার কাজে সিদ্ধি লাভ করার পর, শেষ বয়সে লিখলেন এমন আশ্চর্য ও ব্যাখ্যার অতীত কিছু কবিতা যা অবাক করে দিল। তিনি লিখলেন:

ভিক্ষুকের ভূমিকায় মঞ্চে নেমেছি।
রূপসজ্জা যেমন নিপুণ, অভিনয় তেমনি অনবদ্য—
দর্শকেরা মুগ্ধ।
সকল ভিক্ষুকের কাছে আমি ঋণী।
—ভিক্ষুক/সময়-অসময়

আরো দুটি কবিতা পড়ে নিতে পারি এই টানে:

সময় কেবল বুড়ো হচ্ছে,
সামনে সাঁকো
বিভোর হয়ে কে ঘুমোচ্ছে
দেখতে থাকো।
—অদ্বিতীয়/সময়-অসময়

একটু নদীর জল বিহঙ্গটি চায়
এই ভেবে পুরোহিত গাঢ় পিপাসায়
নদীতে গেলেন
আর এলেন না তীরে
সন্ধ্যাবেলা ঘণ্টা বাজে পুরনো মন্দিরে।
—ঘণ্টা বাজে (অগ্রন্থিত)

অরবিন্দ গুহকে অবশ্য অনেকেই জানেন ইন্দ্রমিত্র হিসেবে— অর্থাৎ *সাজঘর* এবং *করুণাসাগর বিদ্যাসাগর* গ্রন্থদুটির লেখক হিসেবে। তিনি ছিলেন বরিশালের সূত্রে জীবনানন্দের ঘনিষ্ঠ পরিচিত— একসময় তাঁর পুত্রের গৃহশিক্ষক। জীবনের শেষ তিন বছর তিনি বাক্‌শক্তিরহিত ছিলেন আর তাঁর শেষ কবিতাটি ছিল— যেমন আমরা পেয়েছি— এই:

হাজার হাজার কথা বলা হয়েছে/কিন্তু বিদায়ের
মুহূর্তে/এখন মনে হয়/একটি জরুরি কথা এখনো বলা হয়নি।
—জরুরি

কথা বলা শেষ হয় না জীবনে। হয়তো কথা বলার ইচ্ছে চলে যায় একসময়, তবু কথা শেষ হয় না কোনোদিন— যদি-না চেতনা বিলুপ্ত হয়। চেতনা বিলুপ্ত হবার আগেই অবশ্য মৃত্যু কাম্য। এখানে মৃত্যু হয়ে ওঠে মুক্তির অন্য নাম। বহুকথিত মহাপুরুষদের অনেকেই বলে গেছেন 'শেষ নেই'। আমরা এই ভাষ্যটিকে মানতে চাই না আজ। বলি, 'শেষ আছে'। মৃত্যুতেই ব্যক্তিজীবনের শেষ। তবে, যেহেতু 'মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব থেকে যায়', তাই, সেই বিশেষ অর্থে, 'শেষ নেই' কথাটা বলা অসংগত নয় হয়তো। তবু, বলা যায়, মৃত্যুতেই ব্যক্তিজীবনের শেষ। অর্থাৎ শেষ আছে।

এই মুহূর্তে মনে পড়ছে সম্প্রতি প্রয়াত একজন আশ্চর্য গদ্যলেখক তথা কথাকার কার্তিক লাহিড়ীর কথা। তাঁর লেখার বিষয় ও ভাষা— উপস্থাপনা— এতই মৌলিক ছিল যে তাঁকে গ্রহণ করা সাধারণ পাঠকের পক্ষে হয়তো সম্ভবই ছিল না। তাই, প্রত্যাশিতভাবেই, বাণিজ্যিক পত্রিকার বাঁধা লেখকের মৃত্যুর পর পাতার পর পাতা প্রবন্ধ/নিবন্ধ লেখা হলেও, কার্তিক লাহিড়ীর মৃত্যুসংবাদটুকুও ছাপা হয় না।

কার্তিক লাহিড়ীর সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে আলোচনার পরিসর এখানে নেই। শুধু এইটুকু বলা যায় যে তাঁর লেখার একটা

প্রধান বিষয় ছিল ব্যক্তিমানুষের বিপন্নতা। রাষ্ট্রের দ্বারা, সমাজের যূথবদ্ধ অশুভ শক্তির দ্বারা অথবা অপ্রত্যাশিত কোনো ঘটনাচক্রে কীভাবে ব্যক্তিমানুষ কখনো কখনো আক্রান্ত হয়ে পড়ে, কীভাবে তার আক্রান্ত অবস্থা কাটে— এই আস্তিত্বিক প্রশ্নটি নিয়ে তিনি আলোড়িত ছিলেন। এই মুহূর্তে, এই ২০১৮ সালের ভারতবর্ষে এবং পশ্চিমবঙ্গে, রাষ্ট্রের দ্বারা বা দলের দ্বারা আক্রান্ত বহু মানুষের অবস্থান কীরকম মর্মান্তিক তা কার্তিক লাহিড়ীর গল্প-উপন্যাসে প্রাক্-কথিত হয়ে আছে মনে হয় যদিও এ একটা চিরকালীন অবস্থা! যদি কোনো বিবেকবান প্রকাশক তাঁর গল্প-উপন্যাসগুলি প্রকাশ করেন কোনোদিন, যদি কোনো কোনো সাহিত্য সমালোচকের আগ্রহ জন্মায় তাঁর সাহিত্যকর্মের প্রতি, তাহলে হয়তো একটা ঘটনাই ঘটে যাবে। তবে এখন পরিশ্রমী লেখকদের বস্তা বস্তা গদ্য লেখার যুগে বিস্তীর্ণ আবর্জনা ভেদ করে কার্তিক লাহিড়ীর সূক্ষ্ম চেতনা-আশ্রিত স্বল্পবাক সাহিত্যকর্মগুলি কোনোদিন জেগে উঠবে, এরকম আশা না করাই হয়তো সমীচীন। সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যাওয়াই হয়তো তাঁর ভবিতব্য। তবে তাই হোক।

৩

প্রসঙ্গের টানে কার্তিক লাহিড়ীর প্রসঙ্গ এল। কিন্তু আমাদের মূল কথায় ফিরে যেতে হবে, যে কথা নিয়ে শুরু হয়েছিল। আমরা বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গে যে 'বিশুদ্ধ কবিতা'-র কথা বলেছি তা নিয়ে ভুল বোঝার অবকাশ রয়েছে। বাস্তবিক এটা একটা কথার কথা মাত্র। 'যা-কিছু কবিতা নয় তাকে কবিতা থেকে বাদ দিতে হবে', এই আপ্তবাক্যটি দিয়ে 'বিশুদ্ধ কবিতা'র স্বরূপ খোঁজার কথা বলা হয়েছিল একসময়। কিন্তু কী কবিতা নয়, কী এমন জিনিস আছে যাকে কবিতা থেকে বাদ দিতে হবে, তা কোনোদিন নিশ্চিতভাবে বোঝা যাবে না, ফলে তাকে তত্ত্বায়িত বা সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব নয়। সেখান থেকে সরে এসে বরং ভাবা যাক এই প্রশ্নটি নিয়ে, যে, কবিতা কি সমাজসচেতন হবে না? বা, উলটো দিক থেকে বললে, কবিতা কি সমাজবাস্তবতার বাইরে কোনো দাঁড়ানোর জায়গা পাবে না? এর উত্তর সহজেই খুঁজে পাওয়া সম্ভব। সাহিত্য-শিল্প সবই জীবনকে কেন্দ্রে রেখে গড়ে ওঠে। সমাজবিচ্ছিন্ন কোনো জীবন সম্ভব নয়। ব্যক্তিমানুষের একান্ত জীবনও সমাজজীবনের প্রতিনিধিত্ব করে। ফলে পশ্চাৎভূমিতে সমাজ আসবেই। কতটা আসবে, তা 'সংগ্রামের হাতিয়ার' হয়ে উঠবে কি না, এইসব প্রশ্নও এসে পড়বে।

এই প্রশ্নটির উত্তর অবশ্যই এই যে কখনো কখনো তা সংগ্রামের হাতিয়ার হবে, কখনো কখনো তা হবে মননের গভীরতা থেকে উৎসারিত 'মন্ত্র'। এই দুই সীমার মাঝখান দিয়ে একজন কবির প্রসারিত যাত্রাপথ। এই প্রশ্নটির শেষ খুঁজে পেতে হলে রবীন্দ্রনাথের কথায় আসতে হবে। রবীন্দ্রনাথের লেখায় কখনো সমাজচেতনা কখনো একান্ত ব্যক্তিচেতনা কখনো মহাবিশ্বচেতনা প্রধান হয়ে উঠেছে। এই দুয়ের কেন্দ্রেই মানুষ, ব্যক্তিমানুষ। তবে রবীন্দ্রনাথও কখনো কখনো প্রতিবাদের কবিতা লিখেছেন এবং তা হয়ে উঠেছে বেদনাবোধে আপ্লুত বিপন্নতার কবিতা। ১৩১২ সালের ভাদ্র-আশ্বিন মাসে রবীন্দ্রনাথ ২৩টি 'স্বদেশ' পর্যায়ের গান লিখেছিলেন বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে। যেন তাঁর একার হাতেই গড়ে উঠেছিল একটি আন্দোলন। ওই দু-মাসে তিনি এমন একটিও গান লেখেননি যা গীতবিতানের অন্য কোনো পর্যায়ে স্থান পেতে পারত। এ ছিল তাঁর জীবনে একটা ঘোরের সময়। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও বহুদিন এইরকম ঘোরে কাটিয়েছেন। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে অশোক মিত্র কীভাবে পেয়েছিলেন তার একটি বিবরণ এখানে স্থাপন করা যাক।

> স্মৃতিরা হারিয়ে যায়। বন্ধুরা উধাও। গুহার অন্ধকারে ছায়া অপসৃয়মান দুপুর। গড়িয়ে অপরাহ্ন, ক্লান্তি, হতাশা। প্রচুর কবিতা লেখা হচ্ছে বাংলা ভাষায়। প্রচুর কবিতা লেখা হচ্ছে কলকাতায়, বাংলাদেশের মফঃস্বলে। কিন্তু, অপরাহ্নে, সব কবিতাই পুনর্লিখিত কবিতা, সব কবিতাই কেমন একাকার। স্মৃতিরাও প্রায় উধাও। এরই মধ্যে এখনো মাঝে-মাঝে একমাত্র বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঘুরে-ফিরে কী ক'রে যেন দেখা হয়। অবিকৃত বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এখনো মিছিলে-ময়দানে তাঁকে দেখা যায়। রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠ বজ্রনিনাদ ক'রে ওঠে, তাঁর কাছে এখনো কবিতা জীবনের সমগ্র সংগ্রামের দ্যোতক।
>
> বন্ধুরা উধাও, স্মৃতিরাও ক্রমশ ফিকে। রাজপথে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে দেখে তাই ভরসা পাই, দু'কদম এগিয়ে গিয়ে হাত চেপে ধরি। অন্যান্যদের বিচারে যা মূর্খামি, নয় তো ভণ্ডামি, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে গলা মিলিয়ে চেঁচাতে ভালো লাগে: এ-লড়াই বাঁচার লড়াই, এ-লড়াই জিততে হবে।
>
> বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আজ এই ক্রান্তির মুহূর্তে, আমার সমস্ত বন্ধুর বিকল্প, প্রতিভূ।

বহুদিন পশ্চিমবঙ্গের বাইরে কাটিয়ে অশোক মিত্র এই শহরে ফিরে এসে, ১৯৭৩ সালে, মিছিলে নেমেছিলেন। এ তার বিবরণ।

আমাদের আজকের এই ভাদ্রদিনের অরচিত কথকতা এখানেই শেষ হোক।

শিল্পী : প্রকাশ কর্মকার
(সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে)

প্রাণ ভরিয়ে, তৃষা হরিয়ে....

বাংলার উৎসব | উৎসবে বাঙালী

বেঙ্গল শেল্টার

প্রকৃতি ও প্রযুক্তির মধুর গার্হস্থ্য

www.bengalshelter.com

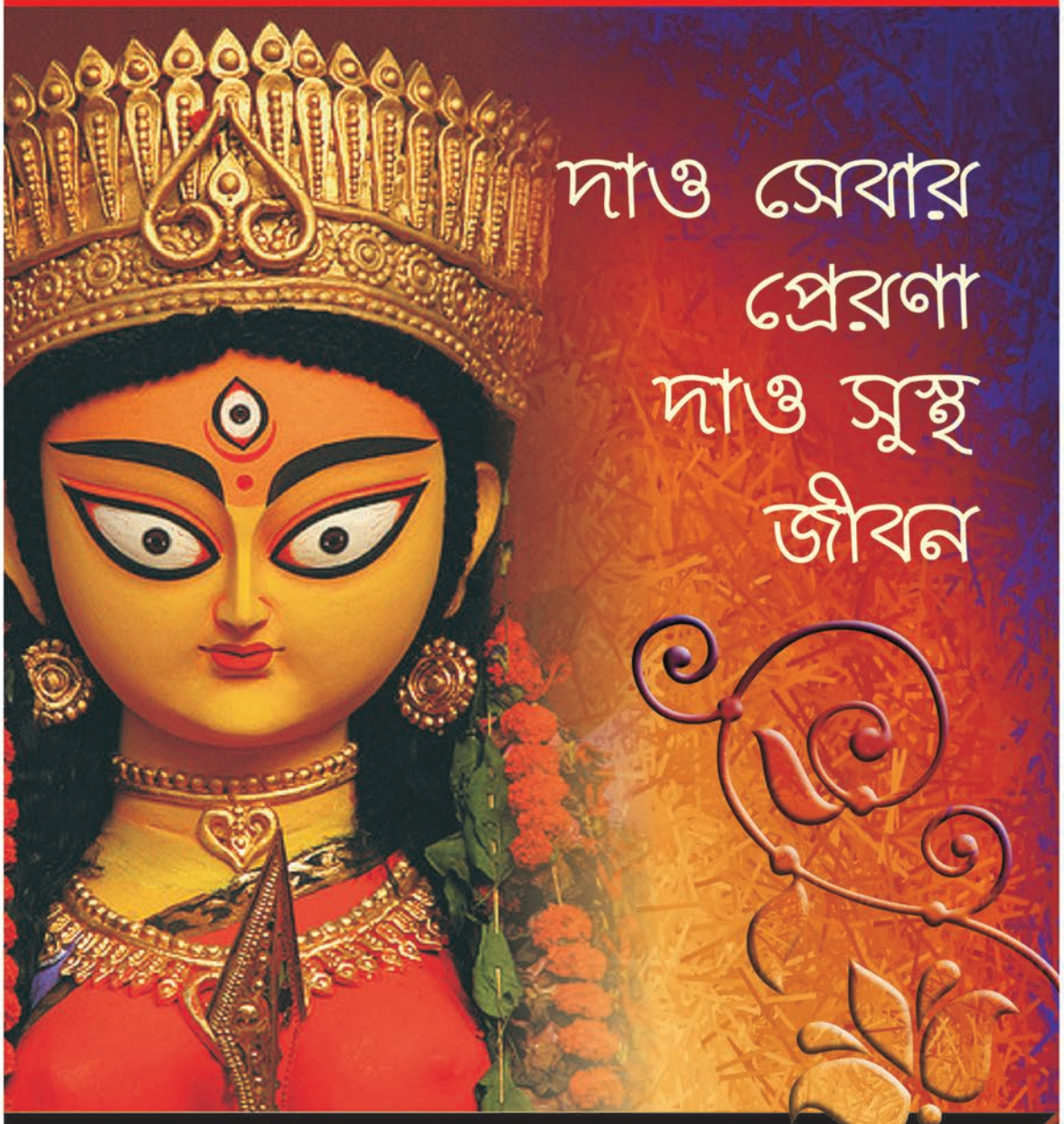

শারদীয়ার অভিনন্দন
দাও সেবায় প্রেরণা
দাও সুস্থ জীবন
Peerless Hospital
And B. K. Roy Research Centre
NABH
360 Panchasayar, Kolkata - 700 094 India
Tel : 91 (33) 24320075 / 4989
Help Line : 40111222
Email: ph.enquiry@peerlesshospital.com
Website : www.peerlesshospital.com

With Best Compliments from :–

A

WELL-WISHER

mio
amore
TM
THE CAKE SHOP

With Best Compliments From

WOCKHARDT NEUROPSYCHIATRY

Makers Of

Livatira

Levetiracetam 250/500mg Tablets, 5ml Inj & 100ml Solution

Life Wins Over Epilepsy

Tryptomer – G 100/300

Amitriptyline 10mg + Gabapentin 100/300mg Tablets

Trust Continus...

Strolife

Piracetam 800mg + Citicoline 500mg Tablets

support life

Diwok – OD

Divalproex Sodium Extended Release 250/500/750 mg Tablets

Brings Control... With Convenience

Issue date 1st October 2018. Registered No. KOL RMS/455/2016-2018
Registered with the RNI NO. WBBEN/2013/49896.
Vol. 6, Issue 19-20 Arek Rakam

Welcome to Kolkata's most advanced Eye Hospital

PBA EYE

Priyamvada Birla Aravind Eye Hospital
Lasik Department

Published by Trishitananda Roy on behalf of Samaj Charcha Trust from 3rd Floor, 39A/1A, Bosepukur Road, Kolkata–700 042 and printed by him at S. P. Communications Pvt. Ltd., 31B Raja Dinendra Street, Kolkata–700 009.